চৌথ চষা জমির দুই-তৃতীয়াংশ বাবুর ভোগে আসিত। আর জনগণে যৌথ অধিকার যদি একমাত্র যৌথ বনভূমিতে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে বাবুর হিস্যা চষাজমির এক তৃতীয়াংশ মাত্র।

সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক দুই প্রকার জমিদারের সম্পত্তির পরিমাণই বাড়িয়া যাইতেছিল। তখন "বাবুরা" এবং "মোহন্ত"রা জমি চাষ করাইবার জন্য "সার্ফ" (ভূমিগোলাম) খুঁজিয়া পাইত না। তখন ফিউদাররা অগত্যা কিষাণ-সমবায়ের হাতে নিজ নিজ জমি চাষের ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিত। এই চাষের ব্যবস্থাকে "বর্দলাজ" বা "মেতেয়াজ" বলে। চাষীরা এই ব্যবস্থায় স্বাধীন অর্থাৎ ভূমিগোলাম নয়।

ফিউদাররা চাষীদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল পাইত। টাকা গুণিয়া কর আদায় করা হইত না। মধ্যযুগে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র এই প্রথা চলিয়াছে। ১৭৮৯ সালের বিপ্লব পর্য্যন্ত "বর্দলাজ" বা "মেতেয়াজ"ই ফরাসী জমিজমার দস্তুর ছিল। অতিপ্রাচীন কালে—নবম শতাব্দীতে—প্যারিসের নিকটবর্ত্তী সাঁজার্ম্যা মঠের জমিদারিতে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। ইংরেজ নৃতত্ত্ববিৎ গম তাঁহার "ভিলেজ-কমিউনিটিজ" গ্রন্থে ইংল্যাণ্ডে, স্কটল্যাণ্ডে এবং আর্য়ল্যাণ্ডে এই ধরণের কিষাণ সমবায়ের অস্তিত্ব বিবৃত করিয়াছেন।

সার্ফ (বা ভূমিগোলাম) ই হউক অথবা মেতেয়াজ প্রথার স্বাধীন রাইয়তই হউক প্রত্যেকেই জমিদার (বাবু বা মোহন্ত) কে বৎসরে কয়েকদিনের গতর খাটাইবার সেবা দিতে হইত। ফিউদারদের জমি চষা আর ফসল গোলাবাড়ীতে মজুত করা এই দুই সেবার জন্য চাষীদের কয়েক দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

তখনকার দিনে ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ বিস্তৃত ছিল না। মাল বিনিময়, "বাজার করা" কেনা বেচা ইত্যাদি কারবার চলিত কম। ফিউদারের বাড়ীতে সকল প্রকার শিল্প-কারখানা থাকিত। অস্ত্রশস্ত্র, চাষ আবাদের যন্ত্রপাতি, তাঁত বুনা, কাপড়চোপড় তৈয়ারী করা সবই ছিল জমিদারি আর গির্জ্জার গৃহশিল্প। চাষীরা সস্ত্রীক এই সকল কারখানায় আসিয়া কয়েকদিন গতর খাটাইতে বাধ্য থাকিত।

নারীরা জমিদার পত্নীর খোদ তত্ত্বাবধানে কাজ করিত। "মানর" বা জমিদারের বাস্তু ভিটার যে অঞ্চলে মেয়েদের কারখানা থাকিত তাহাকে বলে "জেনিসিয়া"। মঠ-মন্দিরেও মোহন্তরা মেয়েদের খাটাইবার জন্য "জেনিসিয়া" কায়েম করিত। ৭২৮ খৃষ্টাব্দে এবার্হার্ড বাবু ম্যারবাখ মঠে কিছু দানের ব্যবস্থা করে। দানের দলিলে মঠের জেনিসিয়েতে মেয়ে-মহলের কথা উল্লিখিত আছে।

কারখানার মেয়েমহলগুলা ক্রমশঃ বাবুদের এবং মোহন্তদের বেশ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। দুই শ্রেণীর জমিদারগণই নিজ নিজ রাইয়ত বা গোলামের স্ত্রীকন্যাদিগকে যথেচ্ছ ভোগ করিতে অভ্যস্ত ছিল। জেনিসিয়ারিয়া (অর্থাৎ জেনিসিয়া নামক জমিদার কারখানার মেয়ে-মজুর) শব্দ কালে বেশ্যা অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। বর্ত্তমান জগতের বেশ্যালয়গুলা এইরূপে ধনী জমিদারের আর সন্ন্যাসী সাধু বাবাজীদের মঠ মন্দিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

প্রথম প্রথম দিন তিনেকের বেশী রাইয়তদিককে ফিউদারের জন্য গতর খাটাইতে হইত না। বিজোর জনপদের এক বিধান এই :—"স্বাধীন রাইয়ত সারা বৎসরই স্বাধীনতা ভোগ করুক। বৎসরে মাত্র তিনদিন জমিদারের কাজে খাটিলেই তাহার কর্ত্তব্য ফুরাইয়া যাইবে।"

দলিলে লেখাপড়া না থাকিলে ফ্রান্সের রাজবিধানে রাইয়তরা বার্ষিক দশ দিন খাটিতে বাধ্য ছিল। এই গেল স্বাধীন রাইয়তদের কথা।

সার্ফ বা ভূমি গোলামদের এত সহজে রেহাই পাইবার জো ছিল না। তবে সপ্তাহে মোটের উপর তিন দিন ছিল তাহাদের কড়ার। তিন দিনের বেশী খাটা এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল। সার্ফদের প্রতি জমিদারের ব্যবহারও নেহাৎ মন্দ ছিল না। জমিদাররা গোলামদিগকে এক টুকরা জমি দিয়া দিত। এই জমি হইতে তাহাদিগকে খেদাইয়া দেওয়া চলিত না। তাহা ছাড়া সার্ফেরা জমিদারের ফসলে হিস্যা পাইত আর বন ভূমিতে জানোয়ার চরাইতেও অধিকারী ছিল।

মোটের উপর দেখিতেছি কয়েক দিনের জন্য গতর খাটানো। সেকালের ব্যবস্থায় রাইয়তদের পক্ষে কষ্টজনক বিবেচিত হইত না। জমিদারদের তরফ হইতে বরং বোধ হয় কিছু অসুবিধাই ভোগ করিতে হইত। অষ্টাদশ লুইয়ের কৃষিসচিব ১৮২২ সালে "ফে র্মাজ" (বা খাজনা) নামক গ্রন্থে এই কারণে বলিয়াছেন যে "জমিদাররা রাইয়তদের গতর খাটানো ব্যবস্থা পছন্দ করে না। তাহাদের পক্ষে চষা জমির ফসলে হিস্যা পাওয়াই লাভজনক।"

গতর খাটার প্রথাকে "সোকাজ" বলে। এই সোকেজ বাড়াইবার দিকে জমিদারেরা পরবর্ত্তী কালে বিশেষরূপে ঝোঁক দিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জাঁ শেণু নামক লেখক বলিতেছেন—"জমিদাররা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চাষীদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া আনিয়া নিজ নিজ জমি চষানো হইত। আঙুর তোলাইবার জন্যও রাইয়তদিগকে বাধ্য করা হইত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাজে তাহাদিগকে তলব করা জমিদারদের স্বভাবে দাঁড়াইয়াছিল। অথচ এই সকল সেবায় তাহাদের কোনো ন্যায়সঙ্গত দাবী ছিল না। রাইয়তেরা মার খাইবার ভয়ে অথবা কোনো মতে জমিদারদের প্রতিহিংসা এড়াইয়া ধনপ্রাণ বাঁচাইবার আশায় হুকুম তামিল করিয়া আসিত।"

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশেই মাৎস্যন্যায় কম বেশী নিবারিত হইয়াছিল। সমাজে শান্তি দেখা দিয়াছিল। কাজেই তখন জমিদারদের উপর দেশ রক্ষার কোনো দায়িত্ব ছিল না। ফিউদ-প্রথা বজায় থাকিবার কোনো কারণই দেখা যায় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জমিদারেরা সাবেক কালের দাবী দাওয়াগুলা ষোল আনায় বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবিনয় কুমার সরকার।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ [৮ম সংখ্যা

মলিয়ার ও তাহার নাট্য প্রতিভা

উত্তরকালে মলিয়ার যে একজন জগৎবিখ্যাত হাস্যরসিক হইবেন তাহা তাঁহার জন্মের দিনই বুঝা গিয়াছিল। কেননা যে পরিবারে তাঁহার জন্ম হয় তাহার নাম পক্‌লাঁ (Poquelin), মলিয়ার নয়। ১৬২২ সনের ১৫ই জানুয়ারী প্যারিস সহরের St Eustache গীর্জ্জায় তাঁহার শুভনামকরণ হয় এবং নাম হয় জাঁ বাপ্‌তীস্‌ত্‌ পক্‌লাঁ, Jean Baptiste Poquelin ইহার বাইশ বছর বাদে তিনি 'মলিয়ার' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। সে কালে ভদ্রঘরের ছেলের পক্ষে আপনার বংশগৌরবের সংস্কার জলাঞ্জলি দিয়া প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনয় করা অত্যন্ত নিন্দার ব্যাপার ছিল, কাজেই তিনি যখন বংশের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করিলেন তখন যে সমাজে একটা প্রচণ্ড রকমের বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মা-বাপ উভয়েই বেশ ভদ্রঘরের মধ্যবিত্তের সন্তান আর উভয়েই রাজসরকারে উঁচুদরের চাকরী করিতেন বলিয়া সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট। মধ্যবিত্তঘরের ছেলে হইয়াও মলিয়ার সেইকারণে রাজ-পরিবারের আদবকায়দা ও জাঁকজমকের সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিত ছিলেন। ফরাসী রাজ-পরিবারের তখন গৌরবময় যুগ—ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ লুইর শাসন কাল, রিশল্যু এবং মাজারাঁ্যা কলব্যার এবং কঁদে প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিশারদদের প্রভাব তখন অপ্রতিহত। রাষ্ট্র, সাহিত্য, এককথায় চিন্তাজগতে তখন ফরাসী ইতিহাসের গৌরবের যুগ। ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ন্যায় সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সও উন্নতির চরমে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। ইংলণ্ডে সে যুগে যেমন সপ্তম হেন্‌রী হইতে রাণী এলিজাবেথ পর্য্যন্ত পর পর শক্তিশালী রাজ-রাজড়ার আবির্ভাব হইয়াছিল, ফ্রান্সেও ঐ যুগ তেমনি চতুর্থ হেন্‌রী হইতে চতুর্দ্দশ লুই পর্য্যন্ত অতি পরাক্রমশালী নরপতির শাসন কাল। একদিকে ইংলণ্ডে স্যার ফিলিপ সিড্‌নী, মার্লো, শেক্সপিয়ার, ইকার, স্যর ফ্র্যান্সিস বেকন প্রমুখ চিন্তাবীরগণ, আর দিকে ফ্রান্সেও প্যাস্কাল, রাশ্‌ফুকো, কর্‌নেই, এবং মলিয়ার, লাফঁতেইন্‌, রাসীন্‌, বোয়ালো, এবং বোসুয়ে প্রমুখ প্রতিভাবানের আবির্ভাব হইয়াছিল। বোয়ালোকে যদি সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সমালোচক বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা হইলে মলিয়ার যে সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান পুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মলিয়ারের ছেলেবেলার কথা বেশী কিছু জানিবার উপায় নাই। সে যুগের প্রায় সকল বড়লোকদের জীবনের কথা সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। মলিয়ার সম্বন্ধে মোটামুটি এই জানিতে পারা যায় যে তিনি পিতামাতার স্নেহ বড় বেশী ভোগ করিতে পারেন নাই। দশবছর বয়সের সময় মলিয়ারের মা পরলোক গমন করেন আর তাহার পরের বছরই তাঁহার বাবা পুনরায় বিবাহ করেন। ফলে মাতৃহীন শিশুপুত্রকে তাঁহার দাদামহাশয়ের স্নেহাশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হয়। বৃদ্ধ দাদামহাশয় ছিলেন একজন উদারনৈতিক ও সুরসিক লোক এবং, অনেকের মতে, মলিয়ার তাঁহার এই বৃদ্ধ মাতামহের নিকটেই নাকি হাস্যরসের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এই কথা কতদূর সত্য সে বিষয়ে কোন কোন লোকের সন্দেহ থাকিলেও এ কথা সত্য যে, বৃদ্ধ তাঁহার বার্দ্ধক্যের সম্বল দৌহিত্রটিকে সঙ্গে লইয়া তখনকার দিনের প্রায় সবগুলি রঙ্গালয়েই অভিনয় দেখিতে যাইতেন। ইহা হইতেই যে বালকের মনে অভিনয়-শিল্পের উপর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আসিবে সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই।

ছেলেবেলায় মলিয়ার যাহাদিগকে সঙ্গীহিসাবে পাইয়াছিলেন তাহাদিগকে ঠিক ভদ্র আখ্যা দেওয়া যায় না। কেননা পথের ভিখারী-গায়ক, ছড়াওয়ালা, ইস্কুলের ইচড়ে পাকা ছেলে, চাকর খানসামা, আর ছোটজাতের স্ত্রীলোক—ইহাদের কাহাকেই শিক্ষিত ভদ্র বা সভ্য বলা চলে না। ইহাদের বেশীর ভাগেরই আড্ডা ছিল পঁন্তফ্-এর (Pont Neuf) পুলের আশেপাশে যে সকল অসংখ্য নাচঘর ছিল সেইখানে। ইহাদের, বিশেষ করিয়া সেই সময়কার একটা হুবহু চিত্র "মলিয়ার" নামক ব্যঙ্গনাটকখানায় দেখিতে পাওয়া যায়। মানব-সমাজের নিম্নস্তরের এই সব সঙ্গীর নিকট হইতে মলিয়ার তাঁহার হাস্যরসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এ সকল রঙ্গালয়ে যে সকল নাটক অভিনীত হইত তাহার প্রায় সবগুলিই অত্যন্ত অধম রুচির পরিচায়ক। নায়ক নায়িকারা সকলেই মাতাল, শঠ, বদমায়েস, চরিত্রহীন চাকর বাকর আর দুশ্চরিত্রা নারী। এই জাতীয় বিদ্যালয়েই হাস্যরসিক মলিয়ারের হাস্যরসের হাতে খড়ি হইয়াছিল। এইখান হইতেই তিনি তাঁহার নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের জোগান পাইয়াছিলেন। সমালোচক-বন্ধু বোয়ালো প্রহসনের উপর তাঁহার এতটা অনুরাগ দেখিয়া অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার আফ্‌শোস মলিয়ার সত্যকার নাট্য-সাহিত্যের চর্চ্চা না করিয়া প্রহসনে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার অপচয় করিতেছেন কিন্তু মানব-সমাজের জীবন-চিত্র তিনি যে ভাবে দেখিয়াছেন, তাহার প্রাণের স্পন্দন, তাহার আশা-নিরাশা, সুখ দুঃখ ও অশ্রু-হাস্যের বিচিত্র লীলাকে তো তিনি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই এই সব চিত্র আঁকিবার অমন সুন্দর সহজ সুযোগকে তিনি কাজে না লাগাইয়া থাকিতে পারেন নাই। বন্ধুবান্ধবের শত অনুযোগও তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ হইতে এক পদও বিচলিত করিতে পারে নাই।

তখনও কিন্তু যুবক পক্লাঁ, 'মলিয়ার' হন নাই। আর আর ছেলেদের মতই তাঁহাকেও "মানুষ" হইবার জন্য সমাজের দেওয়া সনাতন পদ্ধতির তথাকথিত শিক্ষার

ধাঁতাকলে মাথা বাড়াইয়া দিতে হইল। ১৬৩৬—৪১ সন পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসর কাল তাঁহাকে ক্লেরমঁ জেসুইট্ কলেজের নীরস আইন-কানুনের অতিচাপ সহিতে হইয়াছে এবং সে চাপ যে কতটা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মলিয়ারের লেখা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

ছেলের ভবিষ্যৎ লইয়া বাপ ও দাদা মহাশয়ের মধ্যে ভীষণ পারিবারিক বিরোধের সৃষ্টি হইতে চলিল। একদিন বাপ মেজাজ গরম করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন, "আপনি কি চান যে, ছেলেটা প্রহসনের নট হয়ে দাঁড়ায়?" জবাবে বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, "ভগবান কি তাই করবেন যে, আমার দৌহিত্র বেলরোজের মত একদিন বিখ্যাত হাস্যরসিক অভিনেতা হয়ে উঠ্‌বে।"

বলাবাহুল্য, পিতার জেদ বজায় রাখিবার জন্য পুত্রকে ছয়-ছয়টি বৎসর জেসুইট কলেজের অচলায়তনে বন্দী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দাদামহাশয়ের ভবিষ্যৎ বাণীই সফল হইয়াছিল।

ছাত্রজীবন

তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেদের ছাত্রজীবনে নানারকম বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত। পোষাকে-পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে যেমন তাহাদের অত্যন্ত সংযম অভ্যাস করিতে হইত, আবার মাষ্টারদের রক্তচক্ষু আর উদ্যত বেত্রদণ্ডের বিভীষিকাও নেহাৎ কম ছিল না। তাহার পাশেই বড় ঘরের ছেলেরা পোষাক-পরিচ্ছদে, জাঁকজমকে ও বিলাসিতার বাহুল্যের সঙ্গে নানারকম উচ্ছৃঙ্খলতারও অবাধ প্রশ্রয় পাইত। মলিয়ারের বাবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হইলেও সামাজিক সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ছেলেকে যে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন সেখানে বড় ঘরের ছেলেরাই পড়িতে পাইত। কাজেই সৌভাগ্যের বিষয়, মলিয়ারকে অশনভূষণে, আহারে-বিহারে কখনই তেমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এই বিদ্যালয়ের দিকে বড় ঘরের ছেলেদের এতটা ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছিল যে, কিছুদিনের জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিমাকেও সে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছিল। মলিয়ারের সহপাঠীদের মধ্যে Princede Conti, সুবিখ্যাত কঁদেএর ভাই সুরসিক বিখ্যাত বিলাসী ক্লদ্ শ্যাপেল, কবি হেনো, ডাক্তার ফ্রাঁসোয়া ব্যারনিয়ে প্রমুখের নাম করা যাইতে পারে। এই ব্যার্ণিয়েই সম্রাট শাহ্‌জাহান ও আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়া মোগল-দরবারে স্থান পাইয়াছিলেন এবং তিনি যে দিন-লিপি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সে যুগের ভারত ইতিহাসের একটা দিক উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

জেসুইট কলেজে সেই সময় একজন দার্শনিক গোছের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নাম গ্যাসেন্ডি (Gassendi)। ইনি কতকটা আমাদের চার্বাক মুনির মতাবলম্বী। জীবনের সকল সৌন্দর্য্য ও আনন্দ সর্ব্বদিক দিয়া পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান আদর্শ। গ্রীক্-কবি লুক্রেশিয়াস ছিলেন তাঁহার অতি প্রিয় আদর্শ মানব। ছেলেদের পড়াইবার সময় ক্লাসে পায়চারী করিতে করিতে তিনি তাঁহার কবিতা আওড়াইতেন। সত্যকারের

কাব্যপাঠে মন উন্নত এবং ভাষা ও লিপি-শিল্প মার্জ্জিত হয়, এই ছিল তাঁহার বলিবার বিষয়। এই জাতীয় অধ্যাপকের প্রভাব যে তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ করিয়াই লাগে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। শ্যাপেল্ প্রমুখ যুবক অতিমাত্রায় ভোগবিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু একমাত্র মলিয়ারই তাঁহার হাল্‌কা ভাবগুলিই কেবল গ্রহণ করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের গাম্ভীর্য্যও তিনি একান্ত আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। অধ্যাপক গ্যাসেণ্ডির নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি, রঙ্গ ও ব্যঙ্গরসের উপাদান এবং মানব-জীবনের প্রহসনের ভাব, আর দেকার্তের নিকট হইতে লইয়াছিলেন সংযম-নিষ্ঠা, ব্যক্তিগত জীবনের সরলতা ও একান্ত ভাবে আর্টের সাধনা।

সেকালে মাতৃভাষার চর্চ্চা করাটা ফরাসী দেশেও সভ্য-সমাজ-বিরুদ্ধ ছিল। গ্রীক, ল্যাতিন তখন শিক্ষিত সমাজের একমাত্র গতি—ফরাসীর চর্চ্চায় শিক্ষা যে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এই বিশ্বাস নবীনদলের ছিল না। মলিয়ারও এই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যে কয় বছর তিনি জেসুইট কলেজে ছিলেন সেই ছয় বছরকাল তিনি ল্যাতিন সাহিত্যের একান্ত চর্চ্চায় মশ্‌গুল হইয়া পড়িলেন, ফলে প্লেটো ও টেরেন্সর ব্যঙ্গ-নাট্যের প্রভাব তিনি কিছুতেই এড়াইতে পারেন নাই। এস্‌কিলস্, সফোক্লিস, এরিষ্টফেনিস, মেনান্দার এবং ইউরিপিডিস-প্রমুখ গ্রীক নাট্যকারদিগের রচনাও সম্ভবত তিনি ভালো করিয়াই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ছেলেদের অভিনয়ের জন্য শিক্ষকেরা তখন ল্যাতিন ভাষায় নাটক রচনা করিয়া দিতেন এবং এইরূপ কোন নাটকের অভিনয়েই মলিয়ার জীবনের সবপ্রথম ভূমিকা গ্রহণ করেন।

একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে, মলিয়ার কেবল হাস্যরসের আধারই ছিলেন না, একজন উঁচুদরের দার্শনিকও বটে। কলেজ ছাড়িয়া দিয়া কিছুকাল একমাত্র দর্শনের চর্চ্চা লইয়াই তিনি দিনরাত কাটাইতেন কিন্তু পিতার নিকটে তাড়া খাইয়া তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া আইনের চর্চ্চায় মন দিতেই হইল। অরলেয়াঁ হইতে তিনি আইনের উপাধি পাইলে একজন হাস্যরসিক নাট্যকার তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অরলেয়াঁ হইতে গাধা-ঘোড়াও উপাধি পাইতে পারে! ক্রমশঃ

শ্রীকালিদাস নাগ

বাঙ্গলার আশুতোষ

মে মাসের শেষভাগে মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য যখন আমাদের জিলায় জিলাসম্মেলনে যোগদানের নিমিত্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করি, তখন কে জানিত যে ইহারই মধ্যে বাঙ্গলার মস্তকে এমন অশনিপাত হইবে? বাঙ্গলার বুকের ধন আশুতোষকে পাটনীপুত্রে হারাইতে হইবে? সৌম্য সুন্দর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের মহাপ্রয়াণের দুই দিন পরেই যখন বাঙ্গালার সার্থকনামা পুরুষশার্দ্দুল আশুতোষ-মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত-

মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিলাম বাস্তবিক মনে হইল দেশের উপর বিধাতার কি অভিশাপ! এই বিরাট্ পুরুষ, যিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিবিধ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের মধ্যেও দেশের কল্যাণের জন্য এত চিন্তা করিয়াছিলেন, এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এত শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন, যিনি সেই কর্ম্মজীবন হইতে কতক পরিমাণে অবসর গ্রহণ করিবার সময়ে সমস্ত শক্তি এখন দেশের সেবায় নিয়োগ করিতে পারিবেন বলিয়া কত উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, কত নূতন কর্ম্মপ্রচেষ্টার কল্পনা করিয়াছিলেন, যাঁহাকে ভারতবর্ষের এই সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক সমরক্ষেত্রে একজন মহারথীরূপে পাইতে আশা করিয়া দেশবাসী কত ভরসা অনুভব করিতেছিলেন —ঠিক্ এই সময়েই এই বিরাট্ শক্তিকে বিধাতা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিলেন! ভারতে যেন একটা ইন্দ্রপাত হইল; বাঙ্গলা যেন নিঃসহায় নিঃসম্বল হইল। আমরা স্বল্পদৃষ্টি; বিধাতার নিগূঢ় লীলা রহস্য আমরা ভেদ করিতে পারি না; হয়ত ইহার মধ্যেও কোনও মহান্ মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের মনে হয়, যে এই যে নিদারুণ বিপৎপাত, ইহা সহজে পূরণ হইবার নহে। আশুতোষের মত মনীষী, আশুতোষের মত কর্ম্মী, আশুতোষের মত তেজস্বী পুরুষ কোনদেশে শতাব্দীতে একটা জন্মায় কি না সন্দেহ, বিশেষতঃ আমাদের মত ক্ষীণজীবী নিরীহ গতানুগতিকের দেশে আশুতোষের মত পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব একটা phenomenon বলিলেই হয়। তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইল হইল তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ।

আশুবাবুর জীবনকাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যালোচনা করার এবং জাতীয় জীবনে আশুবাবুর স্থান নির্দ্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই; এবং তাহা করিবার স্থানও ইহা নহে; এবং সে চেষ্টা করিবার অধিকারীও আমি নহি। এখানে শুধু তাঁহার জীবনের ও চরিত্রের মোটা মোটা কয়েকটা কথা যাহা স্বতঃই মনে উদিত হয় তাহারই যৎসামান্য আলোচনা করিব।

আশুতোষ ব্রাহ্মণ, বংশে ব্রাহ্মণ, জীবনেও আশুতোষের ব্রাহ্মণ্য গুণের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। ব্রাহ্মণের সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাপন, ব্রাহ্মণের গভীর মনীষা, ব্রাহ্মণের চিরঅতৃপ্ত জিজ্ঞাসা এই সবই তাঁহাতে ছিল। কিন্তু যাহা আশুতোষকে ব্রাহ্মণ সাধারণ হইতে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছিল, যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে আশুতোষকে অতবড় প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত করিয়াছিল, তাহা ছিল অপর একটী গুণ, তাহা আশুতোষের ক্ষত্রিয়ত্ব। এই ক্ষাত্র তেজই আশুতোষকে এই নিৰ্জ্জীব নিশ্চেষ্ট দাসভাবাপন্ন বিপন্ন আত্মপ্রত্যয়হীন দেশে অবিসংবাদিত নেতৃত্বে উন্নীত করিয়াছিল। ইহার বলেই তাঁহার দেশবাসী স্বতঃই তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। বিপদে সঙ্কটে নিরুপায় হইয়া তাঁহাকেই যেন এক পরম আশ্রয় পরম সহায় বলিয়া মনে করিতেন। ব্রততী যেমন মহীরুহকে আশ্রয় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে সেই রকম একান্তভাবেই দেশবাসী তাঁহাকে জড়াইয়া থাকিতেন। এই ক্ষত্রিয় গুণের প্রভাবেই তিনি শুধু তাঁহার মিত্রের ভক্তিভাজন ছিলেন না, তাঁহার শত্রুর, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয় ও শ্রদ্ধার ভাজন ছিলেন। আমাদের মত ভদ্রলোকের দেশে মিষ্টত্ব কমনীয়তা ও মাধুর্য্য অনেকেরই থাকে। আশুতোষেরও যে তাহা ছিল না তাহা নহে—যাঁহারা

তাঁহার নিকটসম্পর্কে আসিয়াছেন তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যে তিক্তত্ব, রূঢ়ত্ব ও গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ ছিল তাহাই তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা করিয়াছিল। রঘুবংশে অমরকবি কালিদাস রাজর্ষি দিলীপের বর্ণনা করিতে গিয়া যে চিত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিকই অক্ষরে অক্ষরে সে বর্ণনা বাঙ্গলার আশুতোষের সঙ্গে মিলিয়া যায়:

> ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
> আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥
> সর্ব্বাতিরিক্তসারেণ সর্ব্বতেজোঽভিভাবিনা।
> স্থিতঃ সর্ব্বোন্নতেনোর্ব্বীং ক্রান্ত্বা মেরুরিবাত্মনঃ॥
> আকার সদৃশ প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
> আগমৈঃ সদৃশারম্ভঃ আরম্ভ সদৃশোদয়ঃ॥
> ভীমকান্তৈ র্ন‍ৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।
> অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥

কালিদাসের তেজোময়ী তুলিকা যে অপূর্ব্ব আলেখ্যের অবতারণা করিয়া মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্র তেজকে ফুটাইয়া দিয়া তুলিয়াছে, বাঙ্গালার প্রকৃতই গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয় যে রেখায় রেখায় সেই আলেখ্যে বাঙ্গালার আশুতোষের চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই বিরাট্ শক্তিমান্ দেহ, সেই তীক্ষ্ণ সুগভীর মনীষা, সেই অক্লান্ত অপ্রান্ত কর্ম্মৈষণা, সেই আশ্রিতগণের অভিগম্যতা, সেই প্রচণ্ড অধৃষ্যতা, সেই অটুট আত্মপ্রত্যয়,—সকলই আশুতোষে ছিল। যাহার বলে তিনিও তাঁহার স্বদেশে মেরুর ন্যায়ই সগৌরবে অবস্থিতি করিতেন। আশুতোষের চরিত্রের এতদপেক্ষা সত্যতর বাস্তবতর বিশ্লেষণ হইতে পারে কিনা সন্দেহ।

আমার মনে হয় ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রগুণের এই অপূর্ব্ব সমাবেশই আশুতোষের চরিত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়, কিন্তু আর একদিক্ দিয়াও তাঁহার চরিত্রের বিশ্লেষণ কতকটা পরিমাণে করা যাইতে পারে। সেটী হইতেছে তাঁহার জীবনে ও চরিত্রে প্রাচ্য প্রতীচ্যের অদ্ভুত সম্মেলন। তিনি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি খাঁটী প্রাচ্য ছিলেন, খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন: চিরকাল লোকমুখে "আশুবাবু" বলিয়া সম্ভাবিত হইতে গৌরব বোধ করিতেন। কখনও তিনি "মুখার্জ্জী সাহেব" বলিয়া পরিচিত হন নাই। অথচ কর্ম্মজীবনে বাঙ্গালী উচ্চতম যে যে পদ কামনা করিতে পারে, সেই সমস্ত পদ প্রতিষ্ঠা তাঁহার হইয়াছিল, পাশ্চাত্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করিয়াছিলেন; বড় বড় সাহেব সুবার সঙ্গে, লাট বড়লাটের সঙ্গে মিশিবার ও তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসিবার যে সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ ভারতবাসীরই হয় না। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্চ্যান্সেলার ছিলেন, শেষকালে সেই পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কর্ণধার ছিলেন; তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন; তিনি কলিকাতা গণিত সভার সভাপতি ছিলেন; তিনি কাউন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলেন;

তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেম্বর হইয়াছিলেন; আর যে কত অগণিত সরকারী ও বেসরকারী অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, সভা ও সমিতির সহিত বিশিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই—যে পদ গৌরবের শতাংশের একাংশ পাইলে বাঙ্গালী সাহেব বনিয়া যায় সেই সমস্ত পদ গৌরবের অধিকারী হইয়াও তিনি "আশুবাবু"ই চিরকাল রহিয়া গেলেন। আর সরকারী কাজের কয়েক ঘণ্টা সময় ব্যতীত তাঁহার সেই চিরন্তন লম্বা কোট মোটা চাদর সাদা ধুতি ও ফিতাহীন জুতাও কোনদিন ফুরাইল না। একথা সকলেই জানেন তিনি সাক্ষাৎভাবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে সুযোগ পান নাই; কিন্তু নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা, নিজের বেশভূষায় আচারে ব্যবহারে পাশ্চাত্য হাবভাব ও বিলাস উপকরণ বর্জ্জন করিয়া তিনি যে উদাহরণ দেশবাসীকে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার জাতীয় সম্মানজ্ঞান কম উদ্বুদ্ধ হয় নাই। এই স্বদেশ ভক্তি, স্বদেশের গৌরবে নিজের গৌরববোধ, বিদেশীর কাছে নিজেকে কখনও খাটো ও হীন ও অপমানিত না করা এই ভাব আশুবাবুর প্রত্যেক কর্ম্ম প্রচেষ্টার ভিতর লক্ষ করা যায়।

আশুবাবুর জীবনের প্রধান যাহা দান—দেশে শিক্ষার অপরিসীম বিস্তার তাহারও ভিতরের কথা এই দেশপ্রাণতা। সমস্ত দিকে কার্য্য করিবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু যে দিক্‌টায় হস্তক্ষেপ করিবার তিনি অবকাশ পাইয়াছিলেন—শিক্ষার দিক্—সে দিকে তাঁহার আপ্রাণ প্রচেষ্টাই এই ছিল যে তিনি বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোক বিকীরণ করিবেন। লাট কার্জ্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মূলনীতির বিরুদ্ধে সেই আইনই অবলম্বন করিয়া আশুবাবু যেরূপে তাঁহার আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মনৈপুণ্য ও অকপট স্বদেশভক্তিরই পরিচয় দিতেছে। শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রদানের প্রণালী লইয়া তাঁহাকে উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত কত যে লড়াই করিতে হইয়াছে তাহা ত কাহারও অবিদিত নাই। স্বদেশীর যুগে ব্রজমোহন বিদ্যালয় রক্ষাকল্পে আশুবাবু সরকারী শিক্ষাবিভাগের সহিত যে কিরকম বুঝিয়াছিলেন, তাহাত আমরা সকলেই জানি, এবং সেজন্য আমরা বরিশালবাসী সকলেই তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব। আশুবাবুর মুখেই শুনিয়াছি যখন লাট হার্ডিং প্রথম বড় লাট হইয়া কলিকাতায় আসেন তখন একদিন তাঁহার সঙ্গে আশুবাবুর শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা হয়। হার্ডিং বলেন যে শিক্ষা পদ্ধতিকে সংস্কার করিতে হইবে standard নীচু হইয়া গিয়াছে! better education দিতে হইবে। তখন আশুবাবু নির্ভীকভাবে বড়লাটকে বলেন I like your better education, but if by better education you mean less education I shall have none of it" আশুবাবুর এই স্পষ্ট বাক্যে বড়লাট হার্ডিং বেশ একটু সমঝিয়া গেলেন। তারপরে যখন কলিকাতায় বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠানকল্পে আশুবাবুর অদম্য অধ্যবসায় ও প্ররোচনার ফলে সার তারক নাথ পালিত তাঁহার বহুমূল্য সম্পত্তি দান করেন, তখন আশুবাবুই জোর করিয়া বলেন যে দেশের লোকের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে দেশীয় অধ্যাপকই শুধু নিযুক্ত করিতে হইবে—Tom, Dick

ও Harryর মত সাহেবদের জন্ত ত সরকারী কলেজই রহিয়াছে। তারকনাথ একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন তখন আশুবাবু তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আশুবাবুর নিজের মুখে শোনা সেই কথা, এখনও আমার কাণে বাজিতেছে—"পালিত সাহেব, আপনি কালো চামড়া হয়ে একথা আপনি বলতে পারবেন না যে কালোচামড়া ছাড়া আমার চেয়ারে কেউ বসতে পারবে না ?" স্বজাতিপ্রীতি, জাতীয় আত্মসম্মানবোধ এতই তাঁহার বদ্ধমূল ছিল। তাঁহার হিন্দুত্ব যে খুব গোঁড়া ছিল তাহা নহে, তিনি সামাজিক সংস্কারের খুবই পক্ষপাতী ছিলেন, নিজে প্রবল আন্দোলনসত্ত্বেও বিধবা কন্থার পুনর্ব্বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিদেশীর সম্মুখে তিনি তাঁহার হিন্দুত্ব, তাঁহার orthodoxy সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলিতেন ; কোন দিন গভর্ণমেণ্ট হাউসে dinner খান নাই ; নিমন্ত্রিত হইলে বলিতেন যে তিনি orthodox হিন্দু, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছেন। এই আত্ম সম্মান বোধ ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলেই বিদেশীগণও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত, তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। এবং তাঁহার সম্মুখে খাটো হইয়া থাকিত। এবং সত্য কথা বলিতে কি, সাহেব জব্দ করিয়া রাখিবাব এই বাঙ্গালীদুর্লভ অসাধারণ শক্তির জন্য তাঁহাব স্বদেশীয়গণ মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিত। এই প্রসঙ্গে আশুবাবুর নিকটেই শ্রুত একটী গল্প বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে Post graduate Department বসাইবার বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশঅনুসারে একটী কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে সাহেবও অনেক ছিল, বাঙ্গালীও অনেক ছিল। আশুবাবু ছিলেন সভাপতি। সকলেই জানিত যে এই ব্যাপার লইয়া একটা তুমুল যুদ্ধ কমিটিতে হইবে, কারণ ভাবতগবর্ণমেণ্ট আশুবাবুর কল্পিত এই Post Graduate Deparmentকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল যে সাহেবরা বিরোধী হইবে। এণ্ডার্স‌ন সাহেব ছিলেন সেক্রেটারী। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে কমিটিতে কোন মতানৈক্য নাই, তাঁহারা unanimous report দিয়া আশুবাবুর মতই সমর্থন করিয়াছেন। সেই সময়ে স্বনামধন্ত Sharp সাহেব ছিলেন ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে। তিনি ত এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে চটিয়াই আগুন, তিনি এণ্ডার্স‌ন সাহেবকে কড়া চিঠি লিখিলেন, তোমরা সব কি করিয়াছ ? তোমরা কি সব ঘুমাইতেছিলে ? আশুবাবু, তোমরা সব সাহেব থাকিতে, কি করিয়া unanimous report বাহির করিতে পারিলেন ? ইহার কিছুদিন পবে শার্পসাহেব কলিকাতা আসিলেন, এবং এক ডিনারে তাঁহার সঙ্গে এণ্ডার্স‌নের দেখা হইলে পুনরায় অনুযোগ করিলেন। তখন এণ্ডার্স‌ন যে জবাব দিলেন তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। তিনি বলিলেন, Well, Mr. Sharp, it is all very easy to write Sharp letters from Simla : but when you have to meet that man face to face, it is quite another question

এই স্বাদেশিকতা, অনেকে হয়ত বলিবেন উৎকট স্বাদেশিকতা, থাকিলেও তিনি প্রতীচ্যকে ঘৃণা করিতেন না, প্রতীচ্যর বিজ্ঞান সাধনা, প্রতীচ্যের অদম্য কর্ম্মশক্তি, প্রতীচ্যেব

অবিচলিত উদ্যম তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন, এবং শুধু তাহাই নহে, নিজের জীবনে প্রতীচ্যের সদ্‌গুণাবলী তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আশুবাবুর কর্ম্মপ্রিয়তা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে—আমাদের এই গরম ও কর্ম্মবিমুখ দেশে সত্যই তাঁহার কর্ম্মপ্রিয়তা ও কর্ম্ম করিবার শক্তি অতি অপূর্ব্ব ছিল—এমন কি পাশ্চাত্যেরাও তাহাতে বিস্মিত হইতেন। সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে আশুবাবুর স্মৃতিসভায় এখনকার প্রধানবিচারপতি Sir Lancelot Sanderson সাহেব বলিয়াছেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম যে আশুবাবু কেমন করিয়া হাইকোর্টে সারা দুপুর অত শ্রান্তিকর কাজ করিয়া আবার বৈকালবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত খাটিতেন। আমার ত এক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলারী করিয়াই আর স্বাস্থ্যে কুলাইল না। Sanderson সাহেব তাঁহার মনের কথাই বলিয়াছিলেন। আর আগেই বলিয়াছি যে হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও যে তাঁহার আর কত কাজ ছিল সংখ্যা করা যায় না। আমাদের আশ্চর্য্য মনে হইত, যে ঐ মোটা দেহ লইয়া কিরকমে তিনি এত কাজ পারিয়া উঠেন। আর এত কাজের চাপেও নিজে কোন দিন বিরক্ত হইতেন না, অথবা কাজ ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিতেন না। একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করি। কি কার্য্য-ব্যপদেশে ঠিক আমার স্মরণ নাই সন্ধ্যার পরে আশুবাবুর বাসায় গিয়াছি · শুনিলাম তিনি তখনও আসেন নাই; হাইকোর্টের পর কোথায় কোন মিটিং ছিল, খুব সম্ভবতঃ Asiatic Societyতে, সেই খানে তিনি সভাপতি, তথায় গিয়াছেন: আমি তাঁহার বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময় দেশপূজ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তথায় উপস্থিত; তিনিও আশুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কতক্ষণ পরে আশুবাবু আসিলেন বাড়ীর মধ্যে গিয়া কাপড় ছাড়িয়াই সংবাদ পাইলেন যে পণ্ডিত মালবীয় আসিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানায় চলিয়া আসিলেন। দেখিয়াই তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মনে হইল। আশুবাবুও বলিলেন যে মিটিং সারিয়া আসিতে তাঁহার দেরী হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতজী বলিলেন যে তাহা হইলে আপনি একটু বিশ্রাম করুন, পরে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবে। আশুবাবু উত্তর করিলেন "Punditji, Rest! Rest is not for me" সত্যই তাঁহার সমস্ত জীবনই এই অক্লান্ত খাটুনির ভিতর দিয়া গিয়াছে; আর সেই জন্যই বুঝি যখন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একটু বিশ্রামের সময় আসিয়াছিল, তখনই প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে কাড়িয়া লইলেন। হাইকোর্টের জজিয়তী তারপর ডুমরাঁও কেসের খাটুনী, আর সেই খাটুনী যেই শেষ হইয়া আসিল, তাহাতেই মহাপ্রয়াণ। সত্যই আশুবাবু বলিয়াছিলেন Punditji, rest is not for me ইংরাজীতে যাহাকে বলে dying in harness, আশুবাবুর ভাগ্যে তাহাই হইল, বোধ হয় ইহাই তাঁহার কামনা ছিল।

এই যে কর্ম্মশক্তি ইহা তাঁহার সম্ভবই হইত না যদি তাঁহার মধ্যে কার্য্যশৃঙ্খলাগুণ খুব বেশী পরিমাণে না থাকিত। এই পাশ্চাত্য গুণও তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাঁহার কাজ করিবার পদ্ধতির regularity অতি অসাধারণ। তাঁহাকে একদিন তাঁহার

যৌবনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে আমার নিজেরও মনে হয় যে এই regularity আমার অনেক সাহায্য করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কয়টার সময় উঠেন? তিনি বলিলেন, 'ভোর চারিটার সময়।' আমি বলিলাম, 'কতদিন ধরিয়া?' তিনি বলিলেন, "শৈশব হইতে, আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ঐ সময়েই উঠিতেছি। এখনও মনে পড়ে ছেলেবেলা যখন বাল্যশিক্ষা পড়িতাম, সকালবেলা মাষ্টার মহাশয় পড়াইতে আসিতেন, আমি ভোর চারিটার সময় উঠিয়া পিলসুজের বাতির নিকট গিয়া একটী চৌকিতে বসিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া রাখিতাম। বাড়ীর অন্যান্য ছেলেরা দেরীতে উঠিয়া পড়া করিয়া উঠিতে পারিত না, মাষ্টার মহাশয়ের বকুনি খাইত, আমার খুব মজা লাগিত।" সকলে জানেন আশুবাবু চৌরঙ্গীর পাশে গড়ের মাঠের রাস্তা ধরিয়া প্রত্যহ প্রাতঃভ্রমণ করিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সকালবেলা গড়ের মাঠে কতদিন ধরিয়া বেড়াইতেছেন?" তিনি বলিলেন 'চল্লিশ বৎসর ধরিয়া'। তাঁহার সব বিষয়েই regularity এই রকম অদ্ভুত।

আমাদের দেশে সচরাচর এই সব পাশ্চাত্যদেশসুলভ গুণের বড় অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার কর্ম্মশক্তি, এই প্রকার নিয়মানুবর্ত্তিতা এই প্রকার উৎসাহ ছিল বলিয়াই এত বিবিধ ক্ষেত্রে তিনি সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন। শারীরিক শ্রমশীলতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। শরীরের প্রতি দৃষ্টি, ব্যায়াম, এই সকল আমরা সাধারণতঃ গ্রাহ্যই করি না। আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও এ গুণ বড় কমই দৃষ্ট হয়। বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া এই বিষয় আদর্শস্থানীয় বাঙ্গালী বড় কমই আছেন। এই জন্য লোকে কত আশা করিয়াছিল যে আরও অন্ততঃ কুড়ি বৎসর কাল আশুবাবুকে আমরা পাইব; তাঁহার যে শারীরিক শক্তি ছিল তাহাতে ইহা কিছুমাত্র দুরাশা ছিল না। এ জন্যও তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যু লোকের মনে বড় লাগিয়াছে।

পাশ্চাত্যজাতিসুলভ এই সব গুণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রাচীন সমাজের যে সব ভাল ভাল গুণ তাহাও তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। প্রথমেই মনে পড়ে তাঁহার সামাজিকতা। আলাপে ব্যবহারে নিমন্ত্রণে আপ্যায়নে তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ্য প্রাচ্য ধারা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়ছিলেন। সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন; অত বড় একটা লোক কিন্তু কোন প্রকার আভিজাত্যের ভাব বা exclusion ছিল না; তাঁহার বৈঠকখানা আবাল যুবক বৃদ্ধের সমাবেশ ক্ষেত্র ছিল; ছাত্রদিগের তিনি পরম বন্ধু, আশুবাবুর কাছে তাহাদের ত সাতখুন মাপ; পড়া শুনা নিয়া কারও কোন গোলমাল বা অসুবিধা হইল, ধর গিয়া আশুবাবুকে; চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, ধর গিয়া তাঁহাকে; আর তিনি অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত দিনের পর দিন এই সমস্ত লোকের কথা শুনিতেন। তাহাদের উপকার করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, কত দুঃস্থ ছাত্রকে বই কিনিয়া দিয়া বা অন্যপ্রকারে অর্থসাহায্য করিতেন; দেখা না পাইয়া তাঁহার ঘর হইতে কাহারও ফিরিয়া যাইতে হইত না। এই কারণে অনেক প্রসিদ্ধ লোক যেমন শুধু নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন, কদাপি নরলোকের চক্ষুগোচর হন না, আশুবাবুর প্রসিদ্ধি সেই প্রকার হয় নাই। অসংখ্য লোকের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল; এবং এই পরিচয় রক্ষা করিতে

সাহায্য করিয়াছিল তাঁহার অদ্ভুত স্মরণ শক্তি। যাঁহাকে একবার দেখিতেন তাঁহাকে ভুলিতেন না; বিশ্ববিদ্যালয়ের calendar তাঁহার মুখস্থ ছিল। এবং এই পরিচয় শুধু লৌকিক দুটী কথাতেই পর্য্যবেসিত হইত না; তিনি গুণের সমাদর করিতে জানিতেন, এবং গুণীকে উৎসাহ দিতে জানিতেন। এই সামাজিকতা, লৌকিকতা ও অবাধে পরিচয়ের ফলে আশুবাবুর মৃত্যুকে যত লোক নিজেদের personal loss বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং মর্ম্মাহত হইয়াছেন, এরকম অন্য বড় লোকের মৃত্যুতে হয় নাই। হিন্দু গৃহস্থের সব সদগুণই তাঁহাতে ছিল। তিনি মাতৃবৎসল পুত্র, প্রেমিক স্বামী, স্নেহপ্রবণ পিতা ছিলেন। তাঁহার প্রথমা কন্যার দুর্ভাগ্যে তিনি যে মনে কতবড় দাগা পাইয়াছিলেন, এবং কন্যার মৃত্যুতে যে কি পরিমাণে শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা তাঁহার পারিবারিক জীবনের খোঁজ রাখেন তাঁহারাই অবগত আছেন। শেষের সে শোক তিনি জীবন থাকিতে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; অনেকের ধারণা যে তাঁহার নিজের শরীর ভঙ্গের কারণও অনেকটা ইহাই; পাটনায় মৃত্যুশয্যায় শুইয়া তাঁহার সেই উক্তি কমলা! মা, তুমি আমায় ডাক্‌ছো! স্মরণ করিলে আমাদেরও অশ্রুসংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। অতি সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের জীবন যাত্রা যে প্রণালীতে চলে, আশুবাবুর গৃহের ব্যবস্থা পদ্ধতিও ঠিক্ সেই প্রণালীতেই চলিত। তাঁহার আতিথেয়তাও ছিল চমৎকার; লোক খাওয়াইতে তাঁহার কি উৎসাহ; এবং যেমন খাওয়াইতে তেমনি খাইতেও তাঁহার উৎসাহ কিছু কম ছিল না। অন্য বিষয়ে তিনি যেমনই হউন না কেন, ভোজন বিষয়ে যে তাঁহার বিপ্রত্ব ষোলআনা বজায় ছিল তাহা তাঁহার অতিবড় শত্রুও অস্বীকার করিতে পারিবে না। আশুবাবুর ভীমনাগের সন্দেশপ্রীতি ত প্রায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর শুধু সন্দেশে নয় সর্ব্ববিধ ভোজ্য দ্রব্যেই তাঁহার বিচারপতিসুলভ অপক্ষপাতই ছিল। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে রাসবিহারী বাবু ও আশুবাবু এই দুইজনের এক বৈঠকে বসিয়া খাইবার দৃশ্য একটি দেখিবার জিনিষ ছিল। আমি নিজেও কত দিন Mathematical Societyতে দেখিয়াছি এবং স্বীকার করিতে হয় যে কতকটা ঈর্ষার সঙ্গেই দেখিয়াছি যে সভাপতি আশুবাবুর জলযোগের জন্য আনীত কমলালেবু, স্তূপীকৃত সন্দেশ ও রাশীকৃত ডাব আনা হইয়াছে, আর তিনি খাঁটী সদ্‌ব্রাহ্মণেরই ন্যায় অবলীলাক্রমে সেইগুলিকে সংহার করিতেছেন। এই dyspeptic যুগের বাঙ্গালীর কাছে এ দৃশ্য দেখিয়াও সুখ। রাজা রামমোহন রায়ের খাওয়ার কথা বহিতে পড়িয়াছি, আশুবাবুর খাওয়া দেখিয়াছি। আর এক কারণে তিনি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার হাস্যপরিহাসপ্রিয়তা, তাঁহার রসিকতা, তাঁহার আমোদী স্বভাব। আমাদের ভিতরে অনেকে আছেন যাঁহারা তাঁহাদের পদগৌরবে অত্যন্ত গুরুভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন, এবং গাম্ভীর্য্যটাও স্বভাবসিদ্ধ করিয়া ফেলেন, এবং চটুলতা ও ছেলেমিকে অশোভন মনে করেন। কিন্তু আশুবাবুর এই অবিচলিত, অটুট গাম্ভীর্য্য ছিল না। গম্ভীর, আবশ্যক হইলে, তিনি হইতে পারিতেন না এমন নহে, প্রলয়ের মেঘের মত এই রকম গাম্ভীর্য্যও তাঁহার বদনমণ্ডলে দেখিয়াছি, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় সাধারণ অবস্থায় তাঁহার চটুল রঙ্গপ্রিয় ও চকিত কটাক্ষ, লঘু পরিহাস, ও প্রাণ খোলা অট্ট হাস্য তাঁহার

সান্নিধ্যকে ভীষণ না করিয়া অত্যন্ত মনোহর ও উপভোগ্য করিয়া তুলিত। গল্প করিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন ; আর anecdote ও তাঁহার জিহ্বাগ্রে ছিল ; এক কথায় conversationalist হিসাবে তিনি খুব brilliant ও চিত্তাকর্ষক ছিলেন। তাঁহার মত লোকের বালসুলভ চপলতা বড়ই প্রীতিকর লাগিত। একদিনের আমার নিজের সম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়ে ; এখন আমার মনে হইতেছে সেই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ ; তাই সেই পরিহাসের আনন্দের সঙ্গে আমার বিষাদ মিশ্রিত হইয়া আছে। গতবৎসর বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচনে আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে candidate দাঁড়াইলাম, শেষে অকৃতকার্য্য হই, তারপর একদিন আমি কি কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া রেজিষ্ট্রারের কামরায় প্রবেশ করিয়াছি ; ঢুকিয়াই দেখি যে আশুবাবু চোখাচাপকান পরিয়াই হাইকোর্ট হইতে তথায় আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন "হেরো। হেরো! হেরো! চিরটা কাল ফার্ষ্ট হয়ে এখন হেরে গেলি ?" আমি হাসিতে লাগিলাম। আর একদিন সে অনেক বৎসরের কথা। তখন সবে মাত্র এম্, এ পাশ করিয়াছি। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক মধুসূদন সরকার মহাশয়ও সেবার এম্, এ পাশ করিয়াছেন। এবং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা দুইজনে আশুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। অন্যান্য কথাবার্ত্তা অনেকক্ষণ ধরিয়া হইবার পর কে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি আসিলেই, আশুবাবু আমাদের দুজনকে দেখাইয়া কহিলেন "দেখ্‌ছেন মশাই, এ দুজন কে। এক চড় দিলে কিন্তু পড়ে যায়। কিন্তু এরাই অশ্বিনীবাবুর দলের গুণ্ডা, গবর্ণমেণ্ট বলে anarchist ; do they look like it ?" আর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আর একদিন আমি বসিয়া আছি, এমন সময়ে সরকারী চাকুরীপ্রার্থী এক যুবক আশুবাবুর নিকট আসিয়া জানাইলেন যে তিনি উঁহার নিকট একখানা সার্টিফিকেট পাইলে বড় উপকৃত হন। আশুবাবু বলিলেন "দেখ বাপু। তুমি ভুল করছ। You have come to the wrong shop. আমি সার্টিফিকেট দিলে তোমার সরকারী চাকুরী এমনি যদি বা হ'ত তাও খসে যাবে।' ওরা আমায় মনে করে কি জান, ওরা ঠিক করে বসে আছে, আমি বোমাওয়ালার সর্দ্দার। তবে ওরা আমায় কিছু বলে না কারণ আমায় ভয় করে। they are afraid of me !" আর অট্টহাস্যে কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল। আশুতোষের এই Homeric laughter বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে।

চরিত্রে এই সমস্ত আপাতবিরোধীগুণের সমাবেশে, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রধর্ম্মের, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে আশুতোষ এত বড় হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত অতিক্রম করিয়া, এ সমস্ত ছাপাইয়া যে শক্তিতে তিনি অদ্বিতীয় কর্ম্মী ও নেতা হইয়াছিলেন, সে শক্তি তাঁহার অদম্য আত্মবিশ্বাস ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মনীষায় তিনি বড়, কিন্তু তদপেক্ষা বড় মনীষীও হয়ত দেশে আছেন ; শুধু কর্ম্মপরায়ণতায় তিনি বড়, কিন্তু তদ্রূপ কর্ম্মঠ লোকও হয়ত আছেন ; সামাজিকতায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু সে রকম সামাজিক প্রকৃতির লোকও আরও আছেন ; কিন্তু এ সকলের সমবায়েই শুধু যথেষ্ট হইত না—যাহা তাঁহাকে বাঙ্গালায়

এই লোকারণ্যে বিশাল বনস্পতিরূপে পরিণত করিয়াছিল, সর্ব্বংসহ দেশনায়করূপে পরিণত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার মেরুদণ্ড এবং তাঁহার magnetism। শক্তি সংক্রামক, বিশ্বাসও সংক্রামক। নিজের শক্তিতে, নিজের আদর্শে দৃঢ়বিশ্বাস অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করে। দুর্ব্বলকে বল দেয়; এবং সেই চৌম্বক শক্তিতে কাঁচা লোহাকে চুম্বকে পরিণত করে। যে আত্মবিশ্বাসের বলে যৌবনে তিনি Sir Alfred Croftকে বলিয়াছিলেন—Sir Alfred Croft তাঁহাকে একটা অধ্যাপকতা দিতে চাহিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে দেখ আশু, তুমি যে Bar join করিতে চাও, Bar তো ভয়ানক over crowded—"Bar over-crowded! I know. But it is overcrowded with rubbish!"—সেই আত্মবিশ্বাস উত্তরকালে আরও গভীরতর আরও ব্যাপকতর হইয়া, এবং স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস ও স্বদেশের প্রতি বিশ্বাস তৎসঙ্গে যুক্ত হইয়া, তাঁহাকে সমস্ত কর্ম্মে সমস্ত উদ্যমে অগ্রযুক্ত করিয়াছিল। এই বিশ্বাসের বলেই আজন্মকাল নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে চাদর নিবারণী সভার মোড়লী করা হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনে, দেশনায়ক বা সুরেন্দ্রনাথ যখন Contempt of Court অপরাধে দণ্ডিত হইলেন, তখন ছাত্রসঙ্ঘের দলপতি হইয়া হাইকোর্টের লোহার গেট ভাঙ্গিবার উদ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া, কর্ম্মজীবনে, সর্ব্বত্র, হাইকোর্টে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতৃত্বই করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্বাস, এই সাহস, এই নেতৃত্ব, এই গুণেরই আমাদের বড় অভাব। আমরা হয়ত আজ্ঞাবহ হইয়া বেশ ভাল পথে করিতে পারি; কিন্তু নেতা হইয়া সংঘবদ্ধ করিয়া দৃঢ়ভাবে কর্ম্ম প্রচেষ্টা পরিচলিত পারি না। আমাদের দেশে অতি অল্প লোকের এই গুণ আছে। সম্ভবতঃ বহুবর্ষের পরাধীনতারই ইহা বিষময় ফল! initiative ও সাহস উঠিয়া গিয়াছে। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎগুণ সাহস; এবং সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও নীচতার নিকৃষ্টতম ভীরুতা। তেজের সহিত, সাহসের সহিত, কেহ যদি একটা অন্যায় অত্যাচারও করে, তাহার জন্য কোন ভয় নাই, তাহার conversion হইলে সে বাস্তবিকই মহৎ লোক হইতে পারে; কিন্তু ভীরুর পরিত্রাণ নাই। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের অন্যতম নেতা দাঁতো বলিয়াছেন "l'audace, encore l'audace toujours l'audace"—চাই সাহস, আরও সাহস, সর্ব্বদা সাহস। বাঙ্গলার আশুতোষ সেই কথাই প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন "Boldness always appeals to me, timidity never does"। তেজস্বী আশুতোষই বলিয়াছেন "Freedom first, freedom second, freedom always"।

এই সাহস ও বীরত্বেরই আর একটা প্রকাশ আশুতোষের বিরাট অসহয়নীয় এবং বিরাটভাবে সেই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তিতে ও উদ্যমে বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁহার সেই কল্পনাশক্তিও কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তির প্রধান নিদর্শন। বৃহদ্ভাবে যে এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার শক্তি তাহা আশুতোষের ছিল, এবং তাহাই তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব। He could build like a Titan। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। তাই লর্ড লীটন সভাসত্যাই আশুতোষের স্মৃতিসভায় বলিয়াছেন "আশুতোষ যথার্থ ই গর্ব্ব করিতে

পারিতেন, যে আশুতোষই বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ই আশুতোষ"। দোষ ত্রুটি সব কাযেরই আছে, তাঁহার কাযেরও ছিল; কিন্তু সে দোষ ত্রুটি সর্ব্বাগ্রে আমাদের চক্ষে পড়িলেও, তাহাই প্রধান নয়, প্রধান এবং প্রকৃত হইতেছে সেই বিপুল প্রাসাদ যাহা তাহার শিল্পীর কল্পনা ও কর্ম্মশক্তির জীবন্ত সাক্ষ্য প্রকাশ করিতেছে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "we cannot see the wood for the trees"; সেই পরিমাণজ্ঞানহীনতা, সেই sense of proportionএর অভাব আমাদের অনেকেরই আছে; তাই বিচার তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া ভুল করিয়া ফেলি। এই বিপুল প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আবার অত্যন্ত ছোট খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ দিবার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা আশুতোষের ছিল। এই বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা বাস্তবিকই Napoleonic। লোকে তাই পরিহাস করিয়া বলিত, বড়লাটের সঙ্গে ঝগড়া হইতে আরম্ভ করিয়া হার্ডিংহষ্টেলের সিঁড়ির মাপ পর্য্যন্ত আশুবাবু না হইলে হয় না। অবশ্য এই প্রকার বিরাট্ ব্যাপকতার দোষ আছে; ইহাতে উপযুক্ত লোক তৈয়ারী হয় না; বিশাল বনস্পতির আওতায় পড়িয়া ছোট গাছ আর বড় হইতে পারে না। কিন্তু ছোট গাছের পক্ষে ইহা যতই ক্ষতিকর হউক না কেন, বনস্পতির ইহাতে বিশালতাই প্রকটিত হয়।

ব্যক্তিত্বের এই বিপুলতার জন্যই আশুতোষ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে, আমাদের দেশের এই যে পনের আনা লোক ঘাসের চাপড়ার মত ধরণীর বক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে, কোন মতে কায়ক্লেশে কাতর ক্লিষ্টভাবে জীবনটিকে করুণরূপে আঁকড়িয়া ধরিয়া কথঞ্চিৎ টিঁকিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতেই জীবন সফল হইল বলিয়া মনে করিতেছে, এই উদ্যমহীন, উৎসাহহীন, বৈচিত্র্যহীন তৃণাবৃত সমাজের মধ্যে হঠাৎ যে একটা সবল, সতেজ, সপ্রাণ মহান্ মহীরুহ গজাইয়া উঠিল, ইহাকে কি বলিব? ইহা কি ভারতীয় প্রকৃতির একটা ব্যতিক্রম—একটা exception, একটা freak? যদি তাই হয়, তবে সেই ব্যতিক্রমকেই চিরস্নেহে চিরআদরে চিরগৌরবে ভারতজননী মণ্ডিত করিয়া রাখিবেন। তবে ইহাও কি আমরা আশা করিতে পারি না, যে এই নবজাগরণের দিনে, নবশক্তির উন্মেষে, এই নবীন ভারতে এই ব্যতিক্রম আর অতিপ্রাকৃত থাকিবে না, তাহাই নিয়ম হইবে, তাহাই সাধারণ হইবে, তাহাই সহজ হইবে, বাঙ্গলার শার্দ্দুলের জলন্ত জীবন প্রভাবে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পুরুষ শার্দ্দুলের উদ্ভব হইবে? কবির প্রার্থনাই নিয়ত মনে ধ্বনিত হয়—

অবনত ভারত চাহে তোমারে
ওহে সুদর্শনধারী মুরারী।
সম্মান শৌর্য্যে পৌরুষ বীর্য্যে
কর পূরিত নিপীড়িত ভারত তোমারি।

এই প্রার্থনা সফল হউক।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

সেকালের রাইয়ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গতর খাটানোর মতন জমিদারদের আর একটা জবরদস্তি ছিল সেটা শস্য-কাটার কাল নির্দ্ধারণ করা। বাবুরা রাইয়তদিগকে হুকুম করিতে পারিত কবে কখন জমির ঘাস কাটা হইবে, আঙুর তোলা হইবে, শস্য কাটা হইবে ইত্যাদি। অনেকের বিশ্বাস যে এই ধরণের দিনক্ষণ ঠিক করিয়া দেওয়া খাঁটি ফিউদ প্রথার এক অনুষ্ঠান। বাস্তবিক পক্ষে এ এক অতি পুরাতন রীতি। মান্ধাতার আমলের যৌথ সম্পত্তির যুগেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল।

সেকালের পল্লী-বৃদ্ধেরা জটলা করিয়া স্থির করিত কবে কোথায় সমবায়ের জানোয়ারগুলা স্বাধীনভাবে চরিতে পারিবে। তদনুসারে চষা জমির শস্যকাটার দিনও সমবেত ভাবে স্থির করা হইত। অর্থাৎ "বাঁ দ' মোআস" ছিল পল্লীবাসীদের স্বরাজেরই এক অঙ্গ।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ফিউদারের উৎপত্তি হয়। জমিনফিউদার বাবুরাও আবার নিজ নিজ ফসল বিক্রী করিবার রীতি কায়েম করে। তখন পল্লী সমবায়ের এক্তিয়ার তুলিয়া দিয়া বাবুরা নিজে শস্য কাটার দিনক্ষণ কায়েম করিতে লাগিয়া যায়। এইখানে এক জুলুম সুরু হয় এই কারণে যে, পল্লীবাসীরা জমিদারের পূর্ব্বে বাজারে মাল হাজির করিবার সুযোগ পাইত না। বাবুরা নিজ ফসল মোটালাভে বেচিবার পর পল্লীসমিতিকে "বাঁ" কায়েম করিতে অনুমতি দিত।

জমিদারি প্রথার আর এক জুলুমকে বলে ফরাসীতে "বানালিতে"। রাইয়তরা বাবুদের কোনো কোনো সম্পত্তি বা যন্ত্রপাতি নিজ নিজ কাজের জন্য ব্যবহার করিতে বাধ্য থাকিত। বাবুর বাড়ীতে যাইয়া আটা ভাঙিয়া আটা অথবা রুটি তৈয়ারি করিয়া লওয়া নেহাৎ বকমারি সন্দেহ নাই তাহার উপর আটা রুটি ইত্যাদি তৈয়ারি মালের কিয়দংশ বাবুর লভ্য বিবেচিত হইত।

কিন্তু এই যে "বানালিতে" প্রথা ইহাও খাঁটি ফিউদ প্রথার প্রতিষ্ঠান নয়। মান্ধাতার আমলের যৌথ সম্পত্তির যুগেও পল্লীবাসীরা এইরূপ যৌথ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ছিল। সেকালে গোটা পল্লীর জন্য এক ব্যক্তি বাহাল থাকিত জানোয়ার চরাইতে। তাহাতে প্রতিপালন হইত পল্লীসমবায়ের আয় হইতে। সেইরূপ পল্লীসমবায়ের অধীনে কল, জাঁতা, কসাইখানা ইত্যাদি যৌথ প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। পল্লীবাসীরা নিজ নিজ সুবিধামত এই সকল প্রতিষ্ঠানের সদ্ব্যবহার করিত। কতকগুলা হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ সবল জানোয়ার পল্লীসমবায়ের যৌথসম্পত্তিস্বরূপ রাখা হইত। এইগুলার সাহায্যে পল্লীবাসীরা নিজ নিজ জানোয়ারের বংশবৃদ্ধি করাইয়া লইত।

কোথাও কোথাও যৌথ রান্নাঘরও থাকিত। বিভিন্ন পরিবারের লোকেরা এই

যৌথ রান্নাঘরে আসিয়া নিজ নিজ রুটি তৈয়ারি করাইয়া লইত। পল্লীতে আগুনের খরচ কমাইবার জন্য এই প্রথা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। পল্লীবৃদ্ধদের সভা হইতে এই যৌথ উনন তদবির করিবার ব্যবস্থা করা হইত। উননে পল্লীবাসীদের রুটি ভাজিবার জন্য সার্ব্বজনিক পাচক মোতায়েন থাকিত। এই গেল পল্লীস্বরাজের "স্বর্ণযুগের" কথা।

কিন্তু জমিদারি প্রথা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যৌথ উননটা আসিয়া পড়িল বাবুর হাতে। বাবুর লোকজন হইল পাচক। তাহার দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার জন্য পল্লীবাসীদিগকে কর দিতে হইত। ১২২৩ সালের এক অনুশাসনে জানিতে পারি যে বাঁস্ জনপদের মোহান্ত রুটি ভাজা হইলে পুরোহিত সর্দ্দারের হিস্যায় একটা করিয়া পড়িবার ব্যবস্থাও তাহাতে দেখিতে পাই।

বুশে দার্জি "কোদ রুরাল" (পল্লী-কানুন) নামক গ্রন্থে "বানালিতে" বা যৌথ সরঞ্জাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ১৫৬১ এবং ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের অনুশাসন অনুসারে পল্লীবাসীরা ফিউদার বাবুদের জাঁতায় আটা ভাঙিতে গিয়া যোল ভাগের একভাগ এবং এমন কি তের ভাগের একভাগ মালিককে কর দিতে বাধ্য থাকিত। পরবর্ত্তী কালে জাঁতার মালিক দশ ভাগের একভাগ পর্য্যন্ত দাবী করিতে পারিত।

এই ধরণের ফকমারি ও জুলুম চলিতে পারে একমাত্র তখন যখন সমাজে ধনোৎপাদনে ঘাঁটা পড়িয়াছে। বস্তুত: সে যুগে লোকজনেরা আর্থিক প্রচেষ্টায় এক প্রকার ঢিলা দিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জমিদারি প্রথার এই সকল উৎপাত নবীন তন্ত্রের বুর্জোআপন্থী স্বদেশ সংস্কারকের পক্ষে চক্ষুঃশূল সন্দেহ নাই। ১৭৯০এর বিপ্লবে ফিউদপ্রথার আনুষঙ্গিক হিসাবে "বানালিতে" প্রথা উঠিয়া যায়।

গির্জ্জা বা দেবালয় কালে পুরোহিত মোহান্তদের একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মোপাসনার দিনক্ষণ ছাড়া গির্জ্জায় আজকাল অন্য কোন সময়ে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এই সকল ধর্ম্মগৃহ বা মন্দিরই সাবেক কালে গোটা পল্লীর সমবেত সম্পত্তি ছিল। পুরোহিত, জমিদার এবং কিষাণ এই তিনে মিলিয়া গির্জ্জার মালিক থাকিত।

বেদি-অংশটা ছিল পুরোহিতদের এলাকায়। "চান্সেল" থাকিত জমিদারদের তাঁবে। পুরোহিত এবং বাবুরা নিজ নিজ অংশের মেজে, কাঠের কাজ ইত্যাদি মেরামত করিতে বাধ্য থাকিত। বেদিতে দেবতার মূর্ত্তি থাকে। এইখানে পূজা, "মাস্" অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের প্রাণদান যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। চান্সেল অংশে আসিয়া পুরোহিত যজমানদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে অভ্যস্ত।

গোটা গির্জ্জার ভিতর বেদী এবং চান্সেল অতি অল্পস্থান মাত্র অধিকার করে। গির্জ্জার প্রধান অংশ—সমগ্র ভবনটা—"নেভ" নামে অভিহিত। এই "নেভ্" ছিল পল্লীবাসীদের সম্পত্তি। এই খানে আসিয়া কিষাণরা বাজার কায়েম করিত, পঞ্চায়েৎ বসাইত এবং নাচ-গানের ব্যবস্থা করিত। অথবা দরকার হইলে গির্জ্জার এই অংশ ধর্ম্মগোলারূপে জনগণ কর্ত্তৃক কাজে লাগানো হইত।

১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের এক গির্জ্জা-কানুনের বিধান এই :—"গির্জ্জা একমাত্র ভগবৎপূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট। এইখানে কোনো প্রকার মহোচ্ছব, নাচ গান তামাসা, আমোদপ্রমোদ, রঙ্গাভিনয়, বাজার মিছিল বা ঐ জাতীয় অশোভন কিছু করা চলিবে না।"

ইংরেজ ধনবিজ্ঞানবিৎ থরল্ড রজার্স তাঁহার ইকনমিকাল ইণ্টারপ্রেটেশান অব্ হিষ্ট্রি (ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন মধ্যযুগে গির্জ্জাটা পল্লীবাসীদের যৌথভবন স্বরূপ ছিল। এই ভবনই আপদবিপদের সময় দুর্গের কাজ করিত। পল্লীর গোড়াপত্তন হইবার সময় যেখানে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রথম খুঁটার ব্যাড়া গাড়া হইত ঠিক সেইখানেই গির্জ্জা গড়িবার দস্তুর ছিল।

গির্জ্জার ঘণ্টাগুলাও থাকিত জনসাধারণের সম্পত্তি। পঞ্চায়েতের সভা ডাকিবার জন্য পল্লীবাসীরা আসিয়া এইগুলা বাজাইত। কোথাও আগুন লাগিলে অথবা দুস্মনের আক্রমণ ঘটিলেও কিষাণরা গির্জ্জার ঘণ্টা বাজাইতে অভ্যস্ত ছিল।

এই ঘণ্টাগুলার বিরুদ্ধে রাজরাজড়ারা অনেক সময় মোকদ্দমা পর্য্যন্ত চালাইয়াছে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কাজীর বিচারে ফরাসীরা পল্লীবাসীদের ঘণ্টাকে সাজার যোগ্য বিবেচনা করিত। নূন-কর আদায় করিবার জন্য তহশিলদার আসিতেছে, এই সংবাদ প্রচার করার জন্য ঘণ্টাগুলাকে অনেকবার সাজা দেওয়া হইয়াছিল।

ঘণ্টাগুলাকে সাজা দিবার রীতি এই। গির্জ্জার চূড়া হইতে এই গুলা নামাইয়া লওয়া হইত। পরে আদালতের জল্লাদ নিজ হাতে ঘণ্টার উপর চাবুক লাগাইত। ঘণ্টার পক্ষে এই ছিল চরম সাজা। কেননা ক্রিস্‌ম ঋষির তেল, ধূপ, উপাসনা, ভজন ইত্যাদি ষোড়শোপচারে যে ঘণ্টার পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে আকাশ হইতে নামাইয়া এইরূপে বে-ইজ্জদ করা যে সে কথা নয়।

যাহা হউক, গির্জ্জাকে মোহন্তদের জমিদারিতে পরিণত করা ফিউদযুগের এক চূড়ান্ত জুলুম স্বীকার করিতেই হইবে। জমিদারের "মানর" প্রাসাদের সঙ্গে টক্কর দিবার জন্যই পল্লীবাসীরা এই ধর্ম্মভবনের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই আওতার তাহারা একসঙ্গে কঠোর কোমল মাতৃ স্নেহ দাবী করিতে অধিকারী ছিল।

সে যুগের আর এক জুলুম "টাইদ" কর। গির্জ্জার মোহন্তরা কিষাণ বাবু উভয়ের উপরই এই কর বসাইত। প্রথম প্রথম অবশ্য উভয়েই নিজ নিজ ফসলের কিয়দংশ গির্জ্জাকে স্বেচ্ছায়ই দিত। আজও আইরিশ সমাজে এইরূপ স্বেচ্ছাদত্ত টাইদ প্রচলিত আছে। তখন কার দিনে অবশ্য যাদুকরেরাও পুরোহিতদের মতনই জনগণের স্বেচ্ছা দানে ভাগ বসাইত।

নবম শতাব্দীর এক পুরোহিত সর্দ্দার আগোবার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে এই দক্ষিণা পুরোহিতদের কপালে জুটে কম পরিমাণে, ভূতুড়ে কাণ্ডের সাহায্যে যে সকল লোক ঝড় বৃষ্টি উঠাইতে নামাইতে পারে তাহারাই পল্লীবাসীদের ভক্তি এবং দক্ষিণা বেশী আকৃষ্ট করিত।

টাইদগুলা কালে অবশ্য দেয় খাজনায় পরিণত হয়। কি ঐহিক কি আধ্যাত্মিক উভয় শ্রেণীর স্বামীর অর্থাৎ বাবু এবং মোহন্ত দুয়েই জনগণকে টাইদ দিতে বাধ্য করিত। "টাইদ

ছাড়া জমিন থাকিতেই পারে না"—এই ছিল তখনকার নীতিশাস্ত্রের বয়েৎ। অবশ্য সে যুগে টাইদ পাওয়ার মূল্যস্বরূপ জমিদাররা রাইয়তদিগকে কোনো প্রকার অধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিত না। এই কর ছিল ষোল আনা জবরদস্তি। স্বেচ্ছার দান হইতে অত্যাচারের যন্ত্র কায়েম করা খাঁটি সোনাকে অকথ্য তামায় রূপান্তরিত করার সমান মর্ম্মান্তিক কষ্টদায়ক।

(২)

জমিদার মোহন্তদের দাবীদাওয়াগুলা প্রথম অবস্থায় ছিল রাইয়ত, প্রজা, ভূমিগোলাম ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের স্বেচ্ছায় দেওয়া অধিকার। কম-সে-কম জমিদার প্রজায় একটা পরিবারিক সম্বন্ধ সর্ব্বদাই বিরাজ করিত। গতর খাটা, খাজনা, টাইদ ইত্যাদি পাইয়া বাবু বাবাজীরা জনগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য থাকিত। কিন্তু এই সব পরবর্ত্তীকালে আসল জোর জবরদস্তিতে দাঁড়াইয়া যায়।

জমিদারির জমিজমাগুলার ক্রমবিকাশও ঠিক এইরূপ। প্রথম প্রথম একটা সামরিক পদে বাহাল হইয়া বাবুরা খানিকটা সার্ব্বজনিক জমির মালিক হইত। ঠিক মালিক বলাও চলে না। পল্লীবাসীদের সামরিক জমি ভাগবাটোয়ারায় এই সকল সামরিক কর্ম্মচারীদের একটা হিস্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিত, এইরূপ বলিলেই জমিদারির উৎপত্তি ঠিক বুঝা হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে চুরি জুয়াচুরি করিয়া ছলেবলেকৌশলে বাবুবাবাজীরা জনসাধারণের জমিজমা দখল করিয়া "রাজা" হইয়া বসিয়াছে।

স্কটল্যাণ্ডের এবং ইংলণ্ডের বাবুরা "য়োম্যান" শ্রেণীর স্বাধীন কিষাণসমাজকে নিষ্ঠুর-ভাবে ভিটা মাটি উচ্ছন্ন করিয়া ছাড়িয়াছে। সেই অত্যাচারকাহিনী কার্ল মার্কস প্রণীত "কাপিটাল" (বা পুঁজি) নামক গ্রন্থের সাতাইশ নং অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। জমিজমা হইতে চাষীরা কিরূপে বিতাড়িত হইয়া থাকে সেই বিষয়ে মার্কস এখানে আলোচনা করিয়াছেন।

"হোলিনশেড্‌স্ ক্রণিকল" নামক বিলাতী ঐতিহাসিক কাহিনীমালার অন্যতম গ্রন্থ সম্পাদক হারিসন জমিচোরদের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে বলিতেছেন: ইহারা অতি অল্প কালের ভিতর স্বাধীন রাইয়তদিগকে জমিহীন করিয়া ছাড়িয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বিলাতে অধিকাংশ পল্লীবাসীই নিজ নিজ ভূমিতে মালিক বিবেচিত হইত। অবশ্য জমিদারদের সঙ্গে দেনাপাওনা এবং বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধও নানা প্রকার ছিল কিন্তু ইহাদিগকে যেন কিছুতেই জমিহীন বিবেচনা করিতে পারিত না। ঐতিহাসিকগণের আলোচনায় বুঝিতে পারিব, সে যুগে বিলাতে অন্তত পক্ষে ১৫০,০০০ এইরূপ স্বাধীন কিষাণ বসবাস করিত। ইহাদের সংখ্যা সপরিবারে গোটা ইংরেজ জাতির সাতভাগের এক ভাগ এইরূপ অনুমান করা চলে। এই সকল জমির মালিক কিষাণরা বৎসরে ৬০।৭০ পাউণ্ড অর্থাৎ আজকালকার ভারতীয় মুদ্রার প্রায় ১০০০৲ আয় ভোগ করিত।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে এই স্বাধীন কিষাণদের জমিজমার ভাঙন লাগে। বড় বড় বাবু বাবাজীরা কিষাণদিগকে জমি হইতে খেদাইয়া দিতে সুরু করিয়াছিল। এইরূপ জমি বাজেআপ্ত করিবার কারণ পাওয়া যায় সে কালের শিল্পের ইতিহাসে।

বেলজিয়ামের অন্তর্গত পশম ব্যবসায়ের জেলাগুলার তাঁতীরা ইয়োরোপে প্রবল হইতে-ছিল। তাহার ফলে বিলাতের পশমওয়ালারা দাম বাড়াইতে লাগিয়া গিয়াছিল। কাজেই সকলেই পশম তৈয়ারি করিবার কাজে, অর্থাৎ মেষ পালন বা ভেড়ার চাসে নজর দিতেছিল। ভেড়ার "চাষ" চলিতে পারে কেবল তখন যখন প্রচুর পরিমাণে জমি আবাদহীনরূপে পড়িয়া থাকে।

ঠিক তাহাই ঘটিতেছেল। "ইউটোপিয়া" (অর্থাৎ সৃষ্টিছাড়া মুল্লুক, "কোথায় ও না") নামক আদর্শবাদপূর্ণ গ্রন্থে ভাবুক সমাজতন্ত্র লেখক টমাস মোর বলিতেছেন,—ভেড়াগুলা এতদিন ছিল, যারপর নাই ম্যাড়াকান্ত অর্থাৎ ঠিক ম্যাড়ার মতনই নিরীহ ও ঠাণ্ডা। কিন্তু এই গুলা খাইতও কম, কিন্তু আজকাল শুনিতেছি ইহারা এত বেশী খাইতে আরম্ভ করিয়াছে আর এত দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে মানুষ পর্য্যন্ত খাওয়া এখন ইহাদের স্বভাব। এই কথায় মেষ পালনের মুসরুম পড়ায় কৃষিকার্য্যে ভাটা লাগা বুঝিতে হইবে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে শেষ দশকে "য়োম্যান" শ্রেণীর স্বাধীন কিষাণরা গুনতিতে মামুলি চাষীদের চেয়ে অধিক ছিল। ইহারাই সেনাপতি এবং সামরিকগণতন্ত্রনেতা ক্রমওয়েলের পল্টনের মেরুদণ্ড ছিল। মেকলের মতে মাতাল ভদ্রলোক এবং তাহাদের চাকরবাকরদের চেয়ে সেইজন্য শিষ্টাচার বিষয়ে য়োম্যানরা বেশী প্রশংসনীয় জীবন যাপন করিত। এমন কি সে যুগের পল্লীপুরোহিতেরাও য়োম্যানদের তুলনায় অতি ঘৃণ্য জীবনের প্রতিনিধি ছিল। তখনকার পুরোহিতরা বাবুভায়াদের পরিত্যক্ত উপপত্নী বেশ্যাদিগকে বিবাহ করিতে লজ্জা বোধ করিত না। বস্তুতঃ এই সকল পণ্ডিত "স্কোয়ার" শ্রেণীর ভদ্রলোকের চাকরশ্রেণীর অন্তর্গতই বিবেচিত হইত।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে "য়োম্যান" শ্রেণীর আর টিকি দেখা যাইত না। সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেষাশেষি কিষাণদের চৌথ জমিজমার শেষ চিহ্নও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অবস্থা এমত দাঁড়াইতেছে যে কিষাণরা কোনোদিন যে সমরাপন্থী সমাজে যৌথ জমিজমা ভোগ করিয়াছিল সেই স্মৃতি পর্য্যন্ত আর ইংরেজ মুল্লুকে প্রবাহিত হয় না। বরং ১৮০০ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত কালের ভিতর ধড়িবাজ জমিদার মোহন্তরা পার্লামেন্ট সভার কারসাজী ও আইন সম্বন্ধীয় মারপ্যাঁচ কায়েম করিয়া প্রায় ১০,৫০০,০০০ বিঘা জমি বাজেআপ্ত করিয়া লইয়াছে। এই এক কোটী বিঘার উপরও বিস্তৃত জমিজমা একমাত্র কলমের জোরে হাতছাড়া হইয়াছে। কিষাণরা তাহাদের দখল এবং ভোগের অধিকার ছাড়িয়া দিবার ক্ষতিপুরণের বাবদ এক দামড়িও সরকার বা জমিদারদের নিকট হইতে পায় নাই।

এইরূপ জমিচুরির শেষ নিদর্শন স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ী ভূমি হাইল্যাণ্ড আবাদে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। "জমিজমা" ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করা নামক এক প্রকার কাণ্ড এই দেশে ঘটিয়াছে। তাহার দ্বারা কিষাণদিগকে জমিজমা হইতে সটান ঝাঁটাইয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জমিচুরি রীতিই জমিদারি প্রথার কথায় প্রথম দ্রষ্টব্য।

স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড অঞ্চলের পাহাড়ী লোকেরা কেল্টিক জাতির অন্তর্গত লোক। ইহারা "ক্ল্যান" বা যৌথ সম্পত্তিশীল সমর সঙ্ঘদ্বারা শাসিত হইত। এই ক্ল্যানের বা গোষ্ঠির

সর্দার জনগণের প্রতিনিধি বিবেচিত হইত। এই হিসাবে ক্ল্যানের সমবেত সম্পত্তি প্রকারান্তরে সর্দারের সম্পত্তি বলিয়া পরিচিত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে সর্দার ব্যক্তিগতভাবে এই জমির মালিক ছিল না। বিলাতের রাণী সেইসময় গোটা বিলাতের জমিজমার মালিক। স্কটল্যাণ্ডের ক্লান-সর্দারগণও নিজ নিজ ক্ল্যানের জমিজমাগুলার সেইরূপ মালিক ছাড়া আর বেশী কিছু ছিল না।

সর্দারে সর্দারে লাঠালাঠি দস্তুরমতনই চলিত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সকল লাঠালাঠি নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সর্দাররা পরস্পর মারামারি বন্ধ করিয়া ক্ল্যানের অন্যান্য লোকজনের উপর মামলা চালাইতে লাগিয়া যায়। ডাকাইতি রূপপরিবর্ত্তন করিল মাত্র। সর্দাররা ক্ল্যানগত জমিগুলা দখল করিয়া কিষাণদিগকে "হাজতে" "হাঘরে" করিয়া ছাড়িয়াছিল। অধ্যাপক নির্ড্ম্যান বলেন :—"এই ডাকাইতি কেমন? না ইংলণ্ডের রাজা যেন ইংরেজ প্রজাদিগকে জমিহীন করিয়া সমুদ্রের ভিতর ডুবাইয়া মারিবার প্রয়াস করিতেছে।"

স্কটল্যাণ্ডে এই জমি বিপ্লব সুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট এবং জেম্‌স্ আণ্ডার্সন ইত্যাদি লেখকদের রচনায় এই ডাকাইতি কাণ্ডের প্রথম যুগ দেখিতে পাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে জমি ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিবার এক দৃষ্টান্ত দিতেছি। সাথার-ল্যাণ্ডের ডচেস বা বেগম সাহেব ১৮১৪ হইতে ১৮২০ পর্য্যন্ত ছয় সাত বৎসরের ভিতর ৩০০০ পরিবারকে জমিহীন অন্নবস্ত্রহীন করিয়া তাহাদের জমিজমা ভেড়া চরাইবার মাঠে পরিণত করিয়াছেন। এই লুটপাটে প্রায় ১৫০০০ লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়। এই স্কট মহিলাকে সাহায্য করিবার জন্য বৃটিশ সরকারের পল্টন মোতায়েন ছিল। পল্লীগুলা, ঘরবাড়ীগুলা, চাষ আবাদের জমিগুলা সবই উজাড় হইয়া যায়। খোলাখুলি লঙ্কাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এক বুড়ী তাহার কুঁড়ে ছাড়িয়া কোন মাঠে যাইতে রাজি হয় নাই। কুঁড়ে কামড়াইয়া পড়িয়া থাকাই সে তাহার জীবনের শেষ সাধ বিবেচনা করিয়াছিল। কিন্তু বেগম সাহেব বুড়ীকে তাহার কুঁড়ে সহ আগুনে পুড়াইয়া মারিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

এই ডাকাইতির জোরে স্কট মহিলা প্রায় ২,৪০০,০০০ বিঘা জমির মালিক হন, জমিগুলা সবই পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ক্ল্যানের যৌথ সম্পত্তি ছিল। হতভাগ্য নরনারীদিগকে সমুদ্রের কিনারায় ১৮০০০ বিঘা জমি দান কবিয়া মহিলা নিজ কর্ত্তব্যের চূড়ান্ত পালন করেন। পরিবার প্রতি ৬ বিঘা জমি তাহাদের অন্নবস্ত্রের উপায় হইল।

বেগম সাহেবের কর্ত্তব্য জ্ঞানের আর একটুক পরিচয় দেওয়া আবশুক। এই ১৮,০০০ বিঘা জমি এতদিন পড়িয়া ছিল! কোনো লোকে যে কোন কিছু চাষ করিবে তাহা সম্ভবপরও ছিল না। কিন্তু একর প্রতি আড়াই শিলিঙ্‌ অর্থাৎ বিঘা প্রতি প্রায় ॥৵০ হারে খাজনা দিতে হইবে এই কড়ার বসাইয়া মহিলার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছিল। এই সব কিষাণই এই মহিলার পূর্ব্বপুরুষগণের জন্য সাবেক কালে রক্ত ঢালিয়াছে।

মহিলা তাহার লুটের জমির চাষ আবাদ তুলিয়া দিয়া ২৯টা ভেড়া চরাইবার মাঠে

সমস্তটা ভাগাভাগি করিয়া ফেলে, প্রত্যেক ভাগে একজন করিয়া মেষপালককে সপরিবারে বসবাস করিবার জন্ম পাট্টা দেওয়া হয়। মেষপালকেরা আসিয়াছিল ইংলণ্ড হইতে। ১৮৩৫ সালে ১৫০০০ কেল্টিক নরনারীর বাহিরে দেখা দিল ১২১,০০০ ভেড়ার পাল। আর যে সকল স্বদেশী লোক কোনো মতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল তাহারা সমুদ্রের কিনারায় মাছ ধরিয়া জীবন ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকিল। তাহারা হইল বাস্তবিক পক্ষে "উভচর", আধা স্থলের আধা জলের বাসিন্দা।

জনগণের জমি লুটিয়া খাওয়াই জমিদারির উৎপত্তির এক মাত্র কারণ নয়। সরকারী সার্ব্বজনীন জমি চুরি করিয়াও মধ্য বিলাতের জমিদার বাবুরা ভুঁড়ি মোটা করিয়াছে। এই সকল জমি চুরি সুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে—ষ্টুয়ার্ট যুগের বিপ্লবের পর অরেঞ্জবংশীয় উইলিয়াম যখন রাজগদিতে বসিবার সুযোগ পায়, জমিগুলা একত্র করিয়া বিনা দামে অথবা নেহাৎ কম দামে যাহাকে তাহাকে দিয়া দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিদারেরা সরকারী জমিগুলা বেমালুম গাপ করিয়া বসে। আইন কানুনের ধার ধারিতে কেহই অভ্যস্ত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে গির্জ্জা মঠ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের দেবোত্তর সম্পত্তিগুলা লুটের ভিতর আসিয়া পড়ে। এই সকল মোহন্ত সম্পত্তির অনেকাংশই পূর্ব্ববর্ত্তী গণতন্ত্র এবং বিপ্লবের আমলে ঐহিক জমিদারিতে পরিণত হইয়াছিল।

আজকাল বিলাতে যে সকল আমীর ওমরাহ জমিদার তালুকদার দেখা যায় তাহারা সকলেই এই বিপ্লবের যুগের জমিচোর। ইহারা হয় স্বাধীনজনগণের জমিজমা বাজেআপ্ত করিয়াছে না হয় বিপ্লবের অশান্তির সুযোগে সরকারী সম্পত্তি বেহাত করিয়া লইয়াছে। এই যুগে "বুর্জোআ" শিল্পবাণিজ্য মহলের ধনদৌলতওয়ালারা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছিল। ইহারা জমির ডাকাইতকে সুনজরে দেখিতেই অভ্যস্ত ছিল। ছোট খাটো জমিজমার মালিকের আমল ইহাদের কাজ কর্ম্মের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। ইহারা চাহিত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রথা। কাজেই যাহাতে ছোট ছোট জমিওয়ালারা বড় জমিদারদের নিকট নিজ নিজ স্বত্ব বিলাইয়া দেয় সেইদিকেই বুর্জোআদের নজর থাকিত তাহার ফলে একদিকে চাষ আবাদের আয়তন বাড়িয়া গিয়াছিল। অপর দিকে বহুসংখ্যক চাষী জমিদারের জমিমজুর বা বেতনভোগী কিষান রূপে পরিণত হইয়াছিল। কিষাণ সমাজে "প্রোলেটারিয়ান" নামক শ্রমজীবী দেখা দিতে থাকে; এই সবই বুর্জোআদের মনমত।

চুরি ডাকাইতি করিয়া জমি জমা দখল করা গেল জমিদারি প্রথার এক দিক। অপর দিক ছিল গবর্মেন্টকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করা। ইহাও একপ্রকার জুলুম; সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বিলাতী শাসন প্রথা মনে আনিতে হইবে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গণতন্ত্রের পর ষ্টুয়ার্ট রাজবংশ আবার গদ্দিতে বসে। এই সময় জমিদাররা পার্ল্যামেন্টে একটা আইন জারি করিয়া জমিদারিসম্পত্তিকে পুরাপুরি নিষ্কর করিয়া ফেলিয়াছিল।

১৬৭২ সালে দ্বিতীয় চার্লসের আমলে এই আইন কায়েম হয়। জমিদাররা তাহার ফলে সামরিক সেবা, রাজসাহায্য, বাধ্যতামূলক রাজকার্য্য, নাবালক সেলামি, ইত্যাদি

ফিউদযুগের নানাবিধ সরকারী আদায় হইতে অব্যাহতি পায় ; এই সকলের পরিবর্ত্তে মামুলি একসাইজ করই জমিদারদের এক মাত্র দেয় ইহাই সাব্যস্থ হয়। সেইদিন হইতে বিলাতে সরকারী খাজনার চাপ প্রধান ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে সাধারণের ঘাড়ে, জমিদাররা "অভিজাত"সুলভ আরাম ভোগের সুযোগ পাইয়াছে। বিলাতী সমাজে এই জুলুম ঘটিয়াছে আইনের সাহায্যে। কিন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে একটা আইনের অছিলা দেখাইবারও প্রয়োজন হয় নাই।

রাইয়তদের প্রতি ফিউদারদের এমন আর কোনো কর্ত্তব্য নাই। গবরমেণ্টের খাজাঞ্চিখানায়ও ফিউদারেরা কোনো কর দেয় না। দুই তরফ হইতে প্রায় পুরাপুরি স্বাধীনতা লাভ করিয়া জমিদারি প্রথা খাঁটি পুঁজি বা মূলধন নামক সম্পত্তির রূপ ধারণ করিল।

এই আর্থিক বিপ্লব বিলাতে কিষাণসমাজকে চরম দুর্দ্দশায় আনিয়া ঠেকাইয়াছে! ভিটে মাটী উচ্ছন্ন হওয়ায় চাষীরা রাস্তার ভিখারী হইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ভিক্ষা মাগিয়া খাইবার স্বাধীনতাও তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। আইনের বিধানে ভিক্ষুকদিগকে "বদমায়েস" বিবেচনা করা হইত। ইচ্ছা থাকিলে ইহারা কাজ করিয়া অন্ন সংস্থান করিতে পারে, এইরূপ ছিল সেকালের কানুনের প্রথম স্বতসিদ্ধ। ভিক্ষুক বদমায়েসদের দৌরাত্ম্য হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট অনেক আইন জারি করিয়াছে।

যোড়শ শতাব্দীতে সপ্তমহেনরির আমলে ভিক্ষুক দলনের জন্য প্রথম কানুন জারি হয়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে অষ্টম হেনরির স্মৃতিশাস্ত্র এই :—কাজ করিতে অক্ষম ভিক্ষুকরা একটা সরকারী চাপরাশ পাইবে। সেই চাপরাশের জোরে তাহাদিগকে ভিক্ষা করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু "ষ্টাডি ভাগাবণ্ড" অর্থাৎ জোয়ান ভবঘুরেশ্রেণীর ভিক্ষুক বদমায়েসদিগের কপালে জুটিবে চাবুক এবং কয়েদ। ইহাদিগকে গাড়ীতে বাঁধিয়া চাবুক লাগানো হইবে। শরীর হইতে রক্তের স্রোত বহিলে তবে চাবুক লাগানো বন্ধ করা হইবে। তাহার পর ইহাদিগকে স্বদেশে অর্থাৎ জন্মস্থানে অথবা বিগত তিন বৎসর ধরিয়া ইহারা যেখানে বসবাস করিয়াছে সেইখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য শপথ করিতে বন্দোবস্ত হইবে। আর সেইখানে যাইয়া পুনরায় কোনো কাজে লাগিতে চেষ্টা করাও সেই হলপের অঙ্গ থাকিবে। অষ্টমহেনরি পরে আর একটা কানুন জারি করিয়া ১৫৩০ সালের আইনটা আরও কঠোর করিয়া তুলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার "ভাগাবণ্ড" হিসাবে ধরা পড়িলে আসামীকে পূর্ব্বের মতন রক্তবহা পর্য্যন্ত চাবুক খাইতে হইত। সঙ্গে সঙ্গে একটা কানের খানিকটা কাটিয়া দেওয়া হইত। তৃতীয়বার এই দোষ করিলে ভিক্ষুক বদমায়েসকে পাকা দাগী এবং দেশের শত্রু হিসাবে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হইত। আইনের কি ব্যভিচার।

রাণী এলিজাবেথের আমলে ১৫৭২ সালে ভিক্ষুক দলের জন্য এক আইন জারি হয়। তাহার বিধানে ১৪ বৎসরের বেশী বয়সওয়ালা লোকেরা বিনা চাপরাশে ভিক্ষা মাগিতে গেলে চাবুক খাইত এবং কানপোড়া হইয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য থাকিত। যদি কেহ তাহাদিগকে দুই বৎসরের জন্য নক্রি দিতে রাজি হইত তাহা হইলে কান পোড়ানো রেহাই

হইত। দ্বিতীয় বার ভিক্ষায় ধরা পড়িলে, আর ঘটনাচক্রে যদি তাহারা ২৮ বৎসরের বেশী বয়সের লোক হয়, তাহাদের সাজা ছিল প্রাণনাশ। তবে কেহ যদি দয়া করিয়া তাহাদিগকে দুই বৎসরের জন্য নকৃরি দেয় তাহা হইলে প্রাণনাশ ঘটিত না, কিন্তু তৃতীয় বার এই অপরাধ করিলে তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতেই হইত।

এলিজাবেথ এই ধরণের আইন আরও কায়েম করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রাজা প্রথম জেম্‌সও ১৫৯৭ সালে আইন কায়েম করিয়া ভিক্ষুকদিগকে বদমায়েস এবং সাজাযোগ্য অপরাধী বলিয়া ঘোষিত করে। প্রথম দোষের জন্য চাবুক ও ছয় মাস জেল, দ্বিতীয় দোষের জন্য দুই বৎসর জেল ছিল বিধান। জেলখানায় চাবুক লাগানোর মাত্রা নির্দ্ধারিত করিত বিচারক। যে সকল দাগী বদমায়েস শুধরাইবার অযোগ্য বিবেচিত হইত তাহাদিগকে বাঁ ঘাড়ে "আর" অক্ষরে দাগিয়া দেওয়া হইত। "আর" অক্ষরটা রোগ (অর্থাৎ বদমায়েস) শব্দের প্রথম অক্ষর। "আর" দাগীরা কঠোর কাজে বাহাল থাকিত তাহার পরেও যদি ইহাদিগকে ভিক্ষা মাগিয়া খাইতে দেখা যাইত তাহা হইলে আর নিস্তার নাই। মৃত্যুই ছিল একমাত্র শাস্তি।

এই সকল ভিক্ষুকদলননীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত বিলাতে জারি ছিল। রাণী আনের রাজত্ব বার বৎসর চলিবার পর কানুনগুলা তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইংলণ্ডে এবং স্কটল্যাণ্ডে যে ধরণের অমানুষিক অত্যাচার জমিদারি প্রথার ক্রমবিকাশের সহচর, ততটা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে কোথায় দেখা যায় নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই কিষাণরা যারপর নাই জুলুম ও নির্য্যাতন ভুগিতে বাধ্য হইয়াছে। ভিটা মাটি উচ্ছন্ন হওয়ার কাণ্ডে কিষাণ সমাজ প্রায় সকল দেশেই অশেষ লাঞ্ছনা সহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

স্বামী রামতীর্থ।

স্বামী রামতীর্থের সহিত—আমরা বাঙ্গালী—আমাদের বিশেষ পরিচয় নাই। বাংলার বাহিরে যে সকল মহাপুরুষ নীরবে কাজ করিয়া যান তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প, জানিবার ঔৎসুক্য বোধ করি তাহার চেয়েও অল্প, অথচ এই ত্রুটী সারিয়া লইবার চেষ্টাও আমাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের মোহে মুগ্ধ চরিত্রে বড় বেশী দেখা যায় না; ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। ১৯০৬ সালে রামতীর্থের মৃত্যু হয়; জীবিতকালে সাক্ষাৎ ভাবে নিজের চরিত্র ও আদর্শ প্রচার দ্বারা, ও মৃত্যুর পর তাঁহার রচনাবলী দ্বারা, পাঞ্জাবের ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের শিক্ষিত জনসাধারণের ও যুবকদিগের চরিত্রের উপর তিনি যে একটা বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন, এই সুদীর্ঘকাল পরেও তাহার বিশেষ কোন সংবাদই আমরা রাখি না; অথচ পাঞ্জাবের ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের তরুণ হৃদয়ের

মনের গতি কোন পথে চলিতেছে, কি ভাবে তাহা গড়িয়া উঠিতেছে তাহা জানিবার বুঝিবার জন্ম এই প্রভাবের মূলে যে মানুষগুলি আছেন তাঁহাদের পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। রামতীর্থ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

স্বামী রামতীর্থের কথা আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই আমাদের এই প্রদেশের এক-জন মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে; উভয়ের চরিত্রে ও চারিপাশের জনসাধারণের উপর প্রভাবে অনেকখানি সাদৃশ্য দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যক্ষেত্র মোটামুটিভাবে সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইলেও মুখ্যতঃ তাহা যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রথমযুগের বাংলার তরুণদিগের উপর কাজ করিয়া তাহাদের চরিত্রে একটা নূতন বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিয়াছিল, স্বামী রামতীর্থের প্রভাবও বিশেষ করিয়া তাঁহার জন্মভূমির উপরেই পড়িয়াছিল। বিবেকানন্দ যখন বাংলায় নূতন ভাবের বন্যা আনিয়া দিতেছিলেন, বাংলার সুপ্তচিত্তকে সিংহ-গর্জ্জনে জাগাইয়া নূতন জীবনের দিকে তাহার দৃষ্টি মেলিয়া দিতেছিলেন, রামতীর্থ সেই সময়েই সুদূর পাঞ্জাবে এক নূতন ভাবজগতের সৃষ্টি করিয়া, নূতন আদর্শের প্রচার করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের যুবকদিগের চিন্তাজগতে বিপ্লব আনিয়া দিতেছিলেন। উভয়েই সন্ন্যাসী এবং উভয়েই মহাজ্ঞানী, বৈদান্তিক বিবেকানন্দের ন্যায় রামতীর্থও প্রথম জীবনে তীক্ষ্ণধী, মেধাবী, শক্তিমান, তেজস্বী ছাত্র ছিলেন উভয়েই সুখ দুঃখময় প্রকৃত জীবনের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া বেদান্তের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং এই নব আদর্শবাদ, নব্য বেদান্তের প্রচারকল্পে জাপান আমেরিকা ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া প্রতীচ্যের বহু নরনারীর দৃষ্টি ভারতের সনাতন ভাণ্ডারের বিপুল সম্পদের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ আরো নানাদিকে উভয়ের জীবনের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা আমরা প্রসঙ্গক্রমে পরে আলোচনা করিব। তাহার পূর্ব্বে রামতীর্থের জীবনের মোটামুটি ঘটনাগুলির সহিত পরিচয় করার দরকার।

রামতীর্থের পূর্ব্বনাম গোস্বামী তীর্থরাম; তিনি ১৮৭৩ খৃঃঅব্দে ২২শে অক্টোবর দীপা-লীর পরদিন পাঞ্জাবের গুজরাণবালা জেলার অন্তর্গত মুরারীবালা নামক গ্রামে গোস্বামীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম গোস্বামী হীরানন্দ। জন্মের কয়েক দিন পরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পিতৃস্বসা তীর্থরামের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্মপরায়ণা একান্ত নিষ্ঠাবতী রমণীর নিকটেই তিনি প্রথম ধর্ম্মশিক্ষালাভ করেন; তাঁহার প্রভাব তীর্থরামের জীবনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল। শৈশবে মাতৃদুগ্ধের অভাবে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ব্যায়াম ও সংযমদ্বারা তিনি অনবদ্য স্বাস্থ্য লাভ করেন।

শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া তিনি গুজরাণবালা হাইস্কুলে প্রবেশ করেন; গুজরাণবালায় পাঠকালীন তিনি পিতৃবন্ধু ধন্নারামভগতের রক্ষণাধীনে ছিলেন। এই সাধুপ্রকৃতি বৃদ্ধও তীর্থরামের তরুণহৃদয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এই তরুণ ও প্রৌঢ়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের এমন একটি মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল যাহা শিষ্যের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

প্রচলিত প্রথানুযায়ী বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার বিবাহ হয়। গুজরাণবালার পাঠসমাপন করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পিতার

অনুমতি প্রার্থনা করেন। পিতা হীরানন্দের অভিলাষ ছিল পুত্র এইবার কোন চাকুরী করে; তিনি অনুমতি দিলেন না। দৃঢ়চিত্ত পঞ্চদশবর্ষীয় বালক তাহাতে ভীত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া লাহোরে আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলেন; ক্রুদ্ধ পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। অপরিচিত জনাকীর্ণ বৃহৎ সহরে এই অসহায় কিশোর বালক তাহাতেও ভীত হইলেন না; এখন সম্বল শুধু তাঁহার বৃত্তি ও গুরুধন্নারামের ও আত্মীয় রঘুনাথমলের উৎসাহ; বৃত্তিও অল্প। কিন্তু তীর্থরাম ভগ্নোৎসাহ না হইয়া পড়িতে লাগিলেন; কঠোর শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভগ্ন হইল কিন্তু পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেন্ট বৃত্তি পাইয়া তিনি সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলেন। এবারে পিতা বুঝিলেন তীর্থরাম কোনমতেই তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইবে না এবং স্বাবলম্বী হইয়া তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই সে স্বীয় অভীষ্টপক্ষে চলিবে; তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কিশোরী পুত্রবধূকে পুত্রের নিকট রাখিয়া দিয়া গেলেন। তীর্থরাম তখন বি, এ পড়িতেছেন; বৃত্তির অল্প কয়েক টাকার উপরই তাঁহার নির্ভর, তাহাতেই কলেজের বেতন, এবং নিজের খাবার খরচ চালাইতে হয়; ইহার উপর আবার কিশোরী স্ত্রীর ভার আসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল; কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন না, কঠোর পরিশ্রমে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী হইতে লাগিলেন। বি, এ পর্য্যন্ত তীর্থরাম সংস্কৃত জানিতেন না; ফার্সীই তাঁহার প্রধান পাঠ্য মাতৃভাষারূপ ছিল; কিন্তু জনৈক বন্ধুর কথায় পরীক্ষার পূর্ব্বে তিনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন; ইহার জন্য তাঁহার এত সময় লাগিল যে সে বৎসর পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তখন আর এক বিপদ উপস্থিত; পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁহার বৃত্তিবন্ধ হইল; বহুদিনের সঞ্চিত আশা, উচ্চশিক্ষালাভের প্রবল আগ্রহ, যেন অতৃপ্তই থাকিয়া যাইবে; কিন্তু পরম নির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী যুবক তীর্থরাম হতাশ না হইয়া গৃহশিক্ষকতা করিয়া ও অধ্যাপকদিগের সাহায্যে নিজের পড়া ও স্ত্রীর ভরণ পোষণ চালাইতে লাগিলেন এবং বৎসরান্তে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম স্থান লাভ করিলেন। এই কঠোর পরীক্ষার মধ্যেও তিনি যে কিরূপে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না হারাইয়া চলিয়াছিলেন তাহার পরিচয় উল্লিখিত তৎকালীন পত্রাবলীর মধ্যে নাই।

বি, এ পরীক্ষায় এই ভাবে কৃতকার্য্য হওয়ায় তাঁহার অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হইয়া উঠিল। মাসিক ৬০৲ ছাত্রবৃত্তিতে তাঁহাদের স্বামীস্ত্রীর খরচ বেশ চলিয়া যাইত। ১৮৯৫ খৃঃঅব্দে তীর্থরাম কৃতিত্বের সহিত এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার শিক্ষার প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং সাংসারিক বিষয়ে বৈরাগ্যের উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বি, এ পরীক্ষার পর যখন তাঁহার কলেজের প্রিন্সিপাল ডেপুটীগিরির জন্য তাঁহার নাম সরকারে পৌছাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রার্থনা করিয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

পঠদ্দশায় তাঁহার চরিত্রের মধ্যে কয়েকটী বিশেষত্বের পরিচয় আমরা পাই। প্রথম, তাঁহার প্রবল শিক্ষানুরাগ, তাহার জন্য তিনি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। দ্বিতীয় দৃঢ়চিত্ততা, কোন বাধাই তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তৃতীয় ঈশ্বরে পরম বিশ্বাস।

এই সময় হইতেই তীর্থরামের চরিত্রে আর দুইটি বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল

একান্তবাসের প্রবল আগ্রহ ও প্রকৃতিপূজা। প্রকৃতির প্রতি তাঁহার এই প্রগাঢ় প্রেম বোধ হয় তাঁহার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত প্রকৃতি যে কি ভাবে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহার পরিচয় আমরা তীর্থরামের পরবর্ত্তী জীবনে বহুবার পাই। তাঁহার নির্জ্জনবাসের প্রবল আগ্রহ প্রকৃতিকে একান্ত ভাবে উপভোগ করিবার এই ইচ্ছা হইতেই সঞ্জাত।

এম,এ পরীক্ষার পর কয়েক স্থানে চাকুরী করিয়া তিনি পরে লাহোরের মিশন কলেজে অধ্যাপকের পদলাভ করেন। এই সময়ে তিনি স্থানীয় সনাতন ধর্ম্ম সভার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন।

বাল্যকাল হইতেই তীর্থরামের চরিত্রে ধর্ম্মভাব বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই সময় তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণরূপে ফুটিয়া উঠিল। তিনি, ভক্তশিরোমণি, হিন্দীরামায়নের রচয়িতা গোস্বামী তুলসীদাস যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেইবংশে জন্মিয়াছিলেন এবং আবাল্য বৈষ্ণব পরিবেষ্টনের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্মে যে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরক্তি থাকিবে ইহা বিচিত্র নহে। তাঁহার ধর্ম্মসাধন বৈষ্ণবদাস্যসাধনের মার্গ গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মজীবনের এই বিকাশের পরিচয় আমরা তৎকালীনপ্রদত্ত তাঁহার কয়েকটী ভাষণের মধ্যে পাই। তখন তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ, পরমভক্ত বলিয়া পরিচিত; তাঁহার অবকাশগুলি শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি—মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি বৈষ্ণব তীর্থস্থানগুলিতে কাটিল।

জীবনে তিনি কোনদিনই বিষয় বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন না; নির্লিপ্ততা, আর্ত্তের প্রতি সমবেদনা, ত্যাগ এইগুলি সকল সময়েই তাঁহার জীবনে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল অনেক সময়ে বেতনলব্ধ অর্থ তিনি নগরের দীন দরিদ্রের সেবায় দিয়া ফেলিতেন; উদ্বৃত্তের অনেকখানি আবার পুস্তকক্রয়ে চলিয়া যাইত, এদিকে গৃহে যে অন্নাভাব সেদিকে তাঁহার দৃষ্টিই থাকিত না। পুস্তকক্রয় ও পুস্তকপাঠ তাঁহার ব্যসনরূপেই দাঁড়াইয়াছিল; তাঁহার পুস্তকাগারে যে কত পুস্তক তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, আরও কত যে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কলেজের কাজটুকু সারিয়া বাকি সময় তিনি নির্জ্জনে পুস্তক লইয়া কাটাইতেন।

এই সময় দ্বারকা মঠের অধীশ্বর জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য লাহোরে আসিয়া সনাতন ধর্ম্ম সভার অতিথি হন, রামতীর্থের উপরেই তাঁহার সেবার ভার পড়ে। শঙ্করাচার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি বৈদান্তিক হইয়া দাঁড়াইলেন; গীতা, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতি তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়া উঠিল, বৃন্দাবন মথুরার পরিবর্ত্তে এখন হইতে হিমালয়ের বক্ষে উত্তরাখণ্ডের নির্জ্জন স্থানগুলি তাঁহার অবকাশ যাপনের ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। তাহার নিজের ভাষায় "প্রেমকী জরদী জ্ঞানকী লালীমেঁ বদলনে লগী" অর্থাৎ প্রেমের ম্লান লালিমা জ্ঞানের রক্তরাঙ্গা রঙ্গে পরিনত হইল।

বেদান্তের চর্চ্চায় তিনি এরূপ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন যে অমৃতবর্ষিনী নামে একটী সভার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে তিনি সাপ্তাহিক বেদান্তালোচনার ব্যবস্থা করিলেন এবং কিছুকাল পরে আলিফ্ নামক উর্দ্দু পত্রিকা এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মের অবকাশে তিনি নির্জ্জনবাস ও সাধনার জন্য হিমালয়ের ক্রোড়ে ঋষিকেশের নিকট তপোবন নামক স্থানে গমন করেন। তপোবনের কোলে কলনিনাদিনী গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে, প্রকৃতির ক্রোড়ে পরমরমণীয় এই স্থানে তিনি স্বরূপ উপলব্ধি করেন—যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা লাভ করেন।

কথিত আছে এই আত্মদর্শন লাভের পর তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন,

আজাদা অম্, আজাদা অম্ অজ রংজ দুর উস্তজা-অম্
অজ ঈশবএ জালে জহাঁ অজাদা-অম্ বালাগুম্......।

আমি মুক্ত, আজ আমি মুক্ত, দুঃখ শোক হইতে আজ আমি মুক্তি পাইয়াছি; এই বৃদ্ধ জগতের মায়ায় আর আমি ভুলিব না......।

অবকাশান্তে এবার যখন তিনি কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার জীবনের ধারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রস্বার্থ, অর্থসম্পদ, সহকর্ম্মী ও আত্মীয় স্বজনের প্রীতিশ্রদ্ধা কিছুই আর তাঁহাকে এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বাহিরের উদার জগৎ, বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহাকে ডাক দিয়াছিল, তপোবনের উদাত্ত বাণী তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ১৯০১ সালে জুলাই মাসে চাকরী ছাড়িয়া সপরিবারে কয়েকজন শিষ্যের সহিত হিমালয়ে প্রস্থান করেন।

প্রকৃতি তাঁহার জীবনে চিরকালই এক অপূর্ব্ব প্রভাব, অদৃশ্য আকর্ষণজাল বিস্তার করিয়াছিল; বিশেষ করিয়া হিমালয় তাঁহাকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল, প্রাচীন ভারতের এই ঋষি-অধ্যুষিত তপস্যার আসনকে তিনি তাঁহার সাধারণ ক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন। এই পার্ব্বত্যস্রোতস্বনীমুখরিতা গহন-বনভূমির নির্জ্জনতার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মবাণীর সন্ধান পাইয়াছিলেন।

কোন কিছুকে পাইতে হইলে তাহাকে শক্তির মধ্যে সংযমের মধ্যে লাভ করিতে হয়; তবেই তাহা অশান্তির মধ্যে অসংযমের মধ্যে সত্য হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। সাধুরা হিমালয়ে যান তপস্যার জন্য; হিমালয়ে যেন সংযমের মূর্ত্তিমান পরীক্ষা। চারিদিকেই বিরাট প্রাচীরের মত শৃঙ্গগুলি দাঁড়াইয়া আছে, কারাগৃহের অন্ধকার প্রাচীরের মত। তাহারই মধ্যে সাধনা করিতে হয়, এ যেন বিদ্রোহী বিক্ষিপ্ত মনের কারাবাস। যে সত্য এই কারাগারে লাভ হয় তাহাই প্রচারের জন্য সাধনার শেষে সাধুগণ সমতলের বিস্তৃতির মধ্যে নামিয়া আসেন। বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে সহজে আপনাকে ছড়াইয়া দিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে যে সংকোচনের শক্তির, সংহতির প্রয়োজন তাহা যেন হিমালয়ের এই অনুকূল কারাবাসের বন্ধনের মধ্যে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সভ্যতার বস্তুবাদের গোলমাল, বিক্ষেপ সেখানে এখনও পৌঁছায় নাই, মানুষ এখনও সেখানে সরল প্রকৃতির শিশু; মায়ের মত যে প্রকৃতি পরম স্নেহের বাহুর সহস্র বন্ধনে আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে, উদার আকাশ, শ্যামল বনভূমি, কলনিনাদিনী নির্ঝরিণী দিয়া যে বার্ত্তা আমাদের জীবনকে আকাশের মত উদার, বনভূমির মত সহজ বিস্তৃত,

যৌবনশ্যামল, নির্ঝরিণীর মত চঞ্চল জীবনের আনন্দে গতিশীল করিবার জন্ত প্রতি মুহূর্ত্তে আহ্বান করিতেছে, আমরা তাহাকে ভুলিয়া, তাহার সেই আহ্বানকে ভুলিয়া, বর্ত্তমান সভ্যতার অপ্রকৃত প্রাণহীন যন্ত্রবাদের আবর্ত্তে পড়িয়া আছি; এই আড়ম্বরবহুল অপ্রকৃত জীবনের কোলাহলে অন্তরের দেবতার বাণী ডুবিয়া যায়, হৃদয় সংশয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠে তীর্থরাম সেই ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া উত্তরাখণ্ডের পত্রমর্ম্মরমুখর বনভূমির নির্জ্জনতার মধ্যে অন্তরের দেবতার সত্য বাণী শুনিবার জন্ত আকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

সে বাণী তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

এই খানে ১৯০১ সালের প্রারম্ভে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "রামতীর্থ" নাম গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি উত্তরাখণ্ডের অতি দুর্গম তীর্থগুলি, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার নাথ, সুমেরু পর্ব্বত, বদরী নারায়ণ প্রভৃতি দর্শন করেন। হিমালয়ের এই তীর্থগুলি চির তুষারে আবৃত, অতি দুর্গম, কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। রামতীর্থ এই ভ্রমণ কাহিনীর কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যেও এই প্রকৃতির উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়।

হিমালয় হইতে ভারতে ফিরিয়া ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে রামতীর্থ মথুরার ধর্ম্মমহাসভায় সভাপতির কার্য্য করেন। তাহার পর কিছুদিন দেশে থাকিয়া তিনি আবার হিমালয়ে ফিরিয়া যান। এই খানে তাঁহার টিহরীর মহারাজার সহিত পরিচয় হয়; মহারাজা সুশিক্ষিত সত্যবাদী ছিলেন; রামতীর্থের সহিত আলাপে তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে টিহরীতে নিমন্ত্রণ করেন; কিছুদিন পরে স্বামিজী টিহরীর রাজার গ্রীষ্মাবাস প্রতাপ নগরে গিয়া রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন।

এই সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশনের মত জাপানেও নিখিল ধর্ম্মমহাসভার এক অধিবেশন হইবে। টিহরীর মহারাজা স্বামিজীকে সেই সভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যাইতে অনুরোধ করেন; স্বামিজীও সম্মত হইয়া আগষ্ট মাসে (১৯০২) জাপান যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত শিষ্য নারায়ণস্বামী ছিলেন।

জাপানে আসিয়া বহুঅনুসন্ধানেও সভার অধিবেশনের কোন সংবাদ না পাইয়া তাঁহারা বুঝিলেন অধিবেশনের সংবাদ মিথ্যা। জাপানে কিছুদিন থাকিয়া নানা স্থানে বক্তৃতাদিয়া রামতীর্থ জাপানবাসিদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে কিছুদিন পরে, তিনি আমেরিকায় গমন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের স্থায় রামতীর্থও এখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন; নানা স্থানে বক্তৃতাদি দিয়া তিনি আমেরিকার জনসাধারণের হৃদয় ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করেন; তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সান্‌ফ্রান্‌সিকোতে বেদান্তালোচনার জন্ত Hermatic Brotherhood সাধু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল; বহু নরনারী তাঁহার অপূর্ব্ব বৈরাগ্য, ত্যাগোজ্জল জ্যোতিরুদ্ভাসিত আকৃতি; শিশুর মত সরল হাস্যমণ্ডিত মুখশ্রী, মধুর অভিভাষণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। কথিত আছে একদিন নিরীশ্বরবাদী জনৈকা মহিলা জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার

ধ্যানসমাহিত প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন "আমার সন্দেহের নিরাকরণ হইয়াছে; আমি আর নাস্তিকবাদে বিশ্বাস করি না"। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও নাকি এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া তিনি ভারতের ঋষী নব্যজ্যোতিবাদ প্রচার করেন।

আমেরিকা হইতে মিসর হইয়া তিনি ১৯০৪ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমেরিকায় প্রচারের ফলে তাঁহার নাম ভারতের শিক্ষিত সমাজে ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল; সুতরাং ভারতে আসিয়া তিনি নানাস্থানে প্রচুর অভ্যর্থনা লাভ করেন; জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই রামতীর্থের আদর করিলেন।

বোম্বাই হইতে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি নানাস্থান ঘুরিয়া তিনি বিশ্রাম ও একান্তবাসের জন্য পুষ্করতীর্থে গমন করেন; কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া তিনি যুক্ত-প্রদেশে ও বাঙ্গালার কয়েক স্থান ভ্রমণ করিয়া আবার হিমালয়ে ফিরিয়া যান।

এবার হিমালয়ে তিনি ব্যাসাশ্রম নামক স্থানে বাস স্থাপন করিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন বেদের পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মর্ম্মগ্রহণ ও ধর্ম্মপ্রচার সুন্দরভাবে করা যায় না, তাই তিনি ব্যাসাশ্রমে বসিয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং অল্পকালমধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমগ্র বেদ পাঠ করেন।

ব্যাসাশ্রম হইতে স্বামিজী আরো নির্জ্জনতর স্থানের সন্ধানে বশিষ্ঠাশ্রম নামক স্থানে যান; ঘনবনের অন্তরালে ১০০০০ফিট উচ্চে এই পরম রমণীয় স্থানে বাস করিয়া তিনি বেদচর্চ্চায় ও শিষ্যদের উপদেশাদিদানে কিছুদিন কাটাইলেন। যুক্ত-প্রদেশ ও বাঙ্গলা ভ্রমণের পরেই তাঁহার যে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এই দুর্গমস্থানে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহা আরো খারাপ হইয়া পড়ায় শিষ্যবর্গের অনুরোধে তিনি বশিষ্ঠাশ্রম ত্যাগ করিলেন।

টিহরীর নিকটেই একটী নির্জ্জন স্থানের সন্ধান তিনি পাইলেন। স্থানটীর তিন দিক বেড়িয়া ভৃগুগঙ্গা প্রবাহিতা; অপরদিক ঘনবনে আবৃত। বহু সাধু এই স্থানে সাধনা করিয়াছিলেন। এইস্থানে টিহরীর মহারাজের ব্যয়ে প্রস্তুত গৃহে তিনি বাস করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে বাস করিবার সময় শিষ্য নারায়ণ স্বামীর একান্ত বাসের জন্য এখান হইতে তিন মাইল দূরে একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তথায় নারায়ণস্বামীকে পৌঁছাইয়া দিবার সময় পথে তিনি তাঁহাকে নানা উপদেশ দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পাঁচদিন পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর দীপালির দিন মধ্যাহ্নে ভৃগু গঙ্গায় স্নান করিবার কালে তিনি সলিল সমাধি লাভ করেন।

মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে স্নানে যাইবার সময় তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন, "মৃত্যু আমার এই পঞ্চদেহ নষ্ট করিয়া দাও; আমার দেহের সংখ্যাত কিছু কম নহে; শুধু চাঁদের কিরণ ও তারার বসন পরিয়াই ত' স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি; পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর বেশে গান গাহিয়া গাহিয়া ফিরিব, সাহারার বালুবেশে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইব"।

ইহাই রামতীর্থের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ; এ জীবন কর্ম্মবহুল নহে, শান্ত, আত্ম সমাহিত।

ইহাকে কর্ম্মবহুল নহে বলিতেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার কর্ম্মজীবনের যে পরিচয় পাই তাহার মধ্যে কর্ম্মবাদী'র প্রচণ্ডগতিশীলতার পরিচয় রহিয়াছে ; তথাপি প্রধানতঃ ইহাকে কর্ম্মবাদময় জীবন বলা চলে না।

তিনি প্রথম জীবনে বৈষ্ণব মতের উপাসক ছিলেন, পরজীবনে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন। বৈদান্তিকবাদ জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; রামতীর্থ নিজে সন্ন্যাসী ছিলেন কিন্তু পরজীবনে তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন তাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় বৈদান্তিক সমুচ্চয়বাদ বলা চলে। তিনি জ্ঞানী ছিলেন এবং পরম জ্ঞান লাভই তাঁহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। গৃহস্থ জীবনে তাঁহার পাঠানুরাগের ও জ্ঞান-চর্চ্চায় আগ্রহের নিদর্শন পাই। তাঁহার পুস্তকাগার বিবিধ গ্রন্থে পূর্ণ ছিল ; নানা বিদ্যার আলোচনায় তিনি মগ্ন থাকিতেন। দেশী ও বিদেশী সাহিত্য ও দর্শন তাঁহার আয়ত্ত ছিল ; বিজ্ঞানেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল ; সন্ন্যাসাশ্রমে পুষ্করে একান্ত বাস সময়েও তিনি নবপ্রকাশিত হার্বার্ট স্পেনসারের সমাজতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পড়িতে ছিলেন। ডারুইন হেগেল, মিল বেন্থাম প্রভৃতি প্রতীচ্যের মনীষিগণের দার্শনিক চিন্তার ধারার সহিত তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিট্‌স্ শেলী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি য়ুরোপীয় কবিগণের তিনি ভক্ত ছিলেন ; হাফেজ, সাদী, জালালুদ্দিন রুমী প্রভৃতি পারস্যের কবি ও মনীষিভক্তগণের বাণী, তুলসীদাস ও সুরদাস প্রভৃতির গ্রন্থাবলী তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিল। হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞানই তাঁহার জীবনের চরম পরিণতি নহে।

মস্ত—এই একটা উর্দ্দু কথা আছে, ইহার বাংলা অর্থ মুগ্ধ করা যাইতে পারে ; এই কথাটীতেই বোধ করি রামতীর্থের জীবনের রহস্যটা ধরা পড়ে : তিনি ছিলেন 'মস্ত', কিসে "মস্ত ? এই বিশ্ব প্রকৃতির-আত্মার-জীবনের-সৌন্দর্য্যে "মস্ত"। খণ্ডিত আত্মা নহে, যে আত্মা এই বিশ্বচরাচরব্যাপ্ত হইয়া নানা বিচিত্র রূপে, রসে, সৌন্দর্য্যে আপনাকে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করিয়াছে, সেই বিরাট আত্মা, বিশ্বাত্মা—তাহারই প্রেমে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আত্মার এই বিরাট প্রকাশে আপনপর ভেদ নাই, কোন গণ্ডী নাই, সঙ্কীর্ণতা নাই ; তাই তাঁহার নিকট আপনপরভেদ ছিল না ; তাঁহার স্বদেশ-প্রেম বিশ্বপ্রেমেরই অঙ্গীভূত তাই তিনি পাশ্চাত্য যন্ত্রমুখী সভ্যতার মধ্যে শুধু অন্যায়ই দেখেন নাই, তাই তাহার তলায় মানুষের অদম্য আত্মা আপনাকে প্রকাশ করিবার যে চেষ্টা করিয়াছে তাহা দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলই তাঁহার নিকট প্রাণবান্, বিভূতিমান্ ছিল ; ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ হইতে সাগর নদী পর্ব্বত সকলই তাঁহার নিকট এক হইয়া গিয়াছিল ; নিজের পুস্তক, কাপড় প্রভৃতি জড়পদার্থের মধ্যেও তিনি এই বিরাট প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই অনেক সময়ে তিনি তাহাদিগকে প্রাণী বোধে সম্বোধন করিতেন।

প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপের মধ্যে তিনি নিজেরই আত্মার বিভূতি দেখিয়া ছিলেন ; প্রকৃতির দাস নহেন, প্রকৃতিই তাঁহার দাসী, প্রকৃতি তাঁহার সহিত অভেদাত্মা ; এই যে

বাহিরের বৈচিত্র্য ইহা তাঁহারই আত্মার বিচিত্র প্রকাশ: আত্মজ্ঞানের এই দীপ্তিটিতে তিনি দৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

The world turns aside
To make room for me ;
I come Blazing light
And the shadows must flee.

*   *   *

I ride on tempests
Astride on the gale
My gun is the lightening,
My shots never fail

চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন

Who lent you this beauty, O silver ball !
My dream is her lustre and silver and all
The music of the waving pines
The echoes of the ocean's war

*   *   *

The Golden beam of the sun
The twinkle of the silent star
The shimmering light of the silvery moon
The apple-bosomed earth and heaven's glorious wealth
Am I, am I, am I.
The oceans surge, the rivers roll,
In me, in me, in me.

প্রকৃতির উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছিলেন

For nature and I are one, you see,
And she is always subservient to me.

—তীর্থ সেবক

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়।

রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর আধুনিক ইতিহাসের আদিপর্ব্বে অর্থাৎ বর্ব্বর শাসন যুগে ইউরোপের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে এই বর্ব্বরযুগের অবসানকালে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে প্রথম যে শাসননীতি ও শাসন ব্যবস্থা বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করিল সেটি ফিউড্যালিজ্‌ম্ বা ভূস্বামীতন্ত্র। ফিউড্যালিজ্‌ম্ই বর্ব্বরতন্ত্রের প্রথম সন্তান। অতএব এখন এই ফিউড্যালিজম্ সম্বন্ধেই আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

একথা অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন যে ঘটনা পরম্পরার ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। ভূস্বামীতন্ত্রের বাহ্য ঘটনার ইতিহাস আমি এখানে দিতে আসি নাই। আমাদের আলোচ্য বিষয় সভ্যতার ইতিহাস। বাহ্য ঘটনার আবরণের মধ্যে সভ্যতার মূলতত্ত্বগুলি কিরূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাই আমাদের সন্ধানের বিষয়।

অতএব বাহ্য ঘটনা বলুন, সমাজে সঙ্কটই বলুন, আর সমাজের বিচিত্র অবস্থা বিপর্য্যয়ই বলুন, এ সমস্ত সভ্যতার ইতিহাসের দিক দিয়াই আমরা আলোচনা করিব। আমরা দেখিব তাহারা কে কিরূপে সভ্যতার বিকাশে বাধা দিয়াছে বা সহায়তা করিয়াছে, সভ্যতাকে তাহারা কে কি দিয়াছে বা দেয় নাই। আমরা কেবল এই ভাবেই ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার আলোচনা করিব।

আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভেই সভ্যতার মূল প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে সভ্যতার মধ্যে দুইটি মূলতত্ত্ব নিহিত আছে একদিকে আত্মার বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মনুষ্যত্বের বিকাশ; অপর দিকে মানুষের বাহ্য অবস্থার ও সামাজিক বেষ্টনীর পুষ্টি ও পরিণতি। সুতরাং আমরা যে কোন নূতন ঘটনা বা নূতন ব্যবস্থা বা জগতের কোন নূতন অবস্থার সম্মুখে উপস্থিত হইব, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে একদিকে সে মানুষের আত্মার বিকাশে কি সহায়তা করিয়াছে বা কি বাধা দিয়াছে, অপরদিকে সে সমাজের পুষ্টি বিষয়েই বা কিরূপে অনুকূল বা প্রতিকূল আচরণ করিয়াছে?

আপনারা আগে হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের কতকগুলি বড় বড় সমস্যা এড়াইয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কোন একটা ঘটনা বা ব্যবস্থা মানুষের আত্মার বা সমাজের পুষ্টি ও বিকাশ সাধনে কি সহায়তা করিল বা না করিল তাহা জানিতে হইলে তাহার পূর্ব্বেই জানা আবশ্যক যে মানবাত্মার বা মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও পুষ্টি কাহাকে বলে। তবেই আমরা বুঝিতে পারিব কোথায় উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতেছে, পুষ্টি না হইয়া বিকৃতি ঘটিতেছে, কোন উন্নতি উন্নতির মিথ্যা ভাণমাত্র, কোন পুষ্টি অস্বাস্থ্য জনিত অযথা স্ফীতিমাত্র।

আমাদের ইতিহাস ব্যাখ্যানের মধ্যে যখন যখন এইরূপ নৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসার প্রয়োজন হইল, তখন সে আলোচনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আধুনিক যুগের চিন্তাস্রোত লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায় যে দর্শন ও ইতিহাসের সমন্বয়ই হইতেছে আধুনিক আলোচনাপদ্ধতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ। আমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে বস্তুর সহিত বিজ্ঞানের, তথ্যের সহিত তত্ত্বের, চিন্তার সহিত ব্যবহারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এতদিন পর্য্যন্ত মানব ইতিহাসে এই সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। মানুষের চিন্তা ও মানুষের ব্যবহার পরস্পর নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্রপথে চলিয়া আসিয়াছে। মানুষের চিন্তা যখন যখন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখন সে কেবল ভাবোন্মাদের আকারে উন্মাদনা শক্তির প্রচণ্ড বেগে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে। মানব সমাজের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে দুইটী বিরুদ্ধ দল পরস্পর নিরপেক্ষভাবে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছে। একদিকে বিশ্বাসীর দল, তত্ত্ববাদীর দল, ভাবোন্মত্তের দল, অপরদিকে ব্যবহারিকের দল, যাঁহারা কোন কোন সাধারণ নীতি বা তত্ত্বকে আমল দেন না, যাঁহারা কেবল অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন, ঘটনাস্রোতের গতি লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত প্রয়োজন অনুসারে সুযোগ সুবিধার অনুবর্ত্তন করিয়া চলেন। এ অবস্থাটা কিন্তু এখন চলিয়া যাইতেছে। এখন হইতে মানব সমাজে শুদ্ধ তত্ত্ববাদীরও আধিপত্য থাকিবে না, শুদ্ধব্যবহারবাদীরও আধিপত্য থাকিবে না। এখনকার কালে মানবসমাজ শাসন করিতে হইলে, মানব সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে, তত্ত্বও জানিতে হইবে, তথ্যও জানিতে হইবে, ধর্ম্মনীতির গৌরবও স্বীকার করিতে হইবে, প্রয়োজনের মূল্যও মানিতে হইবে, অতএব আমরা উপস্থিত ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগোচিত চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রতিক্ষণেই ঘটনাবলী আলোচনা করিতে করিতে তত্ত্বালোচনায় আসিয়া পড়িব। ব্যবহার ক্ষেত্রে ভাবোন্মাদনার বশে তথ্যনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্ত্বের অনুসরণ করিতে গিয়া মানুষ নিজকে কিরূপ আবদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ফেলে, ফরাসী জাতি অল্পদিন হইল বিগত বিপ্লবের সময় তাহার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতার ফলে ফরাসী জাতির মধ্যে বিশুদ্ধ তত্ত্বের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা তথ্যের দিকে বাস্তব ঘটনার দিকে, বিশিষ্ট ক্ষেত্রোপযোগী, বিশিষ্ট বিধিবিধানের দিকে মুখ ফিরাইয়াছি। ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। ইহাদ্বারা আমরা সত্যরাজ্যের একটা নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এই বস্তুতন্ত্রতার ঝোঁকে যেন আমরা সামঞ্জস্য হারাইয়া না ফেলি। একথা যেন না ভুলিয়া যাই যে জগতে সত্যই একমাত্র শাসনাধিকারী; বাস্তব-ঘটনা যে পরিমাণে সত্যকে প্রকাশ করে সেই পরিমাণেই তাহার মূল্য; চিন্তার মহত্ত্ব, ভাবের মহত্ত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব; ভাবরাজ্যের সফলতাই প্রকৃত সফলতা।

অতএব আমাদের ইতিহাস ব্যাখানের যেখানে যেখানে তত্ত্বমূলক বিচারের প্রয়োজন হইবে আমরা সে আলোচনায় বিমুখ হইব না। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের সম্পর্কে ভূস্বামীতন্ত্রের আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে একাধিকবার এইরূপ দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

দশম শতাব্দীতে ভূস্বামীতন্ত্রের যে প্রয়োজন ছিল, সে যুগে অন্য কোন ছাঁচে সমাজ

গঠন যে সম্ভব ছিল না, ভূস্বামীতন্ত্রের বিস্তৃতি ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেখানে যেখানেই বর্ব্বরতন্ত্রের অবসান হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভূস্বামীতন্ত্রের ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমটা লোকে দেখিল এত অরাজকতারই জয়জয়কার চলিতেছে। সমস্ত ঐক্য, সার্ব্বজনীন সভ্যতার সমস্ত উপাদান অন্তর্হিত হইয়া গেল ; চারিদিকে বিরাট সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল এবং তাহার স্থলে কতকগুলি ক্ষুদ্র, নিষ্প্রভ, সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ সমাজ মাথা তুলিয়া উঠিল। তখনকার লোকের চক্ষে এব্যাপার বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ও প্রলয়ের সূত্রপাত বলিয়া মনে হইল। সে কালের কবি ও ইতিবৃত্তকারদের রচনা পাঠ করুন : দেখিবেন তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস যে তাঁহারা জগতের অন্তিম কালে উপস্থিত হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তখন এক নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হইল ; সমাজ ক্ষেত্রে তখন ভূস্বামীতন্ত্ররূপ এক নূতন তন্ত্র, নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল। এ ব্যবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা পরম্পরার একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ; সেই যুগে এইরূপ একটা শাসনতন্ত্রেরই একান্ত প্রয়োজন ছিল ; সুতরাং চারিদিকে সমাজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই ভূস্বামীতন্ত্রের ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি যাজকতন্ত্র, পৌরতন্ত্র, রাজতন্ত্র প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ বা সম্পর্ক নাই, তাহারাও ইহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে, ইহার ছাঁচে স্ব স্ব প্রকৃতি পুনর্গঠিত করিয়া লইতে বাধ্য হইল, চর্চ্চগুলি ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার মধ্যে একদিকে প্রভুস্বাধিকারী ভূস্বামী (suzerain), অপরদিকে দায়বদ্ধ ভূভোগী প্রজা (vassal) হইয়া পড়িল। পৌরসংঘগুলিও একদিকে প্রভু, অন্যদিকে প্রজা হইল। রাজক্ষমতা এখন ভূম্যাধিকারীর অধিকারে মণ্ডিত হইয়া আপনার পূর্ব্বপরিচয় লুকাইয়া ফেলিল। শুধু ভূমিবণ্টন ব্যাপারেই ফিউড্যাল নীতির ক্রিয়া আবদ্ধ থাকিল না। জঙ্গলে গাছ কাটিবার অধিকার, জলে মাছ ধরিবার অধিকার প্রভৃতি অধিকারও ভূখণ্ডের ন্যায় ফিউডাল নীতি অনুসারে বণ্টিত হইতে লাগিল। চর্চের যে সমস্ত নানাবিধ আয় ছিল, তাহাও এই ভাবে বিলি করা হইত। সমাজের সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যেমন ফিউড্যালিমের কাঠামর মধ্যে প্রবেশ করিল, সেইরূপ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্ত তুচ্ছতম উপকরণ পর্য্যন্ত ফিউড্যালিজ্‌মের ছাপ গ্রহণ করিল।

ফিউড্যালিজ্‌মের বাহ্য-আকৃতি যেভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয় অধিকার করিয়া বসিল, তাহাতে প্রথমটা মনে হইতে পারে যে ফিউড্যাল নীতির অন্তঃপ্রকৃতি ও প্রাণতত্ত্বও বুঝি সর্ব্বত্র জয়ী হইল। কিন্তু সেটা ভুল। সমাজের যে সমস্ত অঙ্গ, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ফিউড্যালিজ্‌মের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্পর্কিত ছিল না, তাহারা ফিউড্যালিজ্‌মের বাহ্য আকৃতি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু স্ব স্ব মূল প্রকৃতি বা বিশিষ্ট নীতি বর্জন করিল না। চর্চ্চ বাহিরে ফিউড্যাল্ চর্চ্চ হইল, কিন্তু মূলে যাজকতন্ত্র নীতিদ্বারা শাসিত ও অনুপ্রাণিত হইতে থাকিল ; ফিউড্যালিজ্‌মের ছদ্মবেশকে সে দাসত্বের চাপরাশ ভিন্ন আর কিছুই মনে করে নাই ; তাই কখনও রাজশক্তির সহায়তায়, কখনও পোপের সহায়তায়, কখনও বা প্রজাশক্তির সহকারিতায় সে এই ফিউড্যালিজ্‌মের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অবিরাম চেষ্টা করিয়াছে। রাজতন্ত্র ও পৌরতন্ত্রের ক্ষেত্রেও ঐরূপ ব্যাপার ; মূলে তাহারা স্ব স্ব বিশিষ্ট প্রকৃতি দ্বারাই

অনুপ্রাণিত হইতে থাকিল। ফিউড্যালিজমের চাপরাশ সত্বেও ইউরোপীয় সমাজের এই সমস্ত বিচিত্র অঙ্গ এই বিরুদ্ধ প্রকৃতি শাসনতন্ত্রের ছাপ মুছিয়া ফেলিয়া নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রকৃতির অনুযায়ী স্বরূপে প্রকট হইবার জন্ত অনবরত চেষ্টা করিয়াছে।

ফিউড্যালিজ্‌মের বাহ্যআকৃতি কিরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তাহা দেখা গেল, কিন্তু তাহার অন্তঃপ্রকৃতি ও প্রাণতত্বও যে সেইরূপ সর্ব্বত্র বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি লাভ করিল এ সিদ্ধান্ত যেন আমরা না করিয়া বসি, আর যে ক্ষেত্রেই ফিউড্যালিজ্‌মের বহিঃসাদৃশ্য মাত্র দেখিব সেই ক্ষেত্রেই ফিউড্যালিজ্‌মের যথার্থ পরিচয় লাভ করিব এরূপ আশা না করি। ফিউড্যালিজ্‌মৃকে ভাল করিয়া বুঝিতে ও জানিতে হইলে, আধুনিক সভ্যতার গঠন সম্পর্কে ইহার প্রভাব ও কার্য্যকারিতা বুঝিতে ও বিচার করিতে হইলে, এমন ক্ষেত্রে ইহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে যেখানে ইহার বাহ্য আকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। যেখানে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের বর্ব্বরবিজেতৃবর্গের সম্মিলনে, স্তরে স্তরে উচ্চনীচ পর্য্যায়ে ভূস্বামী ও ভূসম্পত্তির বিন্যাস ঘটিয়াছে, সেই ক্ষেত্রেই ইহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইবে। আসুন আমরা এখন সেই ক্ষেত্রেই প্রবেশ করি।

অনতিপূর্ব্বে আমরা ইতিহাসচর্চ্চায় নীতিতত্ত্বের আলোচনা কিরূপ আবশ্যক হয় তাহা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতমুখে মানবজীবনের আরও একটা দিক আছে, যাহা এপর্য্যন্ত যথাযুক্তভাবে আলোচিত হয় নাই. একটা নূতন ঘটনা বা বিপ্লব বা নূতন সামাজিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা মানুষের শারীরিক জীবন যাত্রা প্রণালী, মানুষের বাহ্যজীবনে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সমাজের এই বাহ্য অবস্থার দিকটা আমরা সব সময়ে যথোপযুক্তরূপে আলোচনা করি নাই। অথচ এই সকল বাহ্য পরিবর্ত্তন সমগ্র সমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। ইতিতত্ত্ববিদ্‌ মঁতেস্কিয়্‌ (Montequieu) জল বায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে কিরূপ গবেষণা করিয়াছিলেন ও ঐ প্রভাবকে কতখানি মূল্য দিতেন তাহা কাহার অবিদিত আছে? মানুষের উপর জলবায়ুর মুখ্য প্রভাব হয় ত যতটা ব্যাপক বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন ততটা নহে; অন্ততঃ সে প্রভাবের ক্রিয়া অস্পষ্ট ও তাহার পরিমাপ নির্দ্দেশ করা কঠিন। কিন্তু জলবায়ুর গৌণ প্রভাব, যদ্দারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোককে মুক্ত বায়ুতে বাস করিতে হয়, শীত প্রধান দেশের লোককে গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, বিভিন্ন দেশের লোককে বিভিন্ন দ্রব্য আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতে হয়, এই গৌণ প্রভাব তুচ্ছ ব্যাপার নহে; কারণ এই রূপে বাহ্য অবস্থার সামান্ত প্রভেদে সভ্যতার গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। বড় বড় বিপ্লবমাত্রেই সমাজের বাহ্য জীবনে এইরূপ অনেক পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলে; এবং এই সকল পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে আলোচনার বিষয়।

ফিউড্যালিজ্‌মের প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজের বাহ্যাবস্থার এইরূপ একটা বড় পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলে। ইতিপূর্ব্বে ভূম্যধিকারিবৃন্দ যাহারা দেশের মালিক, তাহারা ঝাঁক বাঁধিয়া হয় স্থাবরভাবে সহরে বাস করিত, নয় যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দলে দলে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইত। ফিউড্যাল্‌ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে সেই লোকেরাই

এখন পরস্পর হইতে বহুদূরে আপন আপন আলয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে লাগিল। সভ্যতার গতি প্রকৃতির উপর এত বড় একটা পরিবর্ত্তনের প্রভাব যে কতখানি হইবে তাহা আপনারা সহজেই বুঝিবেন। সমাজের কর্তৃত্ব, সমাজ শাসনের কেন্দ্র এখন সহসা সহর হইতে পল্লীগ্রামে চলিয়া গেল। সামাজিক সম্পত্তির অপেক্ষা এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য বাড়িয়া গেল; সামাজিক জীবন অপেক্ষা ব্যক্তিগত জীবনের আদর বাড়িয়া গেল। ফিউড্যাল সমাজ প্রতিষ্ঠার এইটিই হইল প্রথম ফল। এই ফলের সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যাইবে ততই দেখিতে পাইব এই একটি পরিবর্ত্তনের পরিণাম কত দূরব্যাপী।

এখন এই ফিউড্যাল সমাজেরই একটু বিশেষ পরিচয় লওয়া যাউক এবং দেখা যাউক সভ্যতার ইতিহাসে এই সমাজ কি ভাবে কাজ করিয়াছে। প্রথমে এই ফিউড্যাল্ সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা সরল, আদিম ও ভিত্তিগত উপাদান লইয়া আরম্ভ করা যাউক। মনে করুন একটি সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডের একমাত্র ভোগাধিকারী তাঁহার ভূসম্পত্তির মধ্যভাগে একেশ্বর হইয়া বাস করিতেছেন। এখন দেখা যাউক তাঁহাব চতুঃপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সমাজ গঠন করিয়া যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের কিরূপ অবস্থা হয়।

তিনি একটি স্বতন্ত্র সুপরিচ্ছিন্ন উচ্চ স্থান বাছিয়া লইয়া প্রাকার পরিখাদি দ্বারা তাহাকে সুরক্ষিত করিয়া তাহার মধ্যে নিজের আবাসের জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। কাহাদিগকে লইয়া তিনি এখানে বাসস্থাপন করিলেন? তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া। হয়ত জন কয়েক ভূসম্পত্তি হীন স্বাধীন প্রজা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার অনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতে লাগিল ও তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। দুর্গের অভ্যন্তরে ইঁহাদের বাস। বাহিরে দুর্গের পাদমূলে চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি দাস ও অন্যান্য লোক আসিয়া একটি উপনিবেশ স্থাপন করিল; তাহারা ভূম্যধিকারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইল। নিম্নভূমির এই উপনিবেশের মধ্যে ধর্ম্ম আসিয়া একটি গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার মধ্যে একটি যাজক বসাইয়া গেল। ফিউড্যাল্ তন্ত্রের আদিম অবস্থায় এই যাজক এক কালে দুর্গেরও পুরোহিত ছিলেন, গ্রামেরও পুরোহিত ছিলেন, ক্রমশঃ এই দুই পদ স্বতন্ত্র হইয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তির অধিকারে গিয়া পড়ে; গ্রামের যাজক তখন গ্রামের মধ্যেই তাঁহার গির্জ্জাঘরের পাশে বাস করিতে লাগেন। এই হইল ফিউড্যাল্ সমাজের মৌলিক মূর্ত্তি, ইহাকে একটি ফিউড্যাল্ অণু বলা যাইতে পারে। এই মূলবীজটিকেই আমাদিগকে প্রথমে বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে—"তুমি মানুষের আত্মার বিকাশে কি সহায়তা করিলে? তুমি মানব সমাজের পুষ্টিই বা কিরূপে অগ্রসর করিয়া দিলে?"

এখনই যে ক্ষুদ্র সমাজটি বর্ণনা করা গেল—তাহারই নিকট এত বড় দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত করায় কিছুমাত্র দোষ হইবে না, এবং সে যে উত্তর দিবে তাহা মানিয়া লইতে কোন দ্বিধার প্রয়োজন নাই। সে যে সমগ্র ফিউড্যাল্ সমাজের মূল আদর্শ ও প্রতিনিধি। ভূস্বামী তাঁহার অধিকারভুক্ত লোকবর্গ, ও যাজক—ছোট আকারেই হউক আর বড় আকারেই হউক এই তিন উপাদান লইয়াই ফিউড্যাল্ সমাজ। অবশ্য ইহা ছাড়া রাজা আছেন; পৌর সমাজ

আছে। কিন্তু রাজতন্ত্র ও পৌরতন্ত্র ফিউড্যাল্ সমাজের মৌলিক উপাদান নহে—স্বতন্ত্র উপায়ে স্বতন্ত্র নীতি হইতে তাহাদের উদ্ভব।

এই ক্ষুদ্র সমাজের বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমেই একটি জিনিষ চোখে পড়ে। এসমাজে ভূস্বামীর মর্য্যাদা ও গৌরব তাঁহার নিজের চক্ষে ও তাঁহার অনুচরবর্গের চক্ষে খুব বড় আকার ধারণ করে। ব্যক্তিত্বের ধারণা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাব বর্ব্বর সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল কিন্তু ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর যে আত্মমর্য্যাদাবোধ, এ একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। বর্ব্বরসমাজে প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক যোদ্ধা ব্যক্তি হিসাবে যে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অনুভব করিতেন, এ তাহা নহে। এখানে ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির মর্য্যাদা নহে, ভূসম্পত্তির অধিকারী হিসাবে অধিকার গৌরব, গৃহস্বামী হিসাবে স্বামিত্বের গৌরব, দাসবৃন্দের চালক হিসাবে প্রভুত্বের গৌরব। এমন অবস্থার ফলে ফিউড্যাল্ সমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে একটা অপরিমিত আত্মগরিমার সৃষ্টি হইল, যাহার যথার্থ তুলনা অন্য কোন সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ কথা প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজের মধ্য হইতে একটা আভিজাত্যের নিদর্শন লওয়া যাউক। যথা, ধরুন রোমের পাট্রিসিয়ান্ আভিজাত্য। ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর মত রোমের পাট্রিসিয়ান্ গৃহস্বামী, প্রভু ও জননায়ক ছিলেন। তাহা ছাড়া স্বপরিবারের মধ্যে তিনি পণ্টিফ্ বা ধর্ম্মযাজক ছিলেন।

এখন ধর্ম্মযাজক হিসাবে তাঁহার যে মর্য্যাদা সে মর্য্যাদা আসিয়াছে বাহির হইতে ; এ মর্য্যাদায় তাঁহার কোন ব্যক্তিগত গৌরব নাই ; তিনি এখানে দেবতার প্রতিনিধি ; তিনি ধর্ম্মমন্ত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র। রোমক পাট্রিসীয়ান্ তাহা ছাড়া সেনেটনামধারী এক পৌরসঙ্ঘের সভ্য। কিন্তু এ মর্য্যাদাও তাঁহার বাহির হইতে পাওয়া, পৌরসঙ্ঘের নিকট হইতে ধার করা এ মর্য্যাদা। প্রাচীন অভিজাতবর্গের যে পদমর্য্যাদা তাহা ধর্ম্ম ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট, সমাজ হইতে সঙ্ঘ হইতে তাহার উদ্ভব, তাহা স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র সম্পত্তি নহে। কিন্তু ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর মর্য্যাদা একেবারে ব্যক্তিগত ; ইহা কাহারও নিকট হইতে পাওয়া নহে ; তাঁহার সমস্ত অধিকার, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। তিনি ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মনিয়ন্তা ছিলেন না ; তিনি কোন সেনেটের ধার ধারিতেন না ; তাঁহার সমস্ত গৌরব ও মর্য্যাদা তাঁহার একান্ত নিজস্ব। এমন পদের যিনি অধিকারী হইবেন তাঁহার চরিত্রের উপর যে ইহার প্রভাব কিরূপ প্রচণ্ড হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার মনের মধ্যে না জানি কি ঔদ্ধত্য, কি অহঙ্কার, কি বিরাট দর্পের উদ্ভব হইবে! তাঁহার মাথার উপরে এমন কেহ নাই, যাঁহার তিনি প্রতিনিধি বা ব্যাখ্যাতা ; তাঁহার চারিপাশে এমন কেহ নাই যিনি তাঁহার সমানপদস্থ ; এমন কোন প্রবল বিধিবিধান নাই যাহা তাঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে এমন কোন নীতি নাই যাহা তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে খর্ব্ব করিতে পারে ; তাঁহার শক্তির সাধারণ সীমা ও আসন্ন বিপদ ব্যতিরেকে আর কোন বাধাই তিনি মানেন না। মানব-চরিত্রের উপর ফিউড্যাল্ তন্ত্রের ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। (ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম. এ. মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

উড়িয়া মন্দির

গত ফাল্গুন মাসে আমরা উড়িয়া শিল্পশাস্ত্রের মোটামুটী পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য উড়িয়া মন্দিরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। এই প্রবন্ধে আমরা উড়িয়া মন্দিরের সম্বন্ধে শুধু দুইটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিব : প্রথম, তাহাদের পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় তাহাদের জাতিবিভাগের প্রণালী। ভবিষ্যতে সুযোগ হইলে মন্দিরের অলঙ্কার, অর্থাৎ যে সকল নক্‌সা বা মূর্ত্তি স্থানে স্থানে বসাইয়া মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করা হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

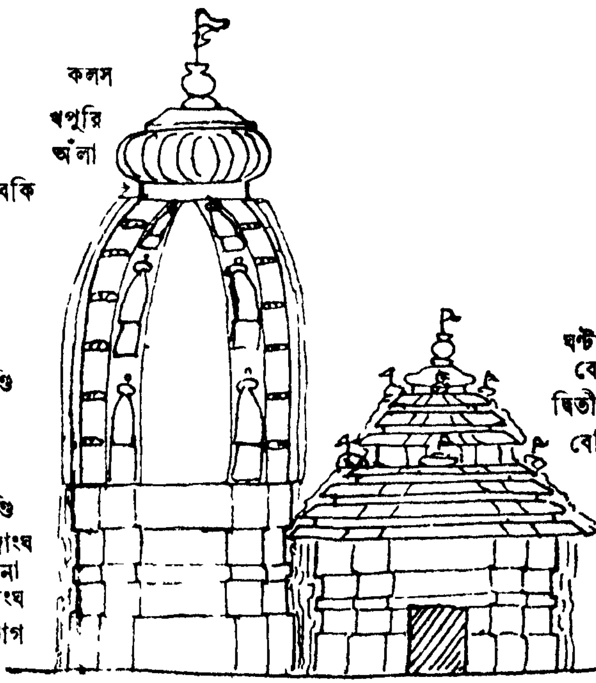

মন্দিরের সাধারণ বর্ণনা—

উড়িয়া মন্দির সাধারণতঃ কিরূপ হইয়া থাকে, তাহার একখানি চিত্র দেওয়া গেল। রেখ-দেউলের মধ্যে বিগ্রহ থাকেন এবং ভদ্র দেউলে দাঁড়াইয়া যাত্রীরা তাঁহাকে দর্শন করেন। রেখ ও ভদ্র দেউল পারিভাষিক নাম, কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে ইহাদের বড় দেউল ও জগমোহন বা মুখশালা বলা হয়। আমরা পারিভাষিক নামই ব্যবহার করিব। 'রেখ' ও 'ভদ্র' এই দুই নামের অর্থ বুঝা দরকার। রেখ দেউলের দিকে দেখিলে প্রথমেই তাহার উচ্চতা চোখে পড়ে এবং তাহার পর তাহার গায়ে বিভিন্ন রথের (pilasters) মধ্যে যে

অন্ধকার ব্যবধান কালরেখার মত উপর হইতে নীচ নামিয়া আসিয়াছে, তাহা চোখে পড়ে। বোধ হয় তাহা হইতেই ইহার নাম রেখ-দেউল।

ভদ্র-দেউল শব্দের অর্থ যতদূর বুঝিয়াছি, তাহা এইরূপ। শিল্পশাস্ত্রে একটী প্রবাদ পাওয়া যায় যে সর্ব্বসমেত ৩৬ রকম মন্দির আছে, কিন্তু সেই পুঁথিতেই আবার অধিক সংখ্যক মন্দিরের বর্ণনা আছে। এই পুরাতন ৩৬ মন্দিরের নামযুক্ত একটী শ্লোক পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে 'ভদ্র' ও 'মহাদ্রবিড়া' নামের দুই মন্দিরের উল্লেখ আছে। অন্যত্র মন্দিরের যে সকল বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় 'ভদ্র' ও 'মহাদ্রবিড়া' ছাড়া সকলগুলি রেখ-দেউল ছিল। কালক্রমে এই ভদ্র দেউলের অনুকরণেই বোধ হয় পরে নলিনী-ভদ্র বিজয়া-ভদ্র প্রভৃতি ভদ্র-দেউলের রচনা হয়, এবং তাহার পর 'ভদ্র' এই শব্দ জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। অতএব রেখ-দেউল যেমন বিবরণমূলক নাম, ভদ্র-দেউল সেরূপ নহে। ভদ্র দেউলেরও একটী বিবরণমূলক নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রে তাহার ব্যবহার অতি কদাচিৎ হইয়াছে। ভদ্র দেউলের ছাত পিরামিডের মত দেখিতে হয়। অনেকগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র থাপ গাঁথিয়া ছাতের রচনা হয়। তাহা হইতে ভদ্র-দেউলের এক নাম হইয়াছে পিঢ়া-দেউল। পিঢ়া শব্দের অর্থ 'পিঁড়ি'।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মন্দিরে বিগ্রহ থাকেন, সেই মন্দিরকে 'বড় দেউল' বলা হয়। উড়িষ্যায় সাধারণতঃ বড় দেউল রেখ-দেউল হইয়া থাকে। তাহার সম্মুখে ভদ্র-দেউল থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। সময়ে সময়ে যাত্রীদের অকুলান হইলে সামনে আরও একটী বা দুইটী ভদ্র দেউল বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কখনও কখনও আবার দেখা যায় যে বড় দেউল একটী ভদ্র-দেউল ও তাহার সম্মুখে যাত্রীদের বসিবার দাঁড়াইবার জন্য চারি পাশ খোলা বা ঘেরা মণ্ডপ থাকে।

মন্দিরের পরিকল্পনা—

(১) ভুবনপ্রদীপে একটী পদ আছে "মেঘনাদ পুংসবিমান। এ প্রমাণে সব্ প্রসাদ হোই" (৫৭ পৃঃ)। ইহার অর্থ হইল 'যে পুরুষ রথ আছে তাহাকে মেঘনাদ বলিয়া জানিবে। সব প্রাসাদের বেলায় এই প্রমাণ সত্য। এখানে মন্দিরকে পুরুষ ও রথ উভয়ের সঙ্গে এক করা হইল। এখনকার শিল্পীরা সকলে রেখ-দেউলকে পুরুষ ও ভদ্র-দেউলকে স্ত্রী বলিয়া ভাবে। তাহার সম্মুখে যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভদ্র-দেউল যোগ করা হয়, তবে তাহারা যথাক্রমে সখী ও সখার স্থান পায়। শিল্পীদের মধ্যে এই শ্রুতিগত প্রবাদ ভুবনপ্রদীপের উল্লিখিত-পদকে কিছুদূর সমর্থন করে।

(২) মন্দিরের বিভিন্ন অংশের পারিভাষিক নাম চিত্রের মধ্যে মোটামুটী দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইবে সর্ব্বনিম্ন বিভাগের নাম 'পাদভাগ' (অপভ্রংশে পাভভাগ, পাভাগ) ; তাহার উপরে জাংঘ ('জংঘা' শব্দের অপভ্রংশ), তাহার উপর বান্ধনা ('বন্ধন শব্দ-জাত), তাহার উপরে 'উপর জাংঘ' ও 'বরণ্ডি'। তাহার উপর গণ্ডি (আভিধানিক অর্থ 'দেহের মধ্যভাগ'), তাহার উপর বেকি (=গলা), আঁলা (=আমলকী), কপুরি বা খপুরি

(= মাথার খুলি) ও কলস। এই সকল নামের মধ্যে অধিকাংশের পিছনে মন্দিরকে মানুষ বলিয়া পরিকল্পনা করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভদ্র দেউলের বাড় অংশ রেখ-দেউলের অনুরূপ। কিন্তু ছাতে পুঞ্জে পুঞ্জে 'পিঢ়া' সাজান আছে বলিয়া তাহার পারিভাষিক বর্ণনাও অন্যরূপ। ৫,৬ বা ৭ পিঢ়ার এক পুঞ্জকে এক 'পাটল' বলে (সং, পটল = অধ্যায়।) ২ পোটলের মধ্যে খাড়া দেওয়ালকে বেকি বলে। ১, ২ বা ৩ পোটলের সমষ্টিকে রেখ গণ্ডির অনুকরণে 'ভদ্র গণ্ডি' বলে। তাহার উপর বেকি ঘণ্টা বসে। ঘণ্টার মধ্যে কপুরি, আঁলা প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর বিভাগ আছে। অতএব এ ক্ষেত্রেও মন্দিরের পিছনে মানুষের ধারণার (concept) পরিচয় পাই। কিন্তু এক্ষেত্রে 'গণ্ডির' (দেহের মধ্যভাগ) মধ্যে ২।১ টী 'বেকি' (গলা) আসিয়া পড়ায় মানুষের পরিকল্পনা তত স্পষ্টভাবে খাটে নাই দেখা যাইতেছে।

(৩) মন্দিরে দেওয়ালে যে সব রথ (pilasters) দেখা যায় তাহাদের নাম মধ্যরথ, উপরথ, অনুরথ, পরিরথ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে রথের ধারণা স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। (আজকাল এই সকল নামের পরিবর্ত্তে রাহা, অনুরাহা, অনুরথ, পরিরথ প্রভৃতি নাম ব্যবহার হয়। শিল্প শাস্ত্রে উভয় নামগুচ্ছের ব্যবহার দেখা যায়।)

(৪) সময়ে সময়ে কোন কোন রথে ছোট আকারের রেখ-দেউলের প্রতিকৃতি থাকে। এগুলিকে 'শিখর' বলে। যখন শিখরগুলি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হয়, তখন সমস্ত মন্দিরটীকে অনেক শৃঙ্গযুক্ত (শিখর) পাহাড়ের মত দেখায়। ইহা ছাড়া কোণের রথে কতকগুলি ছোট বিভাগ করা হয়, (চিত্র দেখুন), এগুলিকে যথাক্রমে প্রথম ভূমি, দ্বিতীয় ভূমি, তৃতীয় ভূমি বলে। যে মন্দিরে ভূমির সংখ্যা যত বেশী, তাহার বেশী উচ্চ হওয়ার সম্ভাবনাও তেমনই বেশী।

(৫) ভুবন প্রবেশে একটী পদ আছে "শিখর হীন প্রসাদং। ঈতরজন যথা মহা।" (২০ পৃঃ) অর্থাৎ ইতর লোক যেমন মহান লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া নিন্দার পাত্র হয়, যে প্রাসাদের (মন্দির) শিখর নাই, তাহার অবস্থাও ঠিক তেমনই হয়। বাস্তবিক শিল্পীদের মধ্যে ও শিল্প শাস্ত্রে কোথাও কোথাও শিখরবিহীন প্রাসাদকে 'নপুংসক' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

সারকথা—আমরা এতক্ষণ মন্দিরের বর্ণনায় ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের বিচার করিলাম। এখন সবগুলিকে চোখের সামনে রাখিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই মন্দিরের পরিকল্পনায় পিছনে তিনটী ধারণা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রথম মন্দির ও রথ এক ;

দ্বিতীয়, মন্দির একটী মানুষ বিশেষ ;

তৃতীয়, পাহাড়ের সহিত তাহার তুলনা করা চলে।

এই ত' গেল পরিকল্পনাব কথা। এই বারে দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মন্দিরের জাতি বিভাগের প্রণালী

রেখদেউলের যে চিত্রটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে যে

মন্দিরের দেওয়াল সাধারণ বাড়ীর দেওয়ালের মত সমান উঠে নাই। মাঝখানে কিছু অংশ অবশিষ্ট অংশ হইতে মেলিয়া আসিয়াছে। তাহার পর আবার মাঝের অংশ হইতে আবার কিছু অংশ আরও মেলিয়া আসায় মন্দিরের প্রত্যেক দিক সবশুদ্ধ পাঁচটী রথের (pilasters) সমষ্টি হইয়াছে। এইরূপে ত্রিরথ, সপ্তরথ, নবরথ দেউল হওয়াও সম্ভব। ত্রিরথ দেউলকে শূদ্রজাতীয়, পঞ্চরথ দেউলকে বৈশ্যজাতীয়, সপ্তরথ দেউলকে ক্ষত্রিয় জাতীয় ও নবরথ দেউলকে ব্রাহ্মণজাতীয় বলা হয়। উড়িষ্যার একরথ দেউল অতি কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু যে দুইখানি শিল্পশাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একরথ দেউলের কথা একেবারেই নাই। যতগুলি মন্দিরের বর্ণনা পুঁথিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই এই চারি জাতির একটীর অন্তর্গত।

মোটামুটী এইরূপ জাতি বিভাগের পর, নিম্নলিখিত বিষয়পরম্পরের মধ্যে প্রভেদ আনিয়া বিভিন্ন উপজাতির সৃষ্টি হয়

(১) তাহাদের বিভিন্ন রথের প্রস্থের অনুপাতে পার্থক্য ;

(২) তাহাদের শিখরের সংখ্যায় পার্থক।

উপজাতির মধ্যে আর কোনো মূলগত প্রভেদ নাই। সকল রেখদেউলেরই উপর হইতে নীচের বিভাগগুলি (horizontal components) সমান। অর্থাৎ যে কোন মন্দিরের গর্ভ (যে ঘরে বিগ্রহ থাকেন) ১০ হাত দীর্ঘ প্রস্থ হইলে, তাহার পাদভাগ ৬০ আঙ্গুল, তাহার জাংঘ ৫০ আঙ্গুল ইত্যাদি হইবে। তবে কোন রেখ দেউলের সম্মুখে ভদ্র দেউল করিতেই হইবে, আবার কোনটীর সম্মুখে ভদ্র দেউল করিতে নাই।

এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪২ রকমের মন্দিরের বর্ণনা উভয় পুঁথিতে আছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এমন সন্দেহ হইবার কারণ আছে যে পূর্ব্বে মাত্র ৩৬ রকম প্রাসাদের প্রচলন ছিল। হয়ত সময়ক্রমে বা ভুলক্রমে (নামের উচ্চারণে দোষের জন্য) তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, কতকগুলি মন্দিরের নাম দেওয়া হইল। নাম করণে যথেষ্ট রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মেরু, মন্দর, কৈলাস, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ভদ্র, মহাদ্রবিড়া, চিত্রকুট, সুবর্ণকুট, হংস, গরুড়, মেদিনীবিজয়, রত্নসার, মাধবী, বসন্ত ইত্যাদি।

ভদ্র দেউল—এতক্ষণ আমরা প্রধানতঃ রেখদেউল লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম। বাস্তবিক শিল্পশাস্ত্রের মধ্যেও তাহাই হইয়াছে। শিল্পশাস্ত্রে ভদ্র দেউলের স্থান তত উন্নত নয় এবং সর্ব্বসমেত মাত্র ৫ রকম ভদ্র দেউলের সন্ধান পাওয়া যায়। ভদ্র দেউলের পরিকল্পনার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখন কেবল রেখ দেউলের সহিত তাহাদের অনুপাতের সম্বন্ধ ও তাহাদের জাতি বিভাগের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।

যদি রেখ দেউলের গর্ভ ১ হাত (১৬ আঙ্গুল) দীর্ঘপ্রস্থ হয়, তবে তাহার বাহিরের মোট উচ্চতা ৫ হাত হইবে বলিয়া শাস্ত্রে বিধি আছে (কিন্তু তথ্যের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।) তাহার সম্মুখে যে ভদ্র দেউল থাকিবে তাহার গর্ভ ১¼ হাত (২০ আঙ্গুল) ও বাহিরের মোট উচ্চতা ৩¾ হাত (৬০ আঙ্গুল) হইবে।

ভদ্র দেউলে এক পোটল পিঢ়া থাকিতে পারে, দুই পোটল থাকিতে পারে, অথবা তিন পোটল থাকিতে পারে। রেখদেউল সাধারণতঃ যেমন একরথ হয় না, ভদ্র দেউলও তেমনি হয় না, মধ্যের রথ কিছুদূর মেলিয়া আসে। তাহার উপর শোভাবৃদ্ধির জন্য একটী ক্ষুদ্র আকারের 'ঘণ্টা' বসান হয়। চিত্রটী দেখিলে বুঝা যাইবে যে ভদ্র দেউলে মাত্র একটী পোটল থাকিলে চারিদিকে মধ্যরথে চারটী ছোট ঘণ্টা ও প্রধান বড় ঘণ্টাটী লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ ঘণ্টা হয়। এরূপ ভদ্র দেউলকে সাধারণতঃ 'পঞ্চ ঘণ্টা ভদ্র' বলে। যদি এক পোটলের পরিবর্ত্তে দুই পোটল থাকে, তবে সর্ব্বসমেত নয় ঘণ্টা হয় এবং দেউলকে 'নবঘণ্টা ভদ্র' বলে। এইরূপ 'ত্রয়োদশ ঘণ্টা ভদ্র' হইতে পারে। ইহার বেশী আর কোন সূক্ষ্ম উপজাতিবিভাগের প্রণালী ভদ্র দেউল সম্বন্ধে প্রচলিত নাই। অবশ্য রেখ দেউলের মত ভদ্র দেউলও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় হইয়া থাকে।

উপসংহার—অতএব আমরা মোটের উপর দেখিলাম যে উড়িয়া মন্দিরের পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবস্থা আছে এবং তাহাদের জাতি বিচারের প্রণালী ন্যায়সঙ্গত।

আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী বাড়ীর পরিকল্পনায় 'সুবিধা' ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তবে নিতান্ত অসুন্দর দেখাইবে বলিয়া গ্রীক থাম, ভিনীশিয় জানালা প্রভৃতি জুড়িয়া দিয়া একটী বিচিত্র ছন্দোবিহীন রচনা তৈয়ারী হয়। কোন বাড়ী দেখিতে ক্যাশ-বাক্সের মত, কোনটী বা স্বর্গে উঠিবার ভাঙ্গাচোরা ধাপের মত দেখিতে হয়। কিন্তু উড়িয়া মন্দিরের রচনা এইরূপ বেরসিক রচনা নয়। তাহার পিছনে ধারণার একটী ঐক্য আছে এবং এইজন্য মন্দিরের উপর যে সব অলঙ্কার, মূর্ত্তি প্রভৃতি বসান হয়, তাহাদের অবস্থিতি প্রধান ছন্দের সহিত ঠিক জুড়িয়া দেওয়া যায়। ইহার ফলে সমস্ত মন্দিরে যে ভাবগত ঐক্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে, তাহাতে সমস্ত রচনাটী পরিপুষ্ট ও সুন্দর বোধ হয়।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

পুস্তকপরিচয়

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র। শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ এম, এ, বিরচিত। মূল্য দুই টাকা।

এ দেশে মহৎ লোকদিগের জীবনচরিতের উপাদান সংগ্রহ করা নিতান্ত সহজ নহে। এ জন্য জীবনচরিত রচনা করাও অতিশয় কঠিন কার্য্য। সুলেখক মন্মথ বাবু এই কঠিন কার্য্যেই হস্তার্পন করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া, কবি হেমচন্দ্র, মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার প্রণীত "মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র" প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। লেখক উদারচিত্ত, তাঁহার ভাষা সুমিষ্ট, তিনি অর্থব্যয় করিয়া অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ছবি এই গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়াছেন। এই সকল কারণে লেখকের গ্রন্থখানি অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি, এ, কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ১৲ টাকা। আমরা এই গ্রন্থখানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি। লেখক সরল ভাষায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি, "মামেকং শরণং ব্রজ," "ঈশ্বর মঙ্গলময়" প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের সকল স্থানেই এই সকল আলোচনা যে আশানুরূপ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তবুও বহিখানি পড়িয়া শিক্ষালাভ করা যায় উপকার পাওয়া যায়, গ্রন্থের প্রথমেই শ্রদ্ধেয়া কবি কামিনী রায়ের লিখিত একটি ভূমিকা মুদ্রিত করা হইয়াছে। সেই ভূমিকাটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] পৌষ, ১৩৩১ [৯ম সংখ্যা

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

এখন ফিউড্যালিজ্‌মের দ্বিতীয় পরিণামের বিষয় আলোচনা করা যাক। ফিউড্যালিজ্‌মের সম্পর্কে আসিয়া মানুষের পারিবারিক জীবন, পারিবারিক সম্বন্ধ যে নূতন আকার ধারণ করিল, তাহার প্রভাব সাধারণতঃ উপেক্ষিত হইলেও নিতান্ত সামান্য নহে।

এ পর্য্যন্ত যত প্রকারের পরিবার-শাসনপদ্ধতি দেখা গিয়াছে, সেগুলির দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করা যাউক। প্রথমতঃ বাইবেল ও প্রাচ্যগ্রন্থাদিতে যে পিতৃতন্ত্র (patiarchal) পরিবারের আদর্শ পাওয়া যায় তাহাই ধরা যাউক। এ জাতীয় পরিবার এক বৃহৎ সমাজ-বিশেষ। এক একটি পরিবার লইয়া এক এক জাতি (tribe)। কুলাধিপতি এই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাঁহার পুত্রকন্যা জ্ঞাতিগোষ্ঠী দাসদাসী লইয়া একত্র বাস করেন। তিনি যে শুধু তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করেন তাহা নহে, অর্থানর্থ, বৃত্তিব্যসন, জীবনযাত্রা সকল বিষয়েই তাঁহার সহিত তাহাদের কোন প্রভেদ নাই। আব্রাহমের কথা ভাবুন, পাট্রিয়ার্কদের কথা ভাবুন, আধুনিক কালের আরবদলপতিদিগের কথা ভাবুন, সর্ব্বত্রই কি এই এক চিত্র দেখা যায় না?

ক্লান্‌-পদ্ধতি বা গোষ্ঠীপদ্ধতি বলিয়া আর এক ধরণের পরিবার দেখা যায়। আয়র্লণ্ডে ও স্কটলাণ্ডে এই পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। সমগ্র ইউরোপেই বোধ হয় অধিকাংশ পরিবার এই ক্লানপদ্ধতির মধ্য দিয়া আসিয়াছে। এ পদ্ধতির মধ্যে কুলাধিপতি ও সাধারণ জনগণের মধ্যে একটা বৃহৎ পার্থক্য দেখা যায়। তাহাদের জীবনযাত্রা একরূপ নহে। অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্য ও দাসত্ব করিত; সর্দ্দারের কোন কাজ ছিল না, তিনি ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়। অথচ তাহারা সকলেই একবংশের সন্তান, সকলের কৌলিক নাম এক; এবং জ্ঞাতিত্ব, প্রাচীন

কুলপদ্ধতি, প্রাচীন কুলগৌরব, প্রভৃতি দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত থাকায় ক্লানভুক্ত সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একপ্রকার সাম্যও দেখা যাইত।

ইতিহাস হইতে এই দুইটি প্রধান পারিবারিক পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এর মধ্যে কি ফিউড্যাল্ পরিবারের পরিচয় পাওয়া গেল ? অবশ্যই গেল না। প্রথমে মনে হয় ফিউড্যাল পরিবারের সহিত "ক্লান"-পদ্ধতির পরিবারের বুঝি কিছু সম্বন্ধ আছে। কিন্তু দুইএর মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য অনেক অধিক। ফিউড্যাল্ ভূস্বামী যে ক্ষুদ্র জনসমাজ-দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাস করেন, তাহাদের সহিত তাঁহার বংশগত কোন সম্পর্কই নাই। তাহারা তাঁহার কৌলিক নামধারণ করে না। তাঁহার জীবনযাত্রাও বৃত্তির সহিত তাহাদের জীবনযাত্রা ও বৃত্তির কোন সাদৃশ্য নাই, তাঁহার কোন কার্য্য নাই; তাহারা শ্রমজীবী। ফিউড্যাল্ পরিবার ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ; ইহার গণ্ডী বিস্তৃত হইয়া জাতিপর্য্যন্ত পৌছায় না। স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়াই এই পরিবারের গঠন; অবশিষ্ট জনসমাজ হইতে পৃথক হইয়া দুর্গের সঙ্কীর্ণ পরিবার মধ্যেই এই পরিবারের জীবনযাত্রা। দাস ও উপনিবেশিকবর্গ এ পরিবারের অন্তর্গত নহে, কারণ তাহাদের উদ্ভব স্বতন্ত্র, পদমর্য্যাদাহিসাবে তাহাদের সহিত এ পরিবারের পার্থক্য অপরিমেয়। চারিদিকের সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ও উচ্চপদস্থ পাঁচ ছয়টি ব্যক্তি লইয়া ফিউড্যাল পরিবারের গঠন। এবং এই গঠনবৈশিষ্ট্য জন্য ইহার প্রকৃতির মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এ পরিবার সঙ্কীর্ণ ও কেন্দ্রীভূত; কাহাকেও ইহারা বিশ্বাস করিতে পারে না; নিজেদের অনুচরবর্গের হস্ত হইতেও আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে সতত প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। এরূপ পরিবারপদ্ধতিতে পরিবারের আভ্যন্তরীণ জীবন, পারিবারিক আচারব্যবহার অবশ্যই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এ কথা অবশ্য মানি যে ফিউড্যাল ভূস্বামীর উদ্দামপ্রবৃত্তির পাশবতা, অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ ও মৃগয়াতে কালক্ষেপ—ইহা পারিবারিক শিষ্টাচার বিকাশের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ ছিল। কিন্তু এ বাধা অনতিক্রম্য ছিল না। গৃহস্বামী মৃগয়া ও যুদ্ধের অবকাশে সচরাচর গৃহেই ফিরিতেন। সেখানে আসিয়া সর্ব্বদাই স্ত্রীপুত্রকন্যাকে দেখিতে পাইতেন, এবং অনেক সময় কেবল মাত্র তাহাদিগকেই দেখিতে পাইতেন; ইহাদিগকে লইয়াই তাঁহার স্থায়ী সমাজ, ইহাদিগের সহিতই তাঁহার স্থায়ী সংসর্গ, ইহারাই কেবল তাঁহার সুখ দুঃখ ভাগ্যাভাগ্যের অংশী। কাজে কাজেই পারিবারিক জীবন পরিপুষ্ট ও প্রভাববান হইয়া উঠিল। ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ফিউড্যাল্ পরিবারের মধ্যেই কি স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল না? প্রাচীন কালে যে যে সমাজে পারিবারিক জীবন প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোথাও ফিউড্যাল সমাজের মত স্ত্রীজাতির প্রভাবগৌরব স্বীকৃত হয় নাই। ফিউড্যাল্ সমাজের মধ্যে পারিবারিক শিষ্টাচার বিকশিত ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিল বলিয়াই স্ত্রীজাতির পদমর্য্যাদার এই উন্নতি সম্ভব হইল। কেহ কেহ প্রাচীন জার্ম্মাণদিগের বিশিষ্ট আচারব্যবহারের মধ্যে স্ত্রীজাতির এই উন্নতির মূল দেখিতে পান, কারণ জার্ম্মাণ জাতি অরণ্যবাসকালেই নাকি স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। টাসিটসের একটি উক্তির উপর নির্ভর করিয়া জার্ম্মাণ স্বাদেশিকতা স্ত্রীপুরুষের পরস্পরসম্বন্ধবিষয়ে জার্ম্মাণ আচার যে

আদিমকাল হইতে পবিত্র ও গরীয়ান্ এইরূপ একটা ধারণা গড়িয়া তুলিয়াছে। এ কেবল কল্পনার কথা। জার্ম্মাণদিগের আচারব্যবহার সম্বন্ধে টাসিটসের যে উক্তি, তদনুরূপ শত শত উক্তি বহু পর্য্যটক অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে প্রাচীনকালোচিত সরলতার কিছুই নাই, বিশেষ কোন জাতির বৈশিষ্ট্যও কিছুই নাই। সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার ফলেই পারিবারিক শিষ্টাচারের উন্নতি ও প্রভাববৃদ্ধি হইতেই ইউরোপে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার উদ্ভব; এবং এই শিষ্টাচারের বিকাশ অতি অল্পকালের মধ্যেই ফিউড্যাল্ পদ্ধতির একটা প্রধান বিশেষত্ব হইয়া উঠিল।

ফিউড্যাল্ সমাজে পারিবারিক জীবনের প্রাধান্যের আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। কুলপারম্পর্য্যবোধ ফিউড্যালিজমের একটি বিশেষ ধর্ম্ম। পারিবারিক ভাবের মধ্যেই এই কুলস্থিতির আদর্শ জড়িত হইয়া আছে। কিন্তু এ আদর্শটি ফিউড্যালিজমের আশ্রয়ে যেমন সতেজ ও পরিপুষ্ট হইল তেমন আর কোথাও হয় নাই। ফিউড্যাল্ পদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ যে ভূসম্পত্তি, সেই ভূসম্পত্তির বিশেষ প্রকৃতি হইতেই এই বংশপারম্পর্য্য, বংশস্থিতি আদর্শের উদ্ভব। ফীফ্ বা ফিউড্যাল্ সম্পত্তি অন্যান্য সম্পত্তি হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য, চারিদিকের ভূস্বামি সমাজের মধ্যে ইহার মান মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অনবরত একটি কর্ত্তৃশক্তির প্রয়োজন ছিল। তাহার ফলে ভূস্বামী ভূসম্পত্তি এবং ঐ সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকারীপরম্পরা সকলে মিলিয়া এক বলিয়াই বিবেচিত হইত।

এই সকল কারণে ফিউড্যাল সমাজের পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় ও সবল হইয়া উঠিল।

এখন ভূস্বামীর আবাস হইতে বাহির হইয়া নিম্নভূমিস্থ ক্ষুদ্র উপনিবেশটির মধ্যে প্রবেশ করা যাউক। এখানে সমস্তই অন্যবিধ। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে যে যে কোন প্রকারের সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষ মানুষের সন্নিহিত হইয়া বাস করিলেই—তা সে সন্নিধান যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন—কিছুকাল পরে পরস্পরের মধ্যে একটা ভাবের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, দয়াদাক্ষিণ্য প্রীতি আশ্রিতবাৎসল্যের ভাব ফুটিয়া উঠে। ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার মধ্যেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। নিম্নভূমির ঔপনিবেশিক্-বর্গের সহিত দুর্গবাসী ভূস্বামীর মধ্যে অবশ্যই কিয়ৎকালের মধ্যে কতকগুলি নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কতক পরিমাণে প্রীতিসৌহার্দ্দ্যের আদানপ্রদান চলিয়াছিল। কিন্তু এ ব্যাপার সমাজব্যবস্থার গুণে সংঘটিত হয় নাই, সমাজব্যবস্থার বৈষম্যসত্ত্বেই ঘটিয়াছিল। শুদ্ধ সমাজব্যবস্থাহিসাবে বিচার করিতে গেলে এ সমাজের ব্যবস্থা কখনই অনুমোদন করা যায় না। ভূস্বামী ও দাসবর্গের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোনই নৈতিক আদান প্রদানের সম্বন্ধ ছিল না; তাহারা তাঁহার সম্পত্তির অংশমাত্র ছিল; তিনি তাঁহাদের ষোল আনা মালিক ছিলেন। একাধারে তিনি রাজা, প্রভু ও স্বত্বাধিকারী। তিনি আইন করিতে পারেন, কর বসাইতে পারেন, দণ্ড দিতে পারেন। আবার দান বিক্রয়ও করিতে পারেন। তাঁহার ক্ষমতা [illegible] তাঁহার সম্মুখে এমন কোন অধিকার, এমন কোন বিধিবিধান,

এমন কোন সমাজ শাসনের ব্যবধান ছিল না যাহা তাঁহার শক্তির কবল হইতে এই দাসসমাজকে রক্ষা করিতে পারে।

আমার মনে হয় এই কারণেই সকল কালে জনসাধারণ ফিউড্যাল প্রথা ও ফিউড্যালিজ্‌মের নিদর্শন মাত্রেরই প্রতি গভীর বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। একেশ্বরতন্ত্র অত্যাচারী হইলেও মানুষ তাহা সহ্য করিয়াছে, তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহার শাসনে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, এমন কি স্বেচ্ছাচার তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র যথেচ্ছচারী হইয়াও অনেক সময় জনসমাজের সম্মতি, এমন কি প্রীতিও লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই ফিউড্যাল্ একেশ্বরতন্ত্র চিরকালই লোকের ঘৃণাভাজন ও বিদ্বেষভাজন হইয়া আসিয়াছে। সে লোকসমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে পারে। কিন্তু লোকের আত্মার উপর সে প্রভাববিস্তার করিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই যে রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র সমাজে রাজা বা পোপ্ এমন কতকগুলি তত্ত্বের দোহাই মানিয়া শক্তি চালনা করেন যাহার নিকট রাজা প্রজা উভয়েই মাথা হেঁট করেন। রাজশক্তি সেখানে এক উচ্চতর শক্তির প্রতিনিধি, সে হয় ভগবানের নামে না হয় কোন বড় তত্ত্বের নামে আজ্ঞা প্রচার করে, দণ্ডপুরস্কার বিধান করে, তাহার শাসন শুদ্ধমাত্র মানুষের দ্বারা মানুষের শাসন নহে। ফিউড্যাল একেশ্বরতন্ত্রের প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা এক মানুষের উপর আর এক মানুষের আধিপত্য ; একটি মানুষের ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচারী ইচ্ছাশক্তির অখণ্ড আধিপত্য। মানুষের পক্ষে এটা গৌরবের কথা যে সে আর সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারীর আধিপত্য স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু এরূপ নিছক ব্যক্তিমানবের খেয়ালি শাসন সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবে না। যখনই সে দেখে যে তাহার শাসক শুদ্ধ একটি মানুষ মাত্র, যে ইচ্ছাশক্তি তাহাকে দমাইয়া রাখিতেছে তাহা শুদ্ধ মাত্র তাহাদেরই মত একটি মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল, তাহার মন তখন বিদ্রোহী হইয়া উঠে, সে সক্রোধ বিক্ষোভের সহিত সে শাসনভার বহন করে। ফিউড্যাল্ শাসনশক্তির ইহাই প্রকৃত পরিচয় ; এবং তাহার বিরুদ্ধে চিরকাল ধরিয়া যে বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই হইল তাহার মূল কারণ !

ফিউড্যাল তন্ত্রের সঙ্গে যে ধর্ম্মের সংযোগ ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহার শাসনভার কিছুমাত্র লঘু হয় নাই। আমার মনে হয় না যে পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে যাজকের প্রভাব খুব বেশী ছিল এবং নিম্নভূমির দাসবর্গের সহিত ভূস্বামীর সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত করিয়া তুলিতে তিনি যে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহাও মনে হয় না। খৃষ্টীয় চর্চ যে ইউরোপীয় সভ্যতার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নিশ্চয়, কিন্তু এ প্রভাব সাধারণ ভাবে কাজ করিয়াছিল, মানুষের মনের গতি খানিকটা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল, সমাজের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিধিবিধান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আচার ব্যবহারে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। এ ক্ষুদ্র ফিউড্যাল সমাজের একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে ভূস্বামী ও দাসবর্গের মধ্যস্থ হিসাবে যাজকের প্রভাব অতি সামান্যই ছিল। অধিকাংশ স্থলে তিনি নিজেই দাস সমাজের মত দাসভাবাপন্ন ও শিক্ষাসৌজন্যবর্জ্জিত

ছিলেন, সুতরাং ভূস্বামীর দর্পদম্ভ প্রতিরোধ করিবার মত তাঁহার সামর্থ্যও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। অবশ্য ঐ নিম্ন সমাজের মধ্যে নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবনের পুষ্টি ও সংরক্ষণে নিযুক্ত থাকিতে হইত বলিয়া অনেক স্থলেই তিনি ঐ সমাজের প্রীতি আকর্ষণ ও কল্যাণ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন; ঐ সমাজের মধ্যে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বাস ও জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন! কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার যজমানদের ঐহিক ভাগ্যের উন্নতি বিধান পক্ষে তাঁহার সামর্থ্যও ছিল না, তিনি কিছু করেনও নাই।

এখন আমরা ফিউড্যাল সমাজের মূল মূর্ত্তির পরিচয় পাইলাম। ভূস্বামী, তাঁহার পরিবার ও তাঁহার দাসানুচরবর্গের উপর এই সমাজ গঠনের প্রভাব কিরূপভাবে কাজ করিয়াছে, তাহাও দেখা গেল। এখন এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া যাউক। এক এক ভূস্বামীর মহালভুক্ত সকল অধিবাসীই যে ভূমি অবলম্বন করিয়া বাস করিত তাহা নহে ;—এ সমাজের বাহিরে এমন অনেক অনুরূপ বা ভিন্নরূপ সমাজ ছিল যাহাদের সহিত ভূস্বামীর মহালের সম্বন্ধ ছিল। এই যে বাহিরের বৃহৎ সমাজ সভ্যতার উপর তাহার প্রভাব কিরূপ তাহা বুঝা আবশ্যক।

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিব। ভূস্বামী ও যাজক উভয়েই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাহিরের বৃহৎ সমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। দুর্গ ও মহালের বাহিরে ও দূরে তাঁহাদের অনেক সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু ঐ দাস সমাজ, ঔপনিবেশিক সমাজের পক্ষে এ কথা বলা যায় না। এই যুগে দেশের অধিবাসীসমূহ বুঝাইতে যখনই আমরা "জনসমাজ" বা "প্রজাবর্গ" বা এরূপ কোন সাধারণ আখ্যার প্রয়োগ করে তখনই আমরা একটা ভুল করিয়া বসি, কারণ "জনসমাজ" বলিয়া তখন সাধারণ লোকের দেশব্যাপী কোন সমাজ ছিল না। এক এক ভূস্বামীর মহালভুক্ত দাস ও শ্রমজীবি লইয়া এক একটি স্বতন্ত্র স্থানীয় সমাজ। মহালের বাহিরে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহাদের পক্ষে কোন বৃহৎ সাধারণ নিয়তি ছিল না; দেশ বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না; তাহাদিগকে লইয়া একটা দেশব্যাপী জনসমাজ গড়িয়া উঠে নাই। যখনই আমরা সমগ্রভাবে বৃহৎ ফিউড্যাল সমাজের কথা বলি তখন তাহাতে ভূস্বামী সমাজ লক্ষ্য করা হয়।

এখন দেখা যাউক পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র ফিউড্যাল সমাজের সহিত বাহিরের বৃহৎ সমাজের কি সম্পর্ক ছিল, এবং এই সম্পর্কের ফলে সভ্যতার গতি প্রকৃতিই বা কিরূপে নিয়মন্ত্রিত হইল।

ফিউড্যাল ভূসম্পত্তি বা ফীফের অধিকারীদিগের মধ্যে পরস্পর কিরূপ বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ ছিল, তাহা অবশ্য আপনারা অবগত আছেন। নিম্ন স্তরের অধিকারী উচ্চ স্তরের অধিকারীকে যুদ্ধাদিকালে নিজের বাহুবল ও লোকবলের দ্বারা সাহায্য করিবেন, উচ্চাধিকারী তেমনি নিম্নাধিকারীকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন ও আশ্রয় দিবেন—এই হইল পরস্পরের মধ্যে সর্ত্ত। এই সর্ত্তগুলির বিশেষ বিচার এখানে আবশ্যক নাই। সেগুলি কি ধরণের ছিল সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলেই যথেষ্ট। এখন এই সমস্ত সর্ত্তবন্ধন ও দায় বন্ধনের একটা ফল অবশ্যম্ভাবী। ইহার ফলে প্রত্যেক ভূস্বামীর চিত্তে কর্ত্তব্যবোধ, প্রীতিসৌহার্দ্য প্রভৃতি কতকগুলি নৈতিকভাব ফুটিয়া উঠিল। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে এই

যুগে ফিউড্যাল ভূস্বামীবর্গের মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আত্মসমর্পণ, সত্যরক্ষা ও এতৎসদৃশ ভাব-সমূহের যথেষ্ট বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

এই সকল দায়, কর্ত্তব্য ও মনোভাব ক্রমশঃ বিধি-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ফিউড্যাল ভূস্বামীর নিকট হইতে তাঁহার উপরিতন ভূস্বামী কি কি সাহায্য পাইবার অধিকারী; নিম্নতন ভূস্বামীই বা তৎপরিবর্ত্তে কিরূপ সাহায্য দাবী করিতে পারেন; নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে কোন্ স্থলে অর্থ সাহায্য করিতে বাধ্য, কোন্ স্থলেই বা সামরিক সাহায্য করিতে বাধ্য; উচ্চাধিকারী যখন নিম্নাধিকারীর নিকট মূল সর্ত্তের অতিরিক্ত সাহায্য চান, তখন কি কি আকারে তাঁহার সম্মতি লইবেন—এই সমস্ত বিষয় ফিউড্যালিজম্ আইনে বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিল একথা সকলেই জানেন। এইরূপে এমন একটা ফিউড্যাল্ ব্যবহার-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল যাহার সাহায্যে উচ্চাধিকারী তাঁহার অধীনস্থ ভূস্বামীবর্গের মধ্যে দাবীদাওয়া লইয়া সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেন। এইরূপে বড় বড় ভূস্বামীগণ প্রত্যেকে তাঁহার অধীনস্থ ভূস্বামীবর্গের সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে পার্লামেণ্ট বা মন্ত্রণাসভার আহ্বান করিতেন। এক কথায় রাজনীতি আইন ও যুদ্ধব্যাপার সম্পর্কিত এমন কতকগুলি উপায় ছিল যাহার সাহায্যে ফিউড্যাল্ সম্বন্ধগুলিকে সুসম্বদ্ধবিধি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু এই সমস্ত বিধি অধিকার ও প্রতিষ্ঠানের কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না, তাহাদের স্থিতির কোন স্থিরতা ছিল না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্থিতির স্থিরতা আসে কোথা হইতে? যদি সমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত এমন একটা ঐশ্বর্য্যশালী শক্তি জাগিয়া থাকে যে সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিকে বিধিনিয়ন্ত্রিত করিতে সাধারণের অধিকার ও সাধারণের স্বার্থ মানিয়া চলিবার জন্য বাধ্য করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ, তবেই সে সমাজের বিধিব্যবস্থার স্থিতির একটা স্থিরতা থাকে।

সমাজের কেন্দ্রে এই শক্তি প্রতিষ্ঠা কেবল দুইটি উপায়ে হইতে পারে। হয় এমন একজন ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিবিশেষ থাকা চাই যাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি এত প্রবল যে অন্য কোন ব্যক্তিই তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না, সে শক্তি আসরে নামিলে সমাজান্তবর্ত্তী অন্য সকল শক্তিই তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে; অথবা জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা ও সম্মিলিত শক্তি হইতে উদ্ভূত এমন একটা সাধারণ সমাজ-শক্তি থাকা আবশ্যক, যাহা সমাজস্থ প্রত্যেক খণ্ড শক্তিকে শাসনে রাখিতে পারে এবং যাহা সকলের নিকট সমানভাবে সম্মানিত হয়।

লোকস্থিতির এই দুই উপায়;—হয় একেশ্বরতন্ত্র নয় জনতন্ত্র। বিভিন্ন শাসনপদ্ধতি আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন সকল পদ্ধতিই হয় একটির না হয় অপরটির অন্তর্গত।

ফিউড্যাল পদ্ধতিতে কিন্তু এ উভয়ের কোনটিরই স্থান নাই।

অবশ্য ফিউড্যাল্ ভূস্বামীগণ সকলেই সমান পর্য্যায়ের ছিলেন না। তাঁহাদেরও

মধ্যে অনেকে এমন ক্ষমতাশালী ছিলেন যে দুর্ব্বলতর ভূস্বামীর উপর অত্যাচার করিতে পারিতেন। কিন্তু সকল ভূস্বামীর ঊর্দ্ধতন ভূস্বামী যে রাজা তাঁহাকে গুদ্ধ ধরিলেও তাঁহাদের মধ্যে এমন ক্ষমতাশালী কেহই ছিলেন না যিনি অন্যান্য সকল ভূস্বামীর উপর আইন জারী করিতে বা তাঁহাদিগকে বাধ্য করিতে সমর্থ ছিলেন। শক্তি প্রয়োগের যে সমস্ত স্থায়ী উপাদান ও উপকরণ ফিউড্যাল্ সমাজে তাহা ছিল না। স্থায়ী সেনা ছিল না, স্থায়ী কর ছিল না, স্থায়ী ধর্ম্মাধিকরণ ছিল না। যখন আবশ্যক হইত তখন সামাজিক শক্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইত। প্রত্যেক বিচারের জন্য নূতন করিয়া ধর্ম্মাধিকরণ গড়িতে হইত, প্রত্যেক যুদ্ধের সময় নূতন করিয়া সেনা গড়িয়া লইতে হইত, অর্থ আবশ্যক হইলেই নূতন করিয়া কর বসাইতে হইত। সমস্তই ছিল সাময়িক, আকস্মিক, বিশেষ ব্যবস্থা। একটা স্থায়ী, স্বাধীন কেন্দ্রবর্ত্তী শাসন ব্যবস্থার কোন উপকরণ ছিল না। ইহা সুস্পষ্ট যে এরূপ অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে আধিপত্য লাভ করা ও সমাজে শৃঙ্খলা ও শক্তি স্থাপন করা অসম্ভব ছিল। এদিকে দমন ও শাসন যে পরিমাণে কঠিন, বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ সেই পরিমাণে সহজ ছিল। নিজের দুর্গমধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারই মত সমপদস্থ ভূস্বামীবর্গের সহজলভ্য সহযোগিতায় যে কোন নিম্নতম ভূস্বামী অতি সহজেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন।

অতএব দেখা গেল যে সমাজস্থিতির প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ যাহাতে এক পরাক্রান্ত শক্তির দ্বারা সমাজ শাসিত ও সংরক্ষিত হয়—তাহা ফিউড্যাল সমাজে সম্ভব ছিল না।

আবার ওদিকে জনতন্ত্র পদ্ধতির উদ্ভবও ফিউড্যাল সমাজে সম্ভব ছিল না। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। এখনকার কালে আমরা যখন রাষ্ট্রশক্তির কথা বলি, রাষ্ট্রপতির অধিকারের কথা বলি, আইন জারী করিবার, কর বসাইবার, দণ্ড দিবার অধিকারের কথা তুলি তখন আমরা জানি যে এ অধিকার কোন ব্যক্তি বিশেষের একান্ত নিজস্ব নহে, আমরা জানি যে নিজের জন্য নিজের নামে অন্যকে দণ্ডদিবার, অন্যের উপর আইন জারী করিবার অধিকার কাহারও নাই। এসমস্ত অধিকার সমষ্টিভাবে সমগ্র সমাজের নিজস্ব; সমাজের নামেই এসমস্ত অধিকার প্রযুক্ত হয়, সমাজ আবার এসমস্ত অধিকার নিজের কাছ হইতে পায় নাই, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকট পাইয়াছে। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ এইরূপ অধিকারসম্পন্ন কোন শাসন শক্তির সম্মুখীন হয় তখন তাহার মনের মধ্যে এই ভাবটি অজ্ঞাতসারে জাগিতে থাকে যে সে এমন একটা সার্ব্বজনীন ন্যায্য অধিকারসম্পন্ন শক্তির সম্মুখে আসিয়াছে, যে দৈব-অধিকারের জোরে তাহার উপর আদেশ চালাইতেছে। এইরূপে তাহার মন পূর্ব্ব হইতেই নত হইয়া থাকে। কিন্তু ফিউড্যাল্ সমাজে একেবারে অন্যরূপ ব্যাপার। ভূস্বামী নিজের এলাকার মধ্যে সমস্ত রাজ ক্ষমতার অধিকারী, এসমস্ত অধিকার তাঁহার ভূসম্পত্তির অংশ স্বরূপ, তাঁহার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। এখন যে সকল অধিকার রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অধিকার বলিয়া গণ্য হয়, তখন সেগুলি ছিল ব্যক্তিগত অধিকার। এখন যেসকল ক্ষমতা সমাজের বা রাষ্ট্রের, তখন সেগুলি ছিল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির স্বত্বগত। ভূস্বামী যখন স্বীয় মহালে স্বনামে রাজ ক্ষমতা পরিচালন করিয়া, মাঝে

মাঝে উৰ্দ্ধতন ভূস্বামীর সম্মুখে পার্লামেন্টে উপস্থিত হইতেন, তখন সেখানেও তিনি লোক সমষ্টির সম্মিলিত শক্তির কোন পরিচয় পাইতেন না ; সে সব পার্লামেন্ট অল্প কয়েকটি লোক লইয়া গঠিত, তাহারাও আবার তাঁহার সমান পদস্থ ব্যক্তি, তাঁহারাও স্ব স্ব এলাকার মধ্যে তাঁহারই মত রাজশক্তিসম্পন্ন, রাজাধিকারভোগী। দেশের রাজকীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে সে এমন কিছু গৌরব বা মহিমা সার্ব্বজনীনতা দেখিতনা যাহাতে তাহার শ্রদ্ধা উদ্রেক করিতে পারে। সুতরাং সরকারী ব্যবস্থা মনোমত না হইলেই, সে তাহা মানিতে অস্বীকার করিত এবং বিদ্রোহ করিয়া উঠিত।

ফিউড্যাল্ তন্ত্রে বাহুবল দ্বারাই অধিকার বজায় রাখিতে হইত। যাহার যে অধিকার আছে তাহাকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য, লোক সমাজে তাহাকে প্রতিষ্ঠান দিবার জন্য, সে কেবলই বাহুবল অবলম্বন করিত। সমাজের কোন প্রতিষ্ঠানই কিন্তু এউপায়ে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না। এবং একথাটা সকলে বুঝিত বলিয়াই কেহ কখনও স্বাধিকার সমর্থনের জন্য বিধি প্রতিষ্ঠানের দোহাই দিত না। যদি উৰ্দ্ধতন ভূস্বামীর বিচারালয় ও নিম্নতন ভূস্বামীদের পার্লামেন্টের কোন যথার্থ প্রভাব থাকিত তাহা হইলে ইতিহাসে আরও বেশী করিয়া তাহাদেব উল্লেখ দেখিতে পাইতাম, তাহাদিগকে আরও ক্রিয়াশীল দেখিতে পাইতাম। তাহাদের বিরলতাই তাহাদের অক্ষমতার প্রমাণ।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ পূর্ব্ববর্ণিত কারণ ছাড়াও ইহার আর একটা গভীর ও প্রবল কারণ আছে। সর্ব্বপ্রকার শাসন পদ্ধতির মধ্যে ফেডারেশন্ পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ঘট। ইহা গড়িয়া তুলিতেও কষ্ট, ইহাকে প্রাধান্য দেওয়াও শক্ত। এব্যবস্থায় প্রত্যেক খণ্ড প্রদেশ ও খণ্ড সমাজকে সমস্ত স্থানীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ শাসনাধিকার দেওয়া হয় ; কেবল সমগ্রদেশের বৃহৎ সাধারণ সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য যেটুকু দরকার সেই পরিমাণ শাসনাধিকার স্থানীয় কেন্দ্রগুলিব হাত হইতে সরাইয়া লইয়া সমগ্র রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে লইয়া গিয়া একটী কেন্দ্র শাসনতন্ত্র গড়িয়া তোলা হয়। নৈয়ায়িক হিসাবে এ ব্যবস্থার মত সরল ব্যবস্থা আর কিছুই নাই ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার ন্যায় জটীল পদ্ধতি আর কিছুই নাই। স্থানীয় কেন্দ্রগুলির স্বাধীনতা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিমাণে সমগ্র সমাজের কল্যাণের খাতিরে খর্ব্ব করিয়া সাধারণ কেন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমাজে সভ্যতার অবস্থা খুব উন্নত থাকা আবশ্যক। এ পদ্ধতিতে মানুষকে বাধ্য করিবার ক্ষমতা, জোর করিয়া চালাইবার ক্ষমতা অন্যান্য শাসন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক অল্প, সুতরাং এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য, ইহার বিধান মানিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিব স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতি থাকা আবশ্যক।

অতএব ফেডারেশন্-পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইলে সমাজে বিচার বুদ্ধি, ধর্ম্মবোধ ও সভ্যতার বিশেষ উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক। অথচ ফিউড্যালিজম্ এই ফেডারেশন্ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী এক বিরাট ফিউড্যাল সমাজের আদর্শ, ফেডারেশনেরই আদর্শ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফেডারেশন্ যে মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহারও অবলম্বন সেই নীতি। ফিউড্যালিজম্ চাহিয়াছিলেন যে প্রত্যেক

ভূস্বামী তাঁহার এলাকার মধ্যে যতদূর সম্ভব শাসনাধিকার প্রয়োগ করিবেন, এবং ইহাতেও শাসন কার্য্যের যে টুকু অবশিষ্ট থাকিবে, সেইটুকু মাত্র হয় ঊর্দ্ধতন ভূস্বামীর হাতে, না হয় বেরণ দিগের একটী সাধারণ সম্মিলনীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। কেন্দ্রাধিপত্তির এটুকু ক্ষমতাও আবার বিশেষ অনিবার্য্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হইবে। ফিউড্যাল্ যুগের অজ্ঞান, পাশবতা ও দুর্নীতির মধ্যে এরূপ একটা শাসনতন্ত্র গড়িয়া তোলা যে অসম্ভব তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতেছেন। যাহাদের উপর এই বিধির প্রয়োগ হইবে তাহাদের ধারণা, তাহাদের আচার ব্যবহার যে কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের প্রতিকূল। সুতরাং শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা আনিবার জন্য যে সব চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা যে ব্যর্থ হইয়া গেল ইহাতে কে বিস্মিত হইতে পারে?

আমরা ফিউড্যাল সমাজকে প্রথমে ইহার সরল মৌলিক মূর্ত্তিতে, পরে ইহার বিরাট সমগ্র মূর্ত্তিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম। এই দুইদিক দিয়া আমরা দেখিলাম ইহার প্রকৃতি কিরূপ, ইহার ক্রিয়াই বা কিরূপ, এবং সভ্যতার গতিনিয়তির উপর ইহার প্রভাব বা কিরূপ। আমার মনে হয় আমাদের আলোচনার ফলে দুইটি সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে :—

প্রথমতঃ, ফেডারেশনের আদর্শ মানুষের আত্মার বিকাশে, ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। মানুষের মনে নূতন নূতন তত্ত্বের উন্মেষ হইয়াছে, নূতন নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, নৈতিক বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং চরিত্র ও প্রেম নব নব সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সমাজের দিকে দেখিতে গেলে, ফিউড্যালিজ্‌ম্ কোন স্থায়ী বিচার-তন্ত্র বা শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। অবশ্য বর্ব্বর আক্রমণের ফলে প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর পুনর্গঠন যুগে ফিউড্যালিজ্‌ম্ অপেক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিস্তৃত সমাজ গড়িয়া উঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ফিউড্যালিজ্‌মের মূলগত দোষে এ সমাজ নিজকে বাড়াইতেও পারিল না, নিয়ন্ত্রিত করিতেও পারিল না; রাজনৈতিক অধিকারই ফিউড্যালিজ্‌ম্ প্রয়োগ করিতে শিখাইল। সে প্রতিরোধও আবার বৈধ প্রতিরোধ নহে; বিধিবিধানপক্ষে বিদ্রোহের প্রতিরোধ। সমাজে ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির উপর সাধারণের ইচ্ছাশক্তিকে জয়ী করিয়া তোলা, ব্যক্তিগত প্রতিরোধ প্রতিহিংসার স্থলে আইন সম্মত বৈধ প্রতিরোধের প্রবর্ত্তন করা—ইহাতেই সমাজের উন্নতি বুঝা যায়। ইহাই সমাজ ব্যবস্থার মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রধান সার্থকতা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খুব প্রশ্রয় দাও; যখন তাহার পদস্খলন হইবে তখন সমাজের সম্মিলিত বিচার বুদ্ধির কাছে তাহার বিচার হউক; ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে কতখানি খর্ব্ব করিয়া দিতে হইবে সমাজই তাহার বিচার করিয়া দিক্। ইহারই নাম বৈধ ব্যবস্থা, ইহারই নাম বৈধ প্রতিরোধ। ফিউড্যাল সমাজে এ প্রকার কিছুই ছিলনা। ফিউড্যাল্ ভূস্বামীরা যে প্রতিরোধ পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন তাহা ব্যক্তিগত প্রতিরোধ; তাহার অবলম্বন আইন নহে, সমাজের বিচার বুদ্ধি নহে, নিজের বাহুবল। এ প্রতিরোধের

মূলনীতি সমাজবিধ্বংসী নীতি। তথাপি মানব প্রকৃতি হইতে এ নীতি সমূলে উৎপাটিত হউক ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ বাধা দিবার অধিকার বর্জ্জন করিলে অনেক সময় দাসত্বই বরণ করিয়া লইতে হয়। রোমীয় সমাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিরোধ প্রবৃত্তি মানুষের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল এবং মাথা তুলিতে পারে নাই। খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে যে এ প্রবৃত্তির পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর ছিল, আমার ত এরূপ মনে হয় না। ইউরোপীয় চরিত্রে এই নীতির পুনঃ প্রবেশের জন্য ফিউড্যালিজ্‌মের নিকটই আমরা ঋণী। সভ্যতার গর্ব্ব যে সে এ নীতিকে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রয়োজন করিয়া রাখিয়া দেয়, ফিউড্যালিজ্‌মের গর্ব্ব যে সে সদাসর্ব্বদা এই কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছে ও মানিয়া আসিয়াছে।

ফিউড্যাল সমাজের মোটামুটি সাধারণ বিচারের দ্বারা, ইতিহাসের ঘটনাবলীর সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়াই আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটি পাইলাম। এখন যদি ঘটনার দিকে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিব আমরা যুক্তি দ্বারা যাহা অনুমান করিয়াছি, ইতিহাসও তাহাই দেখাইতেছে। ফিউড্যালিজ্‌মের ইতিহাস, তাহার ভাগ্য-বিবর্ত্তন, তাহার প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিয়াছে। ফিউড্যালিজ্‌মের মূল প্রকৃতি হইতে যে সকল অনুমান ও সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, সে সকলগুলিই ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়।

দশম ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফিউড্যালিজ্‌মের সাধারণ ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া দেখুন, ভাবরস, চরিত্র ও তত্ত্ববিকাশের অনুকূলে ফিউড্যালিজ্‌ম্ যে ঐ সময়ে কত বড় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য না করা অসম্ভব। এই যুগের ইতিহাস খুলিলেই মহৎ ভাব, মহৎ কীর্ত্তি, বিকশিত মনুষ্যত্বের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন চোখে পড়িয়া যায়। সেগুলি অবশ্য ফিউড্যাল্ আচারব্যবহার রীতিনীতির ক্রোড়েই পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। শিভাল্‌রী বা "বীরধর্ম্ম" এবং ফিউড্যালিজ্‌ম্ অবশ্য এক জিনিষ নহে; এক না হউক, কিন্তু শিভালরী যে ফিউড্যালিজ্‌মের কন্যা ইহা কে অস্বীকার করিবে? ফিউড্যালিজ্‌ম্ হইতেই এই উদার ও মহৎ ভাব সমন্বিত আদর্শের উদ্ভব। সন্তানকে ধরিয়া বিচার করিলে জনকের মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আর একদিকে দৃষ্টিপাত করুন। বর্ব্বরতার অন্ধকূপ হইতে বাহির হইয়া ইউরোপীয় কল্পনার প্রথম উন্মেষ, কাব্য সাহিত্য রচনার প্রথম চেষ্টা, অতীন্দ্রিয়রসের প্রথম আস্বাদ—এ সমস্তই ফিউড্যালিজ্‌মের ডানার আড়ালে, ফিউড্যাল দুর্গের অন্তঃপুরে জন্মলাভ করে। মানবতার এমন বিকাশ ঘটিতে হইলে মানবাত্মার আলোড়ন চাই, মানবজীবনে একটা সচলতা আসা চাই, অবকাশ চাই, আরও কত কি চাই, যাহা সাধারণ জনসমাজের শ্রান্তিক্লান্তিময়, অবসাদগ্রস্ত কঠোর কঠিন জীবনযাত্রার মধ্যে দুর্ল্লভ। ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, জার্ম্মাণীতে, ফিউড্যাল-যুগের সহিতই ইউরোপের প্রথম সাহিত্য কলা সৃষ্টির স্মৃতি বিজড়িত।

এদিকে আবার যদি ফিউড্যালিজ্‌মের সামাজিক প্রভাবের বিষয়ে ইতিহাসকে প্রশ্ন করি, এক্ষেত্রেও ইতিহাস আমাদের অনুমানগুলিকে সমর্থন করিবে। ইতিহাস

বলিবে, ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ সামাজিক শৃঙ্খলারও শত্রু, সামাজিক স্বাধীনতারও শত্রু। যেদিক দিয়াই সমাজের উন্নতির ইতিহাস বিচার করিবেন সর্ব্বত্রই দেখিবেন ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ কেবল বাধা দিতেছে। সেই জন্যই সে দুই প্রচণ্ড শক্তির প্রেরণায় সমাজে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার আদর্শ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ফিউড্যাল-যুগের আরম্ভ হইতেই তাহারা অনবরত ফিউড্যালিজ্‌মের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটা বিধিবদ্ধ ব্যাপক সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে; ইংলণ্ডে প্রথম উইলিয়াম ও তাঁহার পুত্রগণ এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ফ্রান্সে সঁা লুই চেষ্টা করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীতে একাধিক সম্রাট এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। ফিউড্যালিজ্‌মের স্বভাবই শৃঙ্খলা ও বিধিবিধানের প্রতিকূল। আজকাল কোন কোন বুদ্ধিমান লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ফিউড্যাল সমাজ বেশ একটা বিধিবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত উন্নতিশীল সমাজ; তাঁহারা ফিউড্যাল যুগকে একটা স্বর্ণযুগ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে যদি প্রশ্ন করা যায় ঠিক কোন্‌ স্থানে কোন্‌ সময়ে এই ফিউড্যালিজ্‌মের এই কল্পিতরূপ বাস্তব আকার লাভ করিয়াছিল, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তর দিতে পারিবেন না। তাঁহাদের কল্পিত ভূস্বর্গের সন তারিখ নির্দ্দেশ করা যায় না; অতীতের ইতিহাস খুঁজিয়া এ নাটকের রঙ্গমঞ্চও পাওয়া যায় না, অভিনেতাও পাওয়া যায় না। তাঁহাদের এই প্রাপ্ত ধারণার কারণ সহজেই পাওয়া যায়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা বিনা অভিসম্পাতে ফিউড্যালিজ্‌মের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না, তাঁহাদেরও ভ্রমের কারণ বুঝিতে পারা যায়। ফিউড্যালিজ্‌মের যে দুইটি বিভিন্নরূপ আছে তাহা অনুকূল-প্রতিকূল কোন পথই ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই। একদিকে ব্যক্তিমানবের উপর মানুষের চিন্তা, চরিত্র ও প্রবৃত্তির উপর ফিউড্যালিজ্‌মের যে প্রভাব, অপর দিকে সমষ্টিমানবের উপর, মানুষের সামাজিক অবস্থার উপর ফিউড্যালিজ্‌মের প্রভাব—এই দুইটা দিক তাঁহারা পৃথক করিয়া দেখেন নাই। এক পক্ষ মানিতে চান না যে, যে সমাজের মধ্যে এতগুলি সদ্ভাব ও সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটিয়াছিল, যে সমাজের মধ্য হইতে আধুনিক ইউরোপের সমস্ত সাহিত্যের জন্ম হইল, যে সমাজে আচারব্যবহার ও রীতিনীতি এমন একটা উন্নত আদর্শ লাভ করিল, তাঁহারা জানিতে চান না যে, সে সমাজের ব্যবস্থা বা গঠন নীতির কোনই গুণ ছিল না। এদিকে আবার ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ সাধারণ জনসমাজের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করিয়াছে, সমাজে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা স্থাপনের বিরুদ্ধে সে যে সকল বাধা উপস্থিত করিয়াছে, অপর পক্ষ কেবল তাহাই দেখিতেছেন। সুতরাং ইঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, এমন সমাজ ব্যবস্থার ফলে সুন্দর চরিত্র বা সদ্‌গুণের বিকাশ হইতে পারে। সভ্যতার মধ্যে যে দুইটি বিভিন্ন স্রোত চলিতেছে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য দুইটি স্রোত যে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে চলিতে পারে, একথাটা উভয়পক্ষই বুঝেন নাই।

এখন দেখা গেল তত্ত্ববিচার করিয়া ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ ও তাহার ফল সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলাম, ইতিহাস তাহা সমর্থন করে। রোম-শাসিত জগৎ যাহারা জয় করিয়া লইল,

ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত সত্বার প্রবল উদ্যম—ইহাই তাহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ; সুতরাং তাহারা যে সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল তাহাতে সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি ঘটিল। কোন একটা সামাজিক ব্যবস্থা নূতন প্রবর্ত্তন করিবার সময় মানুষ নিজের অন্তঃপ্রকৃতিসম্ভূত যে সমস্ত ভাব, চিন্তা ও গুণরাশি লইয়া প্রবেশ করে, সমাজ ব্যবস্থার উপর সেগুলির প্রভাব নিতান্ত কম নহে। আবার মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির উপর সমাজ ব্যবস্থারও একটা প্রতিক্রিয়া হয় এবং তাহার ফলে ঐ স্বাভাবিক ভাবচিন্তা ও গুণরাশি আরও পরিপুষ্ট হয়। জার্ম্মাণ সমাজে ব্যক্তিরই প্রাধান্য ছিল, সুতরাং জার্ম্মাণ সমাজের সন্তানস্বরূপ সে ফিউড্যাল সমাজ তাহার প্রভাব ব্যক্তিত্ব পরিপোষণেরই অনুকূল হইল। সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ ও উপাদানের মধ্যেও এই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যাইবে ; তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিশিষ্ট ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ; তাহাদের গতি ও প্রভাব তাহাদের মূল প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চর্চ্চের ইতিহাস এবং ইউরোপীয় সভ্যতার উপর চর্চ্চের প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এই ব্যাপারের আর একটা বড় দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব।

(* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

সেকালের রাইয়ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার ফ্রান্সের কথা। সেখানে বাবুরা অতি কঠোর ভাবে শুষিতে সুরু করিয়াছিল। চাষীরা এই সকল দেয় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নিজ নিজ জমির কিছু অংশ বাবুকে দিয়া দেওয়াই নিরাপদ বিবেচনা করিত। বাবুরা এই ধরণের জমি পাইলেই খুশীও হইত।

জমিদারেরা একটা ফন্দিও বাহির করিয়াছিল। চাষীরা জমিদারকে কোনো জমিদান করিবার পূর্ব্বে পল্লী পঞ্চায়তের মতামত লইতে বাধ্য থাকিত। জমিদারেরা পল্লীর কয়েকজন লোককে নানা কৌশলে নিজ মতলব মাফিক মত দেওয়াইবার ফিকিরে থাকিত। এই অবস্থায় রাজশক্তি জমিদারদের ঘুশ এবং অন্যান্য প্রভাব হইতে রাইয়তদিগকে কিছু বাঁচাইবার আয়োজন করে। আইন জারি করা হয় যে পল্লীর সকল নরনারী পঞ্চায়তে একমত না হইলে কোনো জমিদান অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

এক ফন্দিবাজির জোরেই জমিদারেরা রাইয়তদের জমি নিজ ভোগে আনিত, এমন নয়। খোলাখুলি নিষ্ঠুর লুটনীতিও প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে "বুর্জোয়া" শ্রেণীর শিল্প-

বাণিজ্যের ধনদৌলতওয়ালা অভিজাত সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল। পল্লী সমবায়ের চৌথ জমিজমার উপর ইহাদের লোভ ছিল ঠিক বাবুদের মতনই।

সহরগুলা বিস্তৃত হইতেছিল। লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষ আবাদের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলা ছিল সহরে ধনীদের স্বার্থ। সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে চাষ চালাইবার সুযোগ ঢুঁড়িতে গিয়া "বুর্জোআ"রা রাজশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছিল। "পড়ো" জমিগুলা যাহাতে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয় সেই দিকে নজর রাখিয়া সরকার আইন জারি করিতে অভ্যস্ত হয়। এই ধরণের আইনের জোরে "পড়ো" জমির ওজরে "বুর্জোআ"রা পল্লী স্বরাজের চৌথ জমিগুলা দখল করিয়া বসিল। কিষাণরা এই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। কিন্তু সরকারী পল্টন বুর্জোআদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য মোতায়েন থাকিত।

অসংখ্য অছিলায়ই কিষাণরা তাহাদের জমিজমা হাতছাড়া করিতে বাধ্য হইয়াছে। জমিদারদের জুয়াচুরির অন্ত ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিদাররা বলিত যে রাইয়তের পাট্টার সঙ্গে তাহার জমি খাপ খায় না। একথা অবশ্য ঠিক—কেননা পাট্টা হিসাবে কিষাণরা বাবুদের পুরাপুরি গোলাম ছিল না অথবা বাবুদের মাফিমোফিক সেলামই করে বাধ্য ছিল না। রাইয়তরা নিজ নিজ জমিজমার স্বত্ব সম্বন্ধে পাকা প্রমাণ উপস্থিত করিতে বাধ্য থাকিত। যাহাদের কবুলিয়তে কিছু গলদ বাহির হইত তাহারা সেই অনুসারে জমি দণ্ড ভোগ করিত।

কোনো কোনো সময় জমিদাররা রাইয়তদের দলিল পত্রগুলা হাত করিবার পর সেইসব নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিত। তাহার পর রাইয়তদের পক্ষে ত নিজ জমির দখল স্বত্ব স্বপ্রমাণ করা সম্ভবপর হইত না। প্রমাণিত হইত যে তাহারা বে-আইনি ভাবে জমি ভোগ করিতেছে অর্থাৎ জমিটার আইনতঃ কোনো মালিক নাই। কিন্তু ফিউদযুগে নীতি ছিল:— "প্রভুহীন জমিন থাকিতেই পারে না" ("পা দ ত্যোয়ার সাঁ সেইঞ্যর")। অতএব "বে-আইনি ভাবে" যে সকল জমি রাইয়তরা ভোগ করিতেছিল সে সব বাবুদের তাঁবে আসিতে বাধ্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে জমিদাররা রাইয়তদের দলিল ধ্বংস করিয়া তাহাদিগের জমিজমা বে-আইনি প্রচারিত করিয়াছিল। বাবুদিগকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল ১৭৮৯ সালের বিপ্লবে। কিষাণরা ক্ষেপিয়া জমিদারদের কাগজপত্রগুলার উপর "ওতো দা ফে" চালাইয়াছিল। অর্থাৎ খাতাপত্র ইত্যাদি যা কিছুর জোরে বাবুরা প্রজাদের উপর কর্ত্তামি করিত সবই আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার নাম প্রতিহিংসা।

বনভূমিগুলা লুটিয়া লওয়া হইয়াছিল আরও নৃশংস ভাবে। বাদবিচার না করিয়া বাবুরা এই সব জমি দখল করিয়া ফেলে। বাজে লোককে সেখানে শীকারের এক্তিয়ার দেওয়া বন্ধ করা হয়। এমন কি জ্বালানি কাঠ কুড়াইতে আসা, ঘরবাড়ী, ব্যাড়া, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মেরামত করিবার মতন কাঠ কাটিয়া লইয়া যাওয়া ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ হইয়া যায়। বনভূমিগুলা সবই ছিল কিষাণদের চৌথ সম্পত্তি। বাবুরা এই সব ঘেরিয়া লওয়া মাত্র দেশে মহা কিষাণ বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গণ্ডা গণ্ডা "জ্যাকারি" বা কিষাণ-দাঙ্গা ঘটিয়াছিল। ফরাসী-বাবুরা রাইয়তদিগকে "জ্যাক বনম" অপমান সূচক নামে ডাকিত। এই কারণে কিষাণদের বিদ্রোহকে জ্যাকারি বলে। জমিদাররা রাইয়তদিগকে বনভূমিতে শীকার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। অধিকন্তু দরিয়ার মাছ ধরা এবং বনের অন্যান্য সম্পদ ভোগ করার এক্তিয়ার হারাইতে বাধ্য হইয়া "জ্যাক বনম" নামক ফরাসী 'ছোট লোক'গুলা বাবুদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিতে ঝুঁকিয়াছিল।

ফ্রান্সের উত্তর এবং মধ্য প্রদেশে কিষাণ-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল অনেক। জার্ম্মাণীতেও স্যাক্সনরা সম্রাট দ্বিতীয় হেন্‌রির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া ছিল। দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সুআবিয়ান জার্ম্মাণরাও ধর্ম্মসংস্কারক লুথারের জীবিতকালে বিদ্রোহী হয়। বনভূমির অধিকারে বঞ্চিত হওয়া এই সকল কিষাণ-বিদ্রোহের কারণ।

এই সকল দাঙ্গার ফলে বাবুরা রাইয়তদিগকে কখনো কখনো তাহাদের পুরাণা অধিকার ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইত। কিষাণরা বন হইতে কাঠ আনিতে পারিত ও মাঠে জানোয়ার চরাইতে পারিত। যে মাস ছাড়া অন্যান্য মাস ভরিয়া তাহাদিগকে এই সকল অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হইত।

বন আর মাঠের অধিকার ছিল কিষাণদেব মজ্জাগত। কিষাণরা এই সকল ভোগ করিতে গিয়া ন্যায়ের মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেও তাহাদিগকে এই সব হইতে বঞ্চিত করা সম্ভবপর ছিল না। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে লা পোআ দ ফ্রেমিনহ্বিল বলিতেছেন :—"বন মাঠ ভোগ করা কিষাণদের বাপদাদাদের আমল হইতে সনাতন রীতি হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। যে সব লোক এখনও জন্মে নাই তাহাদেরও এই অধিকার রহিয়াছে।"

এই ছিল ফিউদপন্থী স্মার্ত্ত পণ্ডিতদেব মত। কিন্তু ১৭৮৯ সালের বিপ্লবী "বুর্জোআরা" স্মৃতি শাস্ত্র মাফিক কিষাণদের অধিকার বজায় রাখিতে রাজি ছিল না। জমিদারদের স্বার্থ পুষ্ট করিয়া কিষাণদিগকে অবনত কবা এই বিপ্লবের অন্যতম কাজ।

জমিদাররা মাঝে মাঝে রাইয়তদের চৌথ অধিকার স্বীকার করিত বটে, কিন্তু এইরূপ স্বীকার করা ছিল অনেকটা অনুগ্রহ করার সমান। ইহারা নিজেই যে বনভূমিগুলার খোদ মালিক এ সম্বন্ধে তাহাদের চিন্তার কোনো গোঁজামিল থাকিত না। পরবর্ত্তী কালে ঠিক এই ধরণেরই জমিদাররা নিজদিগকে রাইয়তদের সকল প্রকার জমিজমার মালিক বিবেচনা করিতে সুরু করিয়া ছিল।

এইখানে মধ্যযুগের কেত্তাটা একবার স্মরণে আনা আবশ্যক। কোনো পল্লীবাসী সে যুগে কোনো প্রতাপশালীর নিকট "বশ্যতা" স্বীকার করিবার সময় নিজ জমিন হইতে এক চাপ মাটি আনিয়া প্রভুর চরণ তলে রাখিয়া দিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিষাণ নিজেই যে নিজ জমির মালিক সে বিষয়ে কোনো তর্ক উঠিত না। বৃটানি ইত্যাদি কোনো কোনো প্রদেশে জমির উপরকার মাল—যথা শস্য, গাছগাছড়া, ঘরবাড়ী ইত্যাদি—সম্বন্ধে তাহারা রাইয়তদের মালিকত্ব স্বীকার করিয়া চলিত। কিন্তু আভ্যন্তৌম ধনসম্পদ অর্থাৎ জমির ভিতরকার যা কিছু সব বিষয়ে জমিদাররাই মালিক এই রীতি প্রচলিত ছিল। এই ধরণের

সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই বুর্জোআ আমলের জমিদারগণ তাহাদের রাইয়তদিগকে ভিটা মাটি উচ্ছন্ন করিয়া ছাড়িয়াছিল। মার্কস-বিবৃত সাদার্ল্যাণ্ডের ডাচেসের (বেগমের) লুট কাহিনী সেই নীতির চরম দৃষ্টান্ত।

১৭৮৯ সালের বিপ্লবে জমিজমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ম পাকাপাকি জারি হইয়া যায়। "নিজস্ব" প্রথা এইরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্রান্সে জমিদারের জমিজমা ও যৌথ সম্পত্তির বিধান অনুসারে কম বেশী পল্লীর প্রত্যেক লোকের ভোগে আসিত। শস্য কাটা হইবা মাত্র বাবুদের বনে ও মাঠে জনসাধারণের আনাগোনা অব্যাহত থাকিত। বাবুদের আঙুরের ক্ষেত্রে ও পল্লীবাসীরা আঙুর তোলা হইয়া যাইবার পর নিজ নিজ জানোয়ার চরাইত। কোন কোন জমিদার অবশ্য এইরূপ যৌথ ব্যবহার পছন্দ করিতনা। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের "সোসিয়েতে দেকোনোমি রুরাল আঁ ব্যর্ণ" (ব্যর্ণ জনপদের পল্লীসমাজ সমিতি) কর্ত্তৃক ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক রচনায় সেযুগের এক জমিদারের প্রতিবাদ দেখিতে পাই।

জমিদাররা যৌথ অধিকারের বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিত। এবিষয় কোনো সন্দেহ করা চলেনা। অধিকন্তু চাষ আবাদের উপর আঙুর গাছ লাগানো ইত্যাদি বিষয়েও পল্লীবৃদ্ধদের অনুশাসন অনুসারে জমিদারদিগকে কাজ করিতে হইত। মতেস্কিউ নামক সমাজতত্ত্ববিদের কিছু জমিদারি ছিল। ফরাসী বিপ্লবের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তীকালে এই বাবুকে পল্লীস্বরাজ বেশ একটু জব্দ করিতে পারিয়াছিল।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমলে একটা সনাতন পল্লীপন্থা বিধিবদ্ধ হয়। তাহার প্রভাবে জমিদাররা নিজ নিজ জমি চাষ করিতে সমর্থ থাকিলে অন্য কোনো লোক বাহাল করিয়া সেই কাজ সামালাইতে অধিকার পাইত না। ঠিক এই নিয়ম চালাইয়া পল্লীবাসীরা মতেস্কিউকে জনসাধারণের প্রতাপের নিকট মাথা নোয়াইতে বাধ্য করিয়াছিল।

বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগটাকে সাধারণ হিসাবে ফিউদ-যুগ ধরিয়া লওয়া চলে। এইযুগে জমিজমা বাস্তবিক পক্ষে কোনো লোকের হাতেই আসল স্বাধীন ছিল না। সম্পত্তি ছিল পরিবার-গত। প্রত্যেক পরিবারকে বাপদাদাদের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। আবার ভবিষ্য বংশধরগণের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলাও প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য থাকিত।

গির্জ্জা, দেবালয় ইত্যাদি মোহন্ত প্রতিষ্ঠান গুলা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জমিদারি সমূহও ঠিক এইরূপেই অতীত এবং ভবিষ্যতের বাঁধাবাঁধির ভিতর আত্মরক্ষা করিত। সাধুবাবাজী পুরোহিত সন্ন্যাসীরা ছিল জমিদারির অভিভাবক এবং তদবিরকারক মাত্র। অবশ্য বাবাজীরা বাটপার জোচ্চোর কম ছিলনা।

সরকারী খাজনা হইতে রেহাই পাইবার জন্য পুরোহিতরা প্রচার করিত যে দেবোত্তর গুলা মামুলি ধন দৌলত নয়। এসব কোনো মানুষের সম্পত্তি নয় ইত্যাদি। বিপ্লবের সময়কার বুর্জোআরা সয়তানে সয়তানে কোলাকুলি করিয়া বলিল "বহুত আচ্ছা সাধু বাবাজীরা গির্জ্জার মালিক নয়। ঠিক কথা। এইসব সম্পত্তির মালিক "এক্‌লেজিয়া" "এগ্‌লিজ" অর্থাৎ সঙ্ঘ।" তখন প্রশ্ন উঠিল "সঙ্ঘটা কে বা কি? জবাব :—"সকল

খৃষ্টান নরনারীর পরিষৎ অর্থাৎ গোটাদেশ। এই যুক্তি অনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তি গুলা সরকারী খাশ মহলে পরিণত হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবওয়ালারা বিলাতী অষ্টম হেন্‌রির মতন এই ধরণেই গির্জ্জাগুলা লুটিয়া দরিদ্রের ধনদৌলত নিজ নিজ পেটোআর ভিতর বাঁটিয়া দিয়াছিল।

ফিউদযুগের জমিদার রাইয়তদের দেনাপাওনা ছিল পারম্পরিক। তাহার বিধানে কিষাণদের উপকার ও হইত যথেষ্ট। কিন্তু বুর্জ্জোআ এবং তথাকথিত "লিবারল" (বা উদারপন্থী) ধনবিজ্ঞান-বিদেরা এই যৌথ সম্পত্তি-মূলক সমাজ পদ্ধতির চরম শত্রু। ইহারা পল্লীবাসীদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

বুর্জ্জোআ ঐতিহাসিকগণ লম্বাগলা করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে ফরাসী বিপ্লবের ফলে কিষাণরা জমি পাইয়াছে এবং সুখ ও স্বাধীনতা চাহিতে সমর্থ হইয়াছে। মিথ্যা কথা। কিষাণদিগকে পল্লীসমবায়ের জমিজমার উপর যৌথ অধিকার হইতে বঞ্চিত করাই এই বিপ্লবের অন্যতম কাজ। তাহা ছাড়া কিষাণরা ইহার প্রভাবে সুদখোর মহাজনদের খপ্পরে আসিয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু পুঁজিপতি যন্ত্রপাতিশীল জমিদার বাবুদের সঙ্গে "স্বাধীন ভাবে টক্কর দিতে বাধ্য থাকা ও ফরাসী বিপ্লবই কিষাণদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। সরকারকে খাজনা দেওয়া ত তাহার উপর আছেই। কিষাণরা চরম বিপদে প'ড়িয়াছে।

১৮৫৭ সালে ফ্রান্সে ৭,৮৪৬,০০০ জমির মালিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ভিতর ৩,৬০০,০০০ জনের অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহারা "প্রকাশ্য" খাজনা দিতে অসমর্থ। কৃষি কর্ম্মে উন্নতি বিধানের জন্য ফরাসী গবর্মেণ্ট পরবর্ত্তী কালে একটা সরকারী কৃষি-ঋণ তুলিয়া জমির মালিকদের ভিতর তাহা বাঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা করে। এই সূত্রে সকল জমিজমার আর্থিক অবস্থা পরিষ্কার রূপে আলোচনা করা হয়। ১৮৭৯ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখের "লা রেপ্যিব্লিক ফ্রাঁসেজ্" নামক দৈনিক কাগজে সম্পাদক গাঁবেত্তা লিখিয়াছিলেন—অধিকাংশের অবস্থাই দেউলিয়া। ধার লইয়া তাহা শুধিবার ক্ষমতা অনেক মালিকেরই নাই। অর্থাৎ প্রায় ৭৮॥০ লাখ জমির তথাকথিত মালিকের ভিতর মাত্র ২৮।০ লাখকে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করা হইয়াছিল।

ফিউদ যুগের চাষীরা অনেকটা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিত। ফরাসী বিপ্লবের নায়কস্থানীয় বুর্জ্জোআ ভদ্রলোকেরা একথা ভুলিয়া গিয়াছেন। বরং তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ জমিদারি প্রথাকে গালাগালি করিতেই অভ্যস্ত। সেকালের চাষীদের সঙ্গে বর্ত্তমান বুর্জ্জোআ যুগের ভূমি মজুরের আর্থিক ব্যবস্থা তুলনা করিলে বুর্জ্জোআ লেখকদের ভুলগুলা হাতে হাতে ধরা পড়িবে।

নর্মাণ্ডি প্রদেশের মজুর সমাজ বিষয়ক অনুসন্ধান গ্রন্থে দ'লিল বলিতেছেন "মজুরের ভাগ্যের সঙ্গে মনিবের ভাগ্য গ্রথিত ছিল। ফসলের পরিমাণের উপর বাবুর পাওনা নির্ভর করিত।" তুর অঞ্চলের সাঁ জুলিয়া মোহন্তরা রাইয়তদের নিকট হইতে পাইত ছয় ভাগের এক ভাগ। কোথাও কোথাও কর ছিল দশমাংশ মাত্র। বার ভাগের এক ভাগও কোনো কোনো অঞ্চলের রীতি। দক্ষিণ ফ্রান্সের নানা অঞ্চলেও এইরূপ ষষ্ঠাংশ

বা দ্বাদশাংশের নিয়ম প্রচলিত ছিল। বুর্জোআ আমলের কোনো জমিদার এই পরিমাণ পাইয়া সন্তুষ্ট হয় কি ?

মধ্যযুগে তার্ণ্-এ-গারোণ জেলায় মো আসাক প্রসিদ্ধ জীবনকেন্দ্র বিবেচিত হইত। লাগ্রেঞ্জ কোসা প্রণীত এতুদ ইস্তোরিক স্থির মোআপ্সাক মোআপ্সাক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে লেখক ১২১২ এবং ১২১৪ সালের দলিল উদ্ধৃত করিয়াছেন। জানা যায় যে, সেকালের মোহন্তরা রায়তদের নিকট হইতে ফসলের তৃতীয়, চতুর্থ এবং কোনো কোনো সময়ে দশমাংশ মাত্র পাইয়াই যথেষ্ট বিবেচনা করিত। লাগ্রেঞ্জ কোমার মতে মোহন্তরা রাইয়তদের সঙ্গে যে চুক্তি করিত তাহাকে খাজনা, কর ইত্যাদি বিষয়ক চুক্তি বলা চলে না। ইহাতে স্বাধীন ভাবে পরস্পর আলোচনা করিয়া জীবন ধারণের ব্যবস্থা করার পরিচয়ই পাওয়া যায়।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে নর্মাণ্ডির আঙ্গুরচাষীরা বাবুদের সঙ্গে আধাআধি বখরার নিয়মে আবাদ চালাইত। আজকালকার দিনে যে সকল দেশে আঙ্গুর চাষ চলিতেছে, সেখানকার চাষীরা আঙ্গুর চাখিয়া দেখিতে পর্য্যন্ত অধিকারী নয়।

সাঁ জার্ম্মা দে প্রে নামক প্যারিসের নিকটবর্ত্তী পল্লী মোহন্তদের আয়ের গেরার কর্ত্তৃক ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। নবম শতাব্দীতে শার্ল্যমেঞ এর আমলে কিষাণ রাইয়ত প্রজারা কিরূপ জীবন যাপন করিত এই খাতায় তাহার বিশদ বিবরণ পাই। মোহন্তদের জমিগুলা চষা হইত ব্যক্তিগত ভাবে নয়। বিশ ত্রিশ জন পৌর কিষাণ দলবদ্ধ ভাবে চাষ আবাদের দায়িত্ব লইত।

মাঠের জমি তিন প্রকার চাষীর ভিতর ভাগাভাগি ছিল। প্রথম শ্রেণীকে বলে "স্বাধীন" জমিন, দ্বিতীয়ের নাম "করদ", তৃতীয় "গোলাম" নামে অভিহিত। স্বাধীন চাষীরা মোহন্তদিগকে বৎসরে বিঘা প্রতি ১।৶ দিত; "করদ"রা দিত বিঘা প্রতি ২৲। "গোলাম" জমিনের চাষীদের নিকট হইতে মোহন্তরা পাইত বিঘা প্রতি ২॥০। অবশ্য টাকা দেওয়া হইত না। ফসল এবং পরিশ্রমের পরিমাণ দেখিয়া গেরার মুদ্রার হিসাবে রায়তদের দেয় কষিয়া দেখিয়াছেন।

এই মঠের জমিদারি বেশ সুবিস্তৃত ছিল। সপরিবারে চাষীদের সভ্য ছিল ১০০২৬। ইহাদের নাম দেখিয়া বোধ হয় অধিকাংশই জার্ম্মাণ। এতগুলা চাষী যখন এইরূপ সর্ত্তে আবাদ চালাইত, তখন সহজেই অনুমান করা চলে যে সে যুগে রাইয়তরা সাধারণতঃ এই ধরণের কড়ারেই অভ্যস্ত ছিল। মোটের উপর তাহাদের স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিতেছি,—উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোআ জমিদারদের রাইয়ত গিরি বর্জ্জন করিয়া কোন চাষী বিঘা প্রতি ২॥০ হিসাবে নবম শতাব্দী মোহন্তদের গোলাম জমিনের ইজারা লইতে অরাজি হইবে ?

বিলাতী মজুরদের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল ছিল। ঐতিহাসিক হালাম "মধ্য যুগের ইয়োরোপ" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন:—এডোয়ার্ড অথবা ষষ্ঠ হেনরির আমলের মজুর এবং চাষীরা আজকালকার চেয়ে বেশী সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিত। সেকালের

মূল্য তালিকার সঙ্গে একালের মূল্য তালিকা তুলনা করিলে অনেকেই এই ধরণের অসন্তোষ জনক মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

হালাম বিস্তৃত ভাবে জিনিষপত্রের দর আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। সার জন কুলুসের তথ্য অনুসারে হালাম বলিতেছেন, "চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শস্য কাটিতে আসিয়া চাষী ।০ আনা রোজ পাইত। এক সপ্তাহ খাটিলে সে এক কোয় গম কিনিতে পারিত কিন্তু আজকাল (১৭৮৪ সালে) সেই পরিমাণ গম কিনিতে হইলে চাষীর দশ বার দিনের রোজগার। আগে ষষ্ঠহেন্‌রির আমলে আধসের মাংসের দাম ছিল দেড় ফার্দিং। ভারতীয় দেড় পয়সা। মজুরা রোজ তিন পেনি বা ৵০ হিসাবে ছয় দিনের সপ্তাহে ১৷৵০ রোজগার করিত। এই টাকার অর্দ্ধেক খরচ করিলে সে এক বুশেল গম কিনিতে পারিত। অপর অর্দ্ধেকে সে পাইত ১২ সের মাংস।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পার্লামেণ্ট আইন করিয়া মজুরদের দৈনিক মজুরির হার ঠিক করিয়া দিয়াছে। ১৮০০ সালের মজুরবিধি অনুসারে শস্য কাটার জন্য মজুরেরা পাইত রোজ ৵০ (তিন আনা)। তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইত না। এই তিন আনা আজকালকার বাজারে ৩৸০ র সমান। ১৪৪৪ সালের বিধানে মজুরেরা শস্য কাটিতে আসিয়া পাইত ।৵০ আর ঘরামির কাজে মামুলি মজুরের প্রাপ্য ছিল ৵১০। সেকালের পাঁচ আনা হালামের সময়কার ৫৲ এবং সাড়ে তিন আনা ছিল ৩৷৹র সমান। ১৪৯৬ সালে শস্যকাটার মজুরী সাবেক হারেই ছিল। মামুলি মজুরির হার কথঞ্চিৎ বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

১৪৪৭ সালের আইনে মেষপালকের বার্ষিক মাহিয়ানা নির্দ্ধারিত হয় ১৮৲। হালাম এই বেতনকে নিজ সময়কার ৩০০৲র সমান বিবেচনা করেন। গৃহস্থালীর কাজের চাকর বাকর পাইত বৎসরে প্রায় ১৪৲। অধিকন্তু মাংস এবং মদ তাহারা গৃহস্থের নিকট দাবী করিতে পারিত। ১৪৯৬ সালের মজুর বিধানে এই সব হার কিছু কিছু বাড়ানো হইয়াছিল।

মজুরির হার সম্বন্ধে হালামের মত এই—"যে সকল অঙ্ক দেওয়া হইল সে সব আইনতঃ সর্ব্বোচ্চ। পার্লামেণ্ট সেই সময়কার প্রচলিত মজুরির হারের উচ্চতম অঙ্ক গ্রহণ করে নাই। বরং হারটা যথাসম্ভব নরম করিবার দিকেই গবর্মেণ্টের দৃষ্টি ছিল। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে মজুরেরা এই আইন নির্দ্দিষ্ট হারের চেয়ে উঁচু হারেই মজুরি ভোগ করিতেছিল। কম সে কম সেকালের পারিবারিক হিসাবপত্র দেখিলে এইরূপই মনে হইবে। কেন না সরকারী মজুরি-হারের সঙ্গে পারিবারিক খরচের হার মিলে না।"

সেকালে চাকরি পাওয়া বিলাতী সমাজে অনেকটা অনিশ্চিত ব্যাপার ছিল। কাজেই ইংরেজ মজুরদের পক্ষে জীবন ধারণের উপায়গুলা বড় একটা "হাতের পাঁচ" গোছের ছিল না। তাহার পর "আকাল" দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিও মাঝে মাঝে জনগণের কষ্টের কারণ হইত। একমাত্র জলবায়ু বরফ কুয়াসার সুখের উপরই এই দুর্য্যোগ বা অনটন নির্ভর করিত না। সেকালের ইংরাজেরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া "অন্ন ধ্বংস" করিতে অভ্যস্ত হয় নাই। বিশেষ করিয়া এই কারণেই যখন তখন মজুর সমাজে অন্নের অভাব ঘটিয়াছে।

মধ্যযুগের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিতে যাইয়া এই সকল তথ্য মনে রাখিতেই হইবে।

তাহা সত্ত্বেও হ্যালাম বলিতেছেন :—সেকালের দৈব দুর্যোগ এবং অন্যান্য অসুবিধা গুলা নজরে রাখিয়াও আমি বিশ্বাস করি যে আজকালকার মজুর তাহার তিনচারশ বৎসর পূর্ব্বেকার বাপদাদাদের চেয়ে পরিবার প্রতিপালন বিষয়ে কম সমর্থ। যন্ত্রপাতিনিয়ন্ত্রিত শিল্পের কল্যাণে অনেক জিনিষ মজুরেরা উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ সস্তায়ই পাইতেছে একথা অস্বীকার করা চলে না। তাহা সত্ত্বেও জীবন সংগ্রাম হিসাবে ইহাদের সামর্থ্য পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা অনেক নিচু।

১৭৮৯ সালে যখন ফরাসী বিপ্লব ঘটে তখনও জমিদারি প্রথা ফিউদ-যুগের যৌথ সম্পত্তিশীল সমাজের স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারেই কিছু কিছু নিয়ন্ত্রিত হইত। জমিজমা পুরাপুরি নিজস্বে পরিণত হয় নাই। কাজেই তখনও পল্লীবাসীরা এবং কিষাণরা হাভাতে হাঘরে হইতে বাধ্য হয় নাই। ফরাসী বিপ্লবের পর যে "বুর্জোআ" যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই যুগেই কিষাণদের দুর্গতি চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কারণ একালে যৌথ সম্পত্তির বিধান সমাজে আর নাই। জনগণ আজ "ব্যক্তি" এবং "স্বাধীন" জীব—অর্থাৎ পুঁজিপতিদের দ্বারা স্বাধীন ও যথেচ্ছভাবে শোষণের যোগ্য জানোয়ার ছাড়া রাইয়তরা আর বেশী কিছু নয়।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

হিন্দুর ধর্ম্মসাহিত্য।

(১)

ভারতবর্ষের ইতিহাস সুষ্ঠুরূপে জানিতে হইলে বিশেষ গবেষণাপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস জানা একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে সেই প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণের লিখিত গ্রন্থ চিরকালের জন্য ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয় হইয়া আছে। সংস্কৃত ভাষা বহু প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। এই ভাষার শব্দগুলির সংখ্যা গণনা করা সাধ্যাতীত; প্রথমতঃ মূল শব্দগুলির সংখ্যা খুব বেশী, তারপর শব্দগুলিতে প্রকৃতি প্রত্যয় বিভক্তি অথবা শব্দান্তর যোগ করিলে শব্দসম্পদ্ এত বৃদ্ধি পায় যে মনুষ্যের অন্তঃকরণের যে কোন গূঢ় ভাব প্রকাশ করিতে শব্দের কোনই অভাব অনুভূত হয় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত ভাষাই পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার জননীস্থানীয়া। এই সব সত্ত্বেও খেদের বিষয় এই যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উহার ব্যবহার ছিলনা, তাই বর্ত্তমানে সংস্কৃতভাষা মৃতভাষা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের লোকেরা সংস্কৃত-ভাষাকে "দেবভাষা" বা "অমরভাষা" কহিয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে

শিক্ষিত লোকেরা এই ভাষাই ব্যবহার করিত, আর অশিক্ষিত এবং সাধারণ নীচজাতীয় লোকেরা প্রাকৃত নামে এক অপভ্রষ্ট ভাষা ব্যবহার করিত। এই প্রাকৃতভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কথিত হইত এবং ইহাদিগকে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। ইহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রী দক্ষিণ দেশগুলিতেই, শৌরসেনী মথুরার পার্শ্ববর্ত্তী ব্রজমণ্ডলে, মাগধী মগধ প্রভৃতি দেশগুলিতে এবং পৈশাচী বনবাসী ও নীচজাতীয় লোকদিগের দ্বারা কথিত হইত। হিন্দুস্থানে আজকাল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কথিত হিন্দী, বাঙ্গালা, মারহাটী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী প্রভৃতি ভাষা সকলই এই প্রাকৃত ভাষা হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং ইহারা উহাদেরই রূপান্তর মাত্র।

সংস্কৃতভাষার গ্রন্থসমূহকে আমরা সাধারণতঃ ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাহিত্যগ্রন্থ এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ যাহাতে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি বলা হইয়াছে সেগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং যাহাতে প্রধানতঃ সাহিত্যের বিষয় বলা হইয়াছে সেগুলিকে সাহিত্যগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। যেমন সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে সাহিত্যের অভাব নাই সেইরূপ সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থও ধর্ম্মবিষয়ক কথাবার্ত্তায় পরিপূর্ণ, তথাপি ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে প্রধানতঃ ধর্ম্মের এবং সাহিত্যগ্রন্থগুলিতে প্রধানতঃ সাহিত্য রসপ্রধান বিষয় থাকায় এইরূপ বিভাগ করা গেল।

সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ আঠার ভাগে বিভক্ত এবং এই অষ্টাদশ বিদ্যা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। এই অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে চতুর্ব্বেদ, চতুরুপবেদ, ষড়্‌বেদাঙ্গ, এবং চতুরুপাঙ্গ গণিত হইয়া থাকে। চতুর্ব্বেদের নাম ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। চতুরুপবেদের নাম আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, এবং অর্থশাস্ত্র। ষড়্‌বেদাঙ্গের নাম শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প, জ্যোতিষ এবং ছন্দঃ। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে চতুরুপাঙ্গ বলা হইয়া থাকে। নিম্নে ইহাদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(২)

বেদ।

চারবেদের মধ্যে ঋগ্বেদ বিস্তারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বিশেষ গবেষণার যোগ্য। ঐতিহাসিকগণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহাই অন্যান্য বেদ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১০১৭ সূক্ত বা মন্ত্রসমষ্টি পাওয়া যায়। প্রত্যেক মন্ত্রের নাম ঋক্। ঋগ্বেদের দুইরকমে বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম বিভাগানুসারে এই গ্রন্থে আট আট অধ্যায়যুক্ত আটটী অষ্টক এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে কয়েকটী বর্গ এবং প্রত্যেক বর্গে কয়েকটী করিয়া মন্ত্র আছে। (এই বিভাগটী পাঠে সুবিধার জন্য কেবল পুস্তকের আকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে।) দ্বিতীয় বিভাগানুসারে ঋগ্বেদে ১০টী মণ্ডল আছে, প্রত্যেক মণ্ডলে কয়েকটী অনুবাক এবং প্রত্যেক অনুবাকে কয়েকটী করিয়া সূক্ত এবং প্রত্যেক সূক্তে কয়েকটী করিয়া ঋক্ আছে। আর্য্যদিগের প্রাচীন সিদ্ধান্তানুসারে বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, কিন্তু আধুনিক মতানুসারে ঋষিরাই বেদের প্রণেতা। ঋগ্বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডল ভিন্ন

অবশিষ্ট মণ্ডলগুলির এক একজন ঋষি এবং প্রথম ও দশম মণ্ডলের একাধিক ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই বিভাগটী বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, এখানে শুধু পুস্তকের আকারের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই—কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঋষি অনুযায়ী মন্ত্রগুলির ভাগ করা হইয়াছে; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা এই বিভাগানুসারেই চলিয়া থাকেন। বেদের মন্ত্রভাগের নাম সংহিতা। শাকল্য ঋষি প্রত্যেক মন্ত্রের পদপাঠ অর্থাৎ মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন সম্পূর্ণরূপ সন্ধি-সমাস-প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পৃথকভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বেদগুলির কোন্ মন্ত্রের বিনিয়োগ কোন্ প্রকরণে করা উচিত ইহা জানাইবার জন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। বেদের মত ব্রাহ্মণেও সকল মন্ত্র সস্বর লিখিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে প্রায়ই গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী এই তিন ছন্দে লিখিত মন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের মন্ত্রে অনেক দেবতার স্তুতি করা হইয়াছে এবং ঐ মন্ত্রগুলি দ্বারা প্রার্থনা করা হইয়াছে যে তাঁহারা যেন নিজ নিজ ভক্তগণকে বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন এবং উহাদের শত্রুগণের বিনাশ সাধন করেন। প্রাচীনকালের ঋষিদিগের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল এবং যে সব দেবতাকে উঁহারা ঈশ্বরের শক্তি মনে করিতেন তাঁহারা সজ্জনদিগের রক্ষক এবং দুষ্টদিগের সংহারক বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। ঋগ্বেদে অদিতি, দ্যৌ, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ, উষস্, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, মরুৎ, রুদ্র, বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর) এবং যম ইত্যাদি দেবতাগণের স্তুতির মন্ত্র আছে। সিন্ধু এবং সরস্বতী এই দুইটী নদীরও স্তুতি আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিতে প্রজাপতি ও মিত্রাবরুণের এবং স্থানে স্থানে কোন কোন গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার এবং উর্ব্বশী, পুরুরবা, মনু, ইক্ষ্বাকু, ত্রসদস্যু, পুরুকুৎস, সুদাস, দশরথ, রাম, পুরু, যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, এবং মনুর সন্তানগণের ও ভরতাদি কুরুবংশীয় রাজাদিগের এবং বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদিগেরও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে হিমালয়পর্ব্বত এবং পাঞ্জাবের সবগুলি নদীরও নাম আছে যথা সিন্ধু, বিতস্তা (ঝিলম্), পরুষ্ণী বা ইরাবতী (রাবী), বিপাশা (ব্যাস), চন্দ্রভাগা (চনাব), শতদ্রু (সতলজ), কুভা (কাবুল) সুবস্তু (সোয়াত্), ক্রমু (কুরম্), গোমতী (গোলাম) আর গঙ্গা ও যমুনার নামও প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে; এই সময়ের লোকদিগের খাদ্য প্রধানতঃ গম এবং যব ছিল।

ঋগ্বেদের সময়ে যে লোকেরা সোণারূপাপ্রভৃতির ব্যবহার জানিত ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বন্য পশুগুলির মধ্যে সিংহ, বৃক, বরাহ, ভল্লুক, বানর এবং হাতী আর গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ষাঁড়, কুকুর, গাধা এবং মহিষ, ও পক্ষীদিগের মধ্যে হাঁস, তোতা, ময়ূর, কাক প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্পের বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে এবং উহাদিগকে মনুষ্যজাতির শত্রু বলিয়া বর্ণনা করা হইত।

ঋগ্বেদের দ্বারা ঐ সময়ের ভারতবাসীদিগের চালচলন, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। পিতা গৃহে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা বলিয়া ধারণা ছিল, এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়া বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন এবং স্ব স্ব সন্তানগণের মঙ্গল কামনা করিতেন। স্ত্রীলোকদিগের বড় আদর করা হইত এবং স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিত। এমন কি স্ত্রীলোকেরা কোন কোন বৈদিক সূক্তের ঋষি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বিবাহের বিধি ঐ সময়ে

যে রকম ছিল, প্রায় সেইরূপই আজকালও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কন্যা নিজের ইচ্ছানুসারেও বর খুঁজিয়া লইতেন। বিধবারও কখন কখন পুনর্ব্বিবাহ হইত। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে আজকালকার মত তখনও লোকে সুখী হইত না। চোরের দণ্ড এবং অর্থাদি ধার করার প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল।

মৃতগণকে পোড়ান হইত এবং কখনও কখনও মাটীতেও পুতিয়া রাখা হইত। ঐ সময়ের লোকদিগের খাদ্য প্রধানতঃ দুধ, ঘি, যব ও গম ছিল। খাদ্য কখনও বা পিষিয়া আটার রুটী প্রস্তুত করিয়া, কখনও বা ভাজিয়া, আর কখনও বা ক্ষীরের মত করিয়া খাওয়া হইত। শাকপাতা, তরকারী, এবং ফলও তখন আহার করা হইত। মাংসের উল্লেখও পাওয়া যায়, (তবে যজ্ঞে ভিন্ন কেহ কখনও মাংস খাইত না)। লোকেরা যজ্ঞে সোমলতার রস দেবতাদিগকে অর্পণ করিয়া পান করিত। জুয়াখেলা এবং মদ খাওয়া পাপকার্য্য বলিয়া ধারণা ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থ তখন অগ্নিহোত্রী ছিলেন। ক্ষেত্রের কার্য্য, বাণিজ্য এবং পশুপালনাদি কার্য্য বৈশ্যেরা করিতেন। ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করিতেন, পূজাপ্রভৃতি কার্য্য করিতেন ও করাইতেন। ঋণপরিশোধের প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। শস্ত্রবিদ্যার যথোচিত অভ্যাস করিয়া রাজা প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং বৃদ্ধবয়সে শাসনের ভার স্বীয় সন্তানগণের উপর সমর্পণ করিয়া যাইতেন। ঢোল (দুন্দুভি), বীণা বাঁশী (বীণ) প্রভৃতি বাদ্য বাজান এবং গানগাওয়াও ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল। বাণিজ্যে বহুবিধ গরুর দ্বারা বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। কাঠ, চেলা ও ধাতু প্রভৃতির কার্য্যও হইত এবং ইহাদের দ্বারা রথ, নিশান, প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। কাপড় বুনান এবং চামড়ার কার্য্যও হইত। সমুদ্র যাত্রার প্রচলন তখনও ছিল। দান গৃহস্থের এক প্রধান কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত এবং জনসাধারণের পাঠের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। নীতি, ধর্ম্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতগণ বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র এই চার জাতি এবং সেই সময়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চার আশ্রম ছিল।

যজুর্ব্বেদের মন্ত্র যজ্ঞকর্ম্মে পুরোহিতদিগের (অধ্বর্য্যুদিগের) জন্য লিখিত হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদের মুখ্যতঃ কর্ম্মকাণ্ডের সহিতই সম্বন্ধ। যজুর্ব্বেদস্থ প্রায় অর্দ্ধেক মন্ত্রই ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের যে মন্ত্রগুলি যজ্ঞাদিক্রিয়াকলাপের সময় পঠিত হয় তাহাকেও যজুঃ বলে। এই বেদের দুইটী ভাগ আছে,—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্লযজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয়িসংহিতা। যে ভাগ মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাকে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ এবং যে ভাগ বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাকে শুক্ল যজুর্ব্বেদ বলা হয়। (এই বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে—মহামেরুতে ঋষিদিগের একটী মহাসভা হয়, এই সভার ঋষিগণ বলিলেন "যে ঋষি আমাদের এই সভায় না আসিবেন তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাতক হইবে।" বৈসম্পায়ন এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার এই পাতক হইল—তাঁহার বার্দ্ধক্যজনিত অসামর্থ্য বশতঃ তিনি শিষ্যগণকে কঠোর তপস্যা দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপ মোচন করিতে প্রতিনিধি অর্পণ করিলেন। এই আদেশ প্রদান সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য নামক তাঁহার একজন শিষ্য অনুপস্থিত ছিলেন। কিছুকাল

পরে তিনি আসিয়া বলিলেন যে যে-সব শিষ্যেরা তপস্যা করিতেছে তাহারা হীনবীর্য্য এবং তাহারা রীতিমত তপস্যা করিতে অসমর্থ, আর নিজে গুরুর হিতার্থে তপস্যা করিতে অনুমতি চাহিলেন। শিষ্যের এইরূপ ঔদ্ধত্যে গুরু অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট হইতে অধীত সকল বিদ্যা ফিরাইয়া চাহিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যও তখন সেগুলি ক্রোধভরে প্রত্যর্পণার্থ উদ্গীরণ করিলে উপস্থিত শিষ্যগণ তিত্তিরী পাখী হইয়া সেগুলি গলাধঃকরণ করিলেন, তাই তাঁহাদের বেদাংশের নাম হইল তৈত্তিরীয় সংহিতা, আর যাজ্ঞবল্ক্য তারপর সূর্য্যের আরাধনা করিয়া যে বেদাংশ সঙ্কলিত করেন তাহার নাম হইল বাজসনেয়ি সংহিতা, কারণ অনেকে বলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনির পুত্র ছিলেন)। যজুর্ব্বেদের মন্ত্রে গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীর এবং কুরুপাঞ্চাল প্রভৃতি দেশের নাম আছে। রুদ্রের মহাদেব, শঙ্কর, শিব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামও ইহাতেই প্রথম পাওয়া যায়। বিষ্ণুর নামেরও ইহার মন্ত্রে উল্লেখ আছে।

সামবেদের মন্ত্র গান করিয়া পঠিত হয়। এই বেদে প্রায় ১৫৪৯টী মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ৭৫টী সামমন্ত্র ভিন্ন অবশিষ্ট সকলই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। সোমযাগে সামমন্ত্রগুলি গান করিতে হয়।

অথর্ব্ববেদে প্রায় ৬০০০ মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে প্রায় ১২০০ মন্ত্র ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রগুলিরও কর্ম্মকাণ্ডের সহিতই সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এবং রাজ্যাভিষেক প্রভৃতির কার্য্যবিষয়ক মন্ত্র এবং মারণ, উচাটন, আরোগ্য, চিরজীবিতা, শত্রুনাশাদির উপযোগী মন্ত্রও এই বেদে সঙ্কলিত আছে। বিশেষভাবে ঐহিক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকায় পারলৌকিক (ঋক্, যজু, ও সাম) ত্রয়ীর সহিত স্বাধ্যায়ে ইহার পাঠের বিধি মানা হয় না।

উপরে যে চারবেদের বর্ণনা করা গেল, উহাদ্বারা কেবল সংহিতা বা মন্ত্রভাগ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ এই বেদ কখন রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে সেইরূপ ঋষিপ্রোক্ত মন্ত্রও সংসারে অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত আছে। তবে যে যে বৈদিক মন্ত্রে যে যে ঋষি বা রাজা প্রভৃতির উল্লেখ আছে সেই মন্ত্র সকল সেই সেই ঋষি বা রাজার সময়ে (বা তাহার পরে) কথিত হইয়াছিল ইহাও আমরা মানিয়া লইতে পারি। যেমন—যে মন্ত্রে রাজা ভরতের নাম পাওয়া যায় তাহা রাজা ভরতের সময়ে বা তাহার পরে কথিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল বৈদিক মন্ত্রের সময়ের এইরূপ কোন সন্ধান না পাওয়ায় ইহা বলাও অনুচিত হইবে না যে বেদ অনাদি। এই হেতু ইহাও বলা যায় না। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বৈদিক মন্ত্রগুলির সঙ্কলন করিয়াছিলেন, এই সঙ্কলন যে আজকাল যতটা পাওয়া যায় এই পর্য্যন্তই ছিল কিনা তাহারও কিছু ঠিক নাই। বেদের সময় এবং সমগ্রভাগ কোন ঐতিহাসিক নিয়মে বিদিত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। তবে বেদের সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়াই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম বেদব্যাস (বেদ—বি+অস্+ঘঞ্) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিদ্বারা এইরূপ বলাই উচিত-যে বেদের প্রচলিত মন্ত্রগুলির সঙ্কলন প্রায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েই হইয়াছিল।

এই ত গেল সংহিতার কথা, কেবল সংহিতাভাগকেই বেদ বলিয়া মানা অন্যায়। বেদে ব্রাহ্মণ, সূত্র, আরণ্যক এবং উপনিষদভাগও সম্মিলিত আছে। এই হেতু উক্ত গ্রন্থগুলিকেও বেদ বলিয়াই স্বীকার করা হয়। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্য তৎ-সংশ্লিষ্ট আখ্যানসমূহ ব্রাহ্মণ নামক বৈদিক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। উপাসনা অর্থাৎ দেবপূজন বা ধ্যান এবং জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য যে বেদে নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে তাহাদের নাম আরণ্যক এবং উপনিষদ্। প্রত্যেক বৈদিক সংহিতার সহিত সম্বদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ আছে। আরণ্যক বনবাসী ঋষিরা স্ব স্ব (অধিকারী) শিষ্যগণকে নিজ নিজ আশ্রমে যে শিক্ষা প্রদান করিতেন তাহা লিখিত আছে এবং উপনিষদে অনেক উপখ্যানাদির দ্বারা এক আত্মা অথবা ব্রহ্মের সিদ্ধি সংস্থাপিত করা হইয়াছে। উপনিষদ্গুলির সিদ্ধান্তও অদ্বৈতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদ সঙ্কলনের সময়ের মত এই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, এবং উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির সঙ্কলন সময়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের নাম পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা অনুমান করা হইয়া থাকে যে এই গ্রন্থখানি জনমেজয়ের কিছু পরে লিখিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে সংহিতাভাগ এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্কলনে (ব্যাস হইতে জনমেজয়) প্রায় দেড়শত বৎসরের অধিক সময়ের ভেদ হয় নাই।

(৩)

উপবেদ

চার উপবেদের মধ্যে ঋগ্বেদের উপবেদ "আয়ুর্ব্বেদ" বা বৈদ্যকশাস্ত্র। আয়ুর্ব্বেদের সূত্র, শারীর, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধিভেদে আটটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার নির্ম্মাণকর্ত্তা ব্রহ্ম, প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধন্বন্তরী, ভরদ্বাজ, আত্রেয় এবং অগ্নিবেশ ইত্যাদি ঋষি। এই ঋষিদিগের গ্রন্থের সারভাগ গ্রহণ করিয়া চরক এক সংক্ষিপ্ত বৈদ্যকগ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই চরক সংহিতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন চরক কাশ্মীরের তুরস্করাজ কনিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন। এই মতে চরক সংহিতা দ্বিতীয় বিক্রমশতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। চরক সংহিতায় পূর্ব্বোক্ত আটটী স্থানেরই বিভিন্ন প্রকরণ আছে। সুশ্রুত নামক পণ্ডিত "সুশ্রুত সংহিতা" নামে আর একখানা বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে মাত্র ৫ টী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে ঘা চেড়াফাড়ার প্রক্রিয়া এবং কোন ঘাকে ঔষধ প্রদানের উপযুক্ত করিবার জন্য প্রায় ১২৭ টী যন্ত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে সুশ্রুত চতুর্থ বিক্রমশতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুশ্রুতের পরে বাগভট প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় আরও কয়েকখানি বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি দেখিলে স্পষ্টভাবে বিদিত হওয়া যায় যে প্রাচীনকালে হিন্দুগণ বৈদ্যক বা চিকিৎসাশাস্ত্রে কত উন্নতি করিয়াছিলেন।

কামশাস্ত্রও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত, কারণ সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে "বাজীকরণ" নামক কামশাস্ত্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন। বাৎস্যায়ন প্রণীত পঞ্চাধ্যায়যুক্ত একখানি কামশাস্ত্র এখনও পাওয়া যায়। কামশাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয়বৈরাগ্য; কারণ শাস্ত্রোল্লিখিত পথেও বিষয় ভোগ করিলে পরিণামে দুঃখই ভোগ করিতে হয়।

যজুর্ব্বেদের উপবেদের নাম ধনুর্ব্বেদ, বিশ্বামিত্র নামক ঋষি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে চারিটী পাদ আছে, যথা—দীক্ষাপাদ, সংগ্রহপাদ, সিদ্ধিপাদ এবং প্রয়োগপাদ। এই ধনুর্ব্বেদ কবে কবে রচিত হইয়াছিল তাহা ঠিক ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। ধনুষ্ শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধই আছে, কিন্তু ধনুর্ব্বেদ শব্দে ধনুষ্ শব্দ দ্বারা আয়ুধমাত্রের গ্রহণ করা হইয়াছে। আয়ুধ চার রকমের হইয়া থাকে—প্রথমতঃ যাহা নিক্ষেপ করা হয় তাহা "মুক্ত" যেমন চক্রাদি, দ্বিতীয়তঃ যাহা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ ভাবেই চালিত হইয়া থাকে তাহা "অমুক্ত" যেমন খড়্গাদি, তৃতীয়তঃ যেগুলি দুই প্রকারেই অর্থাৎ নিক্ষেপ করিয়া এবং মুষ্টিবদ্ধ ভাবে চালিত হইয়া থাকে তাহা "মুক্তামুক্ত" যেমন গদা, শল্য, বর্শা প্রভৃতি, আর চতুর্থতঃ যেগুলি যন্ত্রদ্বারা চালিত হইয়া থাকে তাহাদিগকে যন্ত্রমুক্ত বলা হইয়া থাকে, যথা বাণ, শতঘ্নী ইত্যাদি। মুক্ত আয়ুধকে "অস্ত্র" এবং অমুক্ত আয়ুধকে "শস্ত্র" বলা বলা হয়।

সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ব্ববেদ বা সঙ্গীতশাস্ত্র। এই বিষয়ের একখানি গ্রন্থ ভরত মুনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নাট্যশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থে গান, বাদ্য এবং নৃত্যের নানাবিধ ভেদ কথিত হইয়াছে; ভরত মুনির ঠিক সময় নির্দ্ধারণ করা যায় না।

অথর্ব্ববেদের উপবেদের নাম অর্থশাস্ত্র। ইহার অনেক শাখা আছে; (১) নীতিশাস্ত্র (২) শালিহোত্র (অশ্ববিদ্যা) (৩) শিল্পশাস্ত্র (কারিগরি) (৪) সূপশাস্ত্র (পাকবিধি) প্রভৃতি ৬৪ কলার বিষয় এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে শুক্র, বিদুর, কামন্দক, চাণক্য প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। যদিও চাণক্যের সময় বিক্রম হইতে প্রায় ২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া একরূপ নিশ্চিত হইয়াছে এবং চাণক্যের অর্থশাস্ত্র এই বিষয়ের একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, তথাপি অর্থশাস্ত্রের প্রত্যেক শাখার বিস্তারের সময় ঠিক ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

যবক্ষারজানের জন্মান্তর রহস্য

সকলেই অবগত আছেন যে আমাদের এই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঊর্দ্ধে প্রায় পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের এক বেষ্টনী রহিয়াছে, ইহা হয়ত কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই বায়ুই আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান সহায়। যাবতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ এই বায়ুর অভাবে অল্প সময়ও বাঁচিয়া থাকিতে অক্ষম, পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি ও রক্ষা ইহার অভাবে কিছুতেই সম্ভব হইত না। পূর্ব্বপ্রকাশিত "তরল বায়ু" নামক প্রবন্ধে ইহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি, বায়ুর অবয়ব ও উপাদান সম্বন্ধেও উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে বায়ুর দুইটি প্রধান উপাদান, অম্লজান ও যবক্ষারজান নামক দুইটি মারুত পদার্থ; একশত ভাগ বায়ুতে প্রায় ৭৮ ভাগ যবক্ষারজান ও ২১ ভাগ অম্লজান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে অম্লজানের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। যবক্ষারজানের গতিবিধি ও কার্য্যকারিতা আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অম্লজানের প্রখর ক্রিয়াকে মৃদুভাবাপন্ন করা ব্যতীত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহগঠনে ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ দেহের একটি প্রধান উপাদান। প্রাণিগণ বায়ুমণ্ডল হইতে সহজ ভাবে মৌলিক যবক্ষারজান গ্রহণে অক্ষম। অধিকাংশ উদ্ভিদও বায়ু হইতে মৌলিক যবক্ষারজান গ্রহণপূর্ব্বক শরীরপুষ্টি করিতে সক্ষম নহে। শুধু এক জাতীয় উদ্ভিদ্ যাহাদিগকে "লেগুবিনোসি" বলা হয়, যথা সিম, মটর ইত্যাদি, মৌলিক যবক্ষারজান গ্রহণে সমর্থ। এই জাতীয় উদ্ভিদের শিখরশাখায় এক প্রকার বীজাণু বাস করে, ইহাদের নাম "সিম্‌বাইয়োটিক" বা সহজীবী জীবাণু। ইহাদেরই সহযোগিতায় এই জাতীয় উদ্ভিদ্‌গণ বায়ু হইতে মৌলিক যবক্ষারজান সহজভাবে গ্রহণপূর্ব্বক শরীর সংগঠন ও পোষণ করে, উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে এই যবক্ষারজান যৌগিক উদ্ভিজ্জ আমিষে বা "Vegetable protein"এ পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত বায়ু মণ্ডলের ঊর্দ্ধপ্রদেশে তাড়িতশক্তির প্রভাবে বায়ুর উপাদানদ্বয় অম্লজান ও যবক্ষারজান মারুতের প্রায়ই রাসায়ণিক সংযোগ ঘটিতেছে। এই যৌগিক যবক্ষারজান ঘটিত মারুত পদার্থ বৃষ্টিজলে ধৌত হইয়া পৃথিবীতে জমির উপর পতিত হয়। এইরূপে জমিতে যবক্ষারাম্লের উৎপত্তি হয়, ইংরাজীতে ইহাকে নাইট্রিক ও নাইট্রাস্ এসিড বলা হয়। এই যবক্ষারাম্ল উদ্ভিদগণের একটি প্রধান খাদ্য, মাটীর আভ্যন্তরীণ ক্ষার সংযোগে এই যবক্ষারাম্ল আবার সোরা বা যবক্ষারলবণে পরিণত হয়, ইহাও উদ্ভিদের একটি প্রধান খাদ্য। এই হেতু সোরা জিনিষটি একটি অতি আবশ্যকীয় সাররূপে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। যবক্ষারাম্ল ও যবক্ষার লবণ উদ্ভিদ্‌দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত উদ্ভিজ্জ আমিষের সৃষ্টি করে। প্রাণিগণ নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিজ শরীর পোষণোপযোগী যবক্ষারজানের সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রাণীদেহে এই সমস্ত উদ্ভিজ্জ আমিষ বা যৌগিক যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থ পাচক রসের ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় প্রাণীজ আমিষের সৃষ্টি করে, ইহাতেই প্রাণীগণের শরীরের পুষ্টি ও গঠন

হয়। শরীর গঠনের প্রয়োজনাতিরিক্ত আমিষ বা যৌগিক যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ শরীরের ক্রিয়ায় বিকৃত হইয়া মলমূত্র সহযোগে প্রাণীদেহ হইতে বিনির্গত হয়।

এই প্রাণিদেহবিনিসৃত যবক্ষারজানঘটিত বিকৃত যৌগিক পদার্থ জমির উপর পতিত হইয়া নানাবিধ জীবাণু সহযোগে বিবিধ প্রকারে আরো পরিবর্ত্তিত হয়। পরিশেষে এমোনিয়াঘটিত লবণে (এমোনিয়া একটি যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ) ও যবক্ষারাম্লে বা যবক্ষার লবণে ইহাদের পরিণতি ঘটে, প্রস্রাবের যায়গায় যে উৎকট গন্ধ পাওয়া যায়, এমোনিয়ার উৎপত্তিই ইহার প্রধান কারণ। তখন পুনরায় উদ্ভিজ্জদেহে উহারা প্রবেশ লাভ করিয়া উদ্ভিজ্জ আমিষের সৃজন করে। অন্যদিকে আবার যখন উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর মৃত্যু হয়, তখন উহাদের দেহ জমির উপর ও অভ্যন্তরে পচিতে থাকে। নানা জীবাণু সংযোগে তাহাদের দেহের যৌগিক যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ সমূহের (অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ আমিষের) বিবিধ বিকার ঘটিতে আরম্ভ হয়। ইহার ফলে যবক্ষারজান সমষ্টির একাংশ মুক্ত মারুত রূপে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ লাভ করে। অধিকাংশ এমোনিয়াঘটিত লবণ যবক্ষারাম্ল ও যবক্ষার লবণে পরিণত হইয়া পুনরায় উদ্ভিদের খাদ্যরূপে উদ্ভিদ্‌দেহে প্রবেশ করে, আবার প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে যেমন জমির উপর সর্ব্বদা এমোনিয়া ঘটিত লবণ, যবক্ষারাম্ল ও যবক্ষার লবণের সৃষ্টি হইতেছে সেইরূপ এই সমস্ত যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থ সমূহও এক প্রকার ধ্বংসকারী জীবাণু সহযোগে অহরহ বিনষ্ট হইয়া বায়ুমণ্ডলে মুক্ত যবক্ষারজান মারুতের আমদানী করিতেছে। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে যেই যবক্ষারজান বায়ুমণ্ডল হইতে নানাবিধ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহাই আবার বিবিধ ধ্বংসপ্রক্রিয়ার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলে পুনরাবর্ত্তন করে। আজ যেই যবক্ষারজানের অণুটি উর্দ্ধাকাশে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, কালই হয়তঃ উহা বায়ুমণ্ডলের তাড়িত শক্তির প্রভাবে অম্লজানের অণুর সহিত রাসায়ণিক মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের যুগল জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবে। এমন সময়ে হঠাৎ একদা নীলাকাশে কালো মেঘের উদয় হইয়া ঘনঘটার সৃষ্টি করিবে, হয়ত দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইবে। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত যবক্ষারাম্লজান দম্পতীটিও বারিবিন্দুতরণীতে আরোহণ করিয়া নূতন বেশে ধরাতলে উপস্থিত হইবে। ধরাতল হইতে নানাবিধ অণুর সহিত সন্ধিবিগ্রহের পর উহা উদ্ভিদ্‌দেহে প্রবেশ লাভ করিবে। উদ্ভিদ্ দেহে কিছুকাল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পর খাদ্যরূপে প্রাণীদেহে আশ্রয় লাভ করিবে। প্রাণীদেহ হইতে হয়ত পরদিবসেই মলমূত্ররূপে বিনিঃসৃত হইয়া পুনরায় ধরাতলে আগমন করিবে, কিম্বা কিছুকাল প্রাণীদেহে সহবাস করিয়া প্রাণীর মৃত্যুর পরে আবার ধরাতল আশ্রয় করিবে। অন্যবিধ অণুর সহিত তাহার মিলনসূত্র বিচ্ছিন্ন হইলে সে মুক্তিলাভ করিয়া ধরাতল হইতে পুনরায় তাহার আদিম আবাস বায়ুমণ্ডলে পলায়ন করিবে। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই, বায়ুমণ্ডলে হয়ত আবার পরমুহূর্ত্তেই তাড়িত শক্তিসহযোগে তাহাকে অম্লজানের অণুর সহিত মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পুনরায় জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হইতে হইবে। যদি বিশেষ ভাগ্যবান হয় তবে কিছুকাল নিষ্কৃতির

নির্ম্মম হস্ত এড়াইয়া মুক্তাকাশে বিচরণ করিতে পারিবে, কিন্তু একদিন না একদিন তাহার জন্মচক্রে ধরা দিতে হইবে। তাই কবির কথা মনে পড়ে

"অস্তিত্বের চক্রতলে, একবার বাঁধা প'লে
নাহিক নিস্তার!"

নিয়তি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সঙ্কেত করিয়া যেন বলিয়া দিতেছেন,—"মুক্তি নাই! কাহারো মুক্তি নাই!" তুমি মানুষ হও, জন্তু হও, উদ্ভিদ্ হও, সজীব হও, নির্জীব হও কিছুতেই তোমার মুক্তি নাই! তুমি নিয়তির ক্রীড়ণক মাত্র!"

নিম্নে যবক্ষারজানের জন্মচক্রে প্রদর্শিত হইল,—

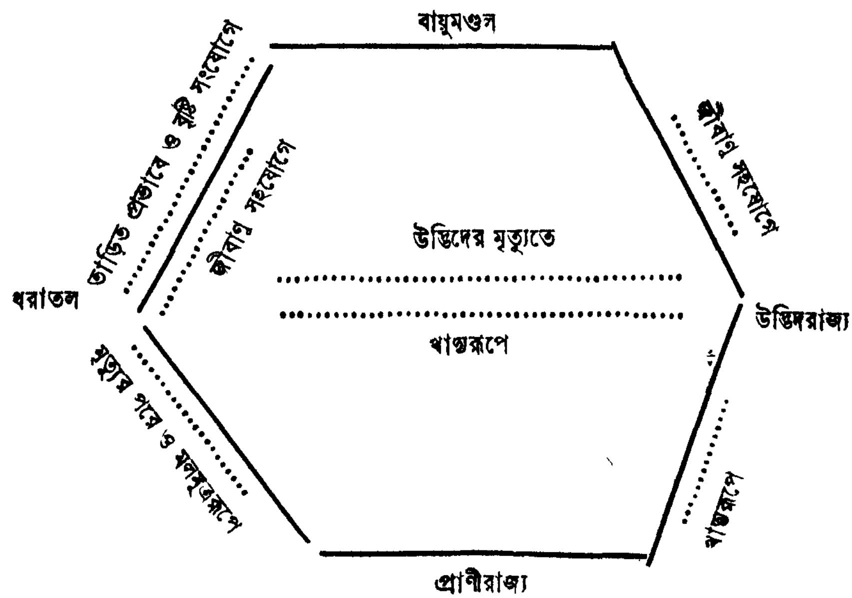

যবক্ষারজানের এই জন্মচক্র সৃষ্টিনীতির এক অতি আবশ্যকীয় শৃঙ্খল রক্ষা করিতেছে; ইহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, প্রকৃতি দেবী তাঁহার রাজ্যে যে নিয়ম বিধান করিয়াছেন,—তাহার কিছুতেই ব্যতিক্রম ঘটিবার উপায় নাই। যবক্ষারজানের পূর্ব্ববর্ণিত জন্মচক্রের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের যবক্ষারজানের ও অম্লজানের অনুপাত অপরিবর্ত্তিতভাবে রক্ষিত হইতেছে; এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ্ রাজ্যের আবশ্যকীয় খাদ্যের উৎপত্তি, সংস্থান ও সরবরাহ হইতেছে, পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে এই প্রকার প্রকৃতি দেবীর সর্ব্ববিধ বিধানের ভিতর সৃষ্টিরক্ষার একটি গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এই প্রাকৃতিক বিধানেই যখন প্রাণী ও উদ্ভিদের খাদ্য সংস্থান ঘটিতেছে তখন কৃষিকার্য্যে কৃত্রিম সারের আবশ্যকতা কি? পূর্ব্বোক্ত যবক্ষারজানের জন্মচক্র পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, বর্ত্তমানে শুধু এই প্রাকৃতিক বিধানের উপর নির্ভর করিলে প্রাণিজগতের খাদ্যসংস্থান ও সরবরাহ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ জীবজগতে বংশবৃদ্ধির দরুণ, সভ্যতার বিস্তারহেতু যবক্ষারজানবহুলখাদ্যের আকাঙ্ক্ষাবৃদ্ধির

জন্য, নানাবিধ রাসায়নিক কারখানায় যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থের ব্যবহারের দরুণ এবং সভ্যতাভিমানী যুদ্ধপ্রিয় মানবজাতির যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম বারুদ ও বিস্ফোরক প্রস্তুতের জন্য যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ সমূহের আবশ্যকতা ও অভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে, এতদ্ব্যতীত মানবজাতির খাদ্যবিচারের দিক্ হইতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রকৃতিজাত যবক্ষার জানঘটিত পদার্থ মাত্রই মানব বা জন্তুগণের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। প্রথমতঃ এমন অনেক উদ্ভিদ্ রহিয়াছে যাহা মানব বা জন্তুর খাদ্যরূপে গৃহীত হয় না, সুতরাং তাহাদের দেহসঞ্চিত যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থ প্রাণিগণের খাদ্যহিসাবে মূল্যহীন; আবার প্রাণিগণের দেহবিনিসৃত মলমূত্রাদি নদীপথে সমুদ্রে যাইয়া পড়িতেছে, অতএব উহাদের আভ্যন্তরীন যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ সমূহ শুধু সামুদ্রিক জীবজন্তু বা সামুদ্রিক উদ্ভিদের উপভোগে আসিতে পারে। তাহাতে মানবজাতির কোন উপকার ঘটে না, এতদ্ব্যতীত যথেষ্ট যবক্ষার লবণ বা যবক্ষারাম্ল ধরাতল হইতে বৃষ্টিজলের সাহায্যে ধৌত হইয়া নদী বা সমুদ্রের জলে মিশিতেছে, ইহাও মানবজাতির কোনও কাজে আসিতে পারে না। এই কারণেই কৃত্রিম সারের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, যবক্ষারজানঘটিত কৃত্রিম সার নানাবিধ উপায়ে সংগৃহীত হইতেছে। প্রথমতঃ কয়লা পোড়াইয়া যখন জ্বালানি গ্যাস তৈয়ারী হইয়া থাকে, উহার সঙ্গে নানাবিধ যবক্ষারজানঘটিত পদার্থেরও উৎপত্তি হয়। ইহাদের বেশীর ভাগ এমোনিয়াঘটিত লবণ ও এমোনিয়া। এই সমস্ত পদার্থ মূল্যবান সাররূপে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ আমেরিকার চিল্লী প্রভৃতি প্রদেশের সমুদ্রোপকূলে অতি বিস্তৃত যবক্ষার-লবণের স্তর রহিয়াছে। ইহা হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ যবক্ষারলবণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানী হইয়া থাকে। যবক্ষারজানঘটিত পদার্থের সরবরাহের ইহাই একটি প্রধান স্থান। এবং এই স্তর হইতে বৎসর বৎসর যেই পরিমাণ যবক্ষারলবণ ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে বিশেষজ্ঞরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে আর ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে এই স্তর নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। ইহাতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল যে যবক্ষারজানঘটিত সারের অভাবে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া পরিশেষে মানবজাতির খাদ্যাভাব হইয়া পড়িবে। এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয় বিপদের প্রতিকারের জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের লক্ষ্য হইল যবক্ষারজানের অফুরন্ত ভাণ্ডার বায়ুমণ্ডল হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া কৃষিকার্য্যে লাগাইতে হইবে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে ৪,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন যবক্ষারজান রহিয়াছে ইহা পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন; পৃথিবীর প্রত্যেক বর্গমাইলের উপর ২০,০০০,০০০ টন যবক্ষারজান আছে। বৈজ্ঞানিকগণ বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহাদের এই উদ্যমে সফলতা লাভ করিয়াছেন, এই বিষয়ে বারান্তরে বিশেষভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল। সুতরাং এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যবক্ষারজানের বায়ুমণ্ডলে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইবার অবকাশ শুধু প্রকৃতির বিধানে নহে, মানবের তাড়নায় এবং প্রয়োজনেও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। দুর্ব্বলের ভাগ্য শুধু বিধির বিধানে নহে, সবলের বিধানেও সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অবশ্য অদৃষ্টবাদী

ভারতবাসী আমরা সবসকে বিধাতারই অস্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে শয্যাগ্রহণ করিব।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

যবক্ষারজান নামটি ঠিক নহে, যবক্ষার বলিতে যব পোড়াইয়া যে ক্ষার হয় তাহাই বুঝান উচিত কিন্তু বরাবর "যবক্ষারজান" নামের দ্বারা "নাইট্রোজেন" গ্যাসকে বাংলায় লিখা হইতেছে বলিয়া উহা আর এখন পরিবর্ত্তন করিলাম না। যবক্ষারের সঠিক ইংরাজি প্রতিশব্দ পোটাসিয়াম কার্ব্বনেট।

দর্শনের কথা

আমরা এই প্রবন্ধে দর্শন জিনিষটা কি—তাহার বিষয় কি এবং কি উপায়ে সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সব দেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনের আলোচনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়সমূহে দার্শনিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্যের একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও যে সব শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, সে সব শাস্ত্রেও এরকম গোড়ার কথা লইয়া অনিশ্চয় দেখা যায় না। কোনও রাসায়নিকই হয়ত রসায়ন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এবং কি উপায়ে সেই শাস্ত্রে সত্য নির্ণীত হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন না। দুইজন রাসায়নিকের মধ্যে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কিন্তু যখন আমরা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করি তখন দেখিতে পাই সব দার্শনিকই কতকগুলি সাধারণ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিলেও, দর্শনশাস্ত্রের পরিসর ও সীমা সম্বন্ধে, উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় সম্বন্ধে যে কোন দুই মৌলিক দার্শনিকই সহজে একমত হইতে পারেন না।

কি বিষয়ে দর্শন কি রকম জ্ঞানলাভ করিতে চাহিতেছে—তাহাই যদি ঠিক্ হইল না, তবে তো সর্ব্ববাদিসম্মত কোন উপনীত হওয়া দর্শনের পক্ষে সুদূরপরাহত। শুধু বৈয়ক্তিক মতামত লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু যে জ্ঞান নিজের আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য সঙ্গতি বা যুক্তিযুক্ততার বলে নিজকে সাধারণ মানব বুদ্ধির কাছে গ্রহণীয় করিয়া তুলিতে না পারে, সে জ্ঞানে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হয় না—তাহা জ্ঞানরাজ্যের সীমার বাহিরেই পড়িয়া আছে বলিয়া বুঝিতে হয়। সে জ্ঞান প্রমাত্মক কিংবা ভ্রমাত্মক কিছুই বলিবার যো থাকে না। অতএব মনে হয় দার্শনিক জ্ঞান যদি কোন রকমের লাভদায়ক হইতে হয়, তবে তা ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি না হইয়া বিচারের সাহায্যে সাধারণ মানব বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

সব মানুষের বুদ্ধির একটা সাধারণ স্বভাব আছে। মানববুদ্ধির এই সাধারণ স্বভাবে বিশ্বাসই আমাদের সমস্ত জ্ঞানরাজ্যের ভিত্তি। আমার কাছে স্পষ্টত যেটা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে—সেটা যদি অপরের কাছে মিথ্যা বলিয়া মনে হয়—আমি যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি তাহাই যদি অপরের কাছে নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া লাগে, তবে সত্য মিথ্যা যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতার কোন অর্থ থাকে না। একথা অবশ্য সত্য যে অনেক সময় আমরা যাহা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা অনেকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিতে পারেন। এরকম মতদ্বৈধ থাকে বলিয়াই—আমাদের মধ্যে নানা বাদবিবাদের অবতারণা হইয়া থাকে—কিন্তু এই বাদবিবাদ যেমন একদিকে আমাদের প্রাথমিক মতদ্বৈধের প্রমাণ—তেমন ইহাই আবার আমাদের বুদ্ধিগত একতা এবং অন্তিম ঐকমত্যের জলন্ত সাক্ষী। আমাদের বুদ্ধি যদি একরূপ না হয় তবে আমাদের পরস্পর বাক্যালাপই বৃথা,—কেন না আমি যে কথার যে অর্থ বুঝিতেছি সে কথার সে অর্থ আমার প্রতিপক্ষের বুঝিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমি তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া থাকি। ভাষার অস্পষ্টতা বা অন্য কোনও দোষে হয়ত দু এক জায়গায় ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে,—কিন্তু তথাপি এমন এক জায়গা থাকা নিতান্তই আবশ্যক যেখানে আমরা বুদ্ধির দিক্ দিয়া সম্পূর্ণভাবে এক। এই ঐক্যই আমাদের ভাষা-কথাবার্ত্তা-সাহিত্যবিজ্ঞানদর্শন এক কথায় সমস্ত জ্ঞান রাজ্যের প্রাণ। আমি রাম বলিলে আমার বন্ধু যদি রহিম বোঝেন--আমি যেটাকে বলি সাধ্য তিনি যদি তাকে বলেন হেতু—তাহা হইলে আমাদের মধ্যে বাক্যালাপই চলে না। আমাদের একমত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমরা বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। আমাদের প্রাথমিক পার্থক্য যদি পার্থক্য থাকিয়া যায়—যদি অন্তিমে কোন রকমের ঐক্যে পৌছিবার কোন সম্ভাবনাই না থাকে--তবে জিজ্ঞাসু হইয়া বাদ-বিবাদ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। তাই বলিতেছিলাম বাদবিবাদে যেমন আমাদের মতভেদের কথা বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি শেষের মিলের কথাও গৃহীত বলিয়া ধরা থাকে। কোন বিষয়ের বিচারে যখন আমরা নানা প্রমাণ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া থাকি, তখন আমাদের বিশ্বাস থাকে যে ঐ সব যুক্তিতর্ক আমাদের মনে যে ধারণা জন্মাইয়াছে, যথাযথভাবে বিচার করিলে আমাদের প্রতিপক্ষের মনেও তাহারা ঠিক্ সেই ধারণা জন্মাইবে। যে কথাটা প্রকৃতই যুক্তিযুক্ত, তাহা শুধু আমার জন্য কিংবা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর জন্যই নহে—সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই তাহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা উচিত। বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান সমস্ত মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি; কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন ব্যক্তিসমূহের নিজস্ব কিছু নয়। ইহার উপরে আস্থা আছে বলিয়াই মানুষের জ্ঞানের সীমা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং দার্শনিক জ্ঞান যদি জ্ঞান বলিয়া সমাদৃত হইবার উপযুক্ত হয়—তবে সে বিষয়ে বুদ্ধিমান বিচারকগণের একমত হওয়া আবশ্যক—কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে একমত হইতে পারা যায় না—যতক্ষণ না আমরা জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে একমত হইতে পারিয়াছি। অন্ততঃ জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধেত ঐক্য হওয়া চাই। জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হইলে জ্ঞানও অবশ্য ভিন্ন হইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন উপায়ে এক জ্ঞান লাভ করিতে পারা গেলেও একই উপায়ে একই জ্ঞান লাভ করা যতদূর সম্ভবপর, বিভিন্ন উপায়ে এক জ্ঞান লাভ করায়

সম্ভাবনা ততদূর নয়। বিভিন্ন পথে একই জায়গায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইলেও বিভিন্ন যায়গায় গিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই মনে হয় দার্শনিক জ্ঞানকে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মত সাধারণের সম্পত্তি করিতে হইলে এই জ্ঞানের সাধ্য ও সাধনা সম্বন্ধে, বিষয় ও উপায় সম্বন্ধে একমত হওয়া উচিত। সম্পূর্ণ ঐকমত্য সংস্থাপন করিতে না পারিলেও, বিচারের সাহায্যে কোন্ মত সব চেয়ে বেশী সমীচীন বলিয়া মনে হয়, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। দার্শনিক জ্ঞানের বিষয় ও সেই জ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে যথাযথ বিচার করিবার আগে, কি উদ্দেশ্য লইয়া দর্শন শাস্ত্রের চর্চা করিয়া থাকি তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেননা আমাদের উদ্দেশ্য যদি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি তবে কোন্ বিষয়ে কি উপায়ে লব্ধ কি রকম জ্ঞানের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সিদ্ধ হইতে পারে সে কথা বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। বাস্তবিক এটা একটা আশ্চর্য্যের কথা—কেন যে লোক সংসারের এত সব কাজ কর্ম্ম থাকিতে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা জগতের কোন উপকার হইয়াছে বা হইতে পারে বলিয়া ত সহজে বোঝা যায় না। তবে কেন এই নিরর্থক চুলচেরা বিচার, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক, বৌদ্ধিক ব্যায়ামের ছেলে খেলা—মস্তিষ্কের অপব্যবহার ও মানব বুদ্ধির অপব্যয়? অন্য যে কোন শাস্ত্রের জ্ঞানই জগতের কোন না কোন কাজে লাগিয়াছে, সমগ্র মানব জাতির ক্রমোন্নতির সহায় হইয়াছে। এ কথার প্রমাণ আমরা বিশেষভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায় দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের কতই না সুবিধা হইয়াছে। মানুষ দেশ কালের বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া তাহার যত সব গুপ্ত রহস্য জানিয়া লইতেছে। জীবনমৃত্যুকে আপনার অধীন করিবার চেষ্টাকেও ধৃষ্টতা মনে করিতেছে না। আর জ্ঞান রাজ্যের কোন্ প্রান্তে দর্শন শাস্ত্র তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভ তুলিয়া রাখিয়াছে, তাহা যদি খুঁজিয়া দেখিতে চাই তবে আমাদের অনুসন্ধানের ব্যর্থতাই শুধু আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলে। গুটিকতক অতিবুদ্ধিমান লোকের মস্তিষ্কবিকৃতি ছাড়া দর্শন শাস্ত্র অন্য কিছু করিতে পারিয়াছে বলিয়া সাধারণ লোকের চক্ষে পড়ে না।

প্রত্যেক জিনিষের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার বিচার করা উচিত। এক মাপকাঠিতে সকল জিনিষের বিচার চলে না। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। পুরাতন সংবাদপত্র ওজনদরে মুদীর দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে—কিন্তু কালিদাসের কাব্যের বিচার ঠিক ঐ রকম ভাবে চলে না। পুরাতন সংবাদপত্র দ্বারা জিনিষপত্র বাঁধিতে পারা যায়, ইহাতেই তাহার মাহাত্ম্য। কিন্তু কালিদাসের কাব্যের দ্বারা ঠিক ঐ কাজ চলে না বলিয়া তাহার কোন মূল্যই নাই একথা বলিতে পারা যায় না। এমন কি গণিত শাস্ত্রের কোন প্রশ্নের বিচার আমরা যে রকম ভাবে করিয়া থাকি, কবিতার বিচার সে রকম ভাবে চলে না। গণিত শাস্ত্র যার জন্য আছে, কবিতা তার জন্য নয়।

কোন জিনিষ মানুষের অভাব যে পরিমাণে দূর করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে তার

মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের নানা রকমের অভাব বোধ রহিয়া যাইতেছে। সেই অভাব পরিপূরণের জন্য বিভিন্ন রকমের পদার্থ আবশ্যক। বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির ফলে আমাদের অনেক ভৌতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই মাপকাঠি দিয়াই কি সব বিষয়ের বিচার করিতে পারি? শুধু ডাল ভাত রুটী মাখনের উপরই মানুষের জীবন নির্ভর করে না। ডাল ভাতের অভাব মানুষের কাছে খুবই কষ্টদায়ক তাহা স্বীকার করি, কিন্তু শুধু ডাল ভাত লইয়াই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিবে ইহা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না এবং যদি কেহ সেরূপভাবে সন্তুষ্ট থাকে তবে বুঝিতে হইবে সে এখনও মনুষ্যত্বের উচ্চভূমিতে উঠিতে পারে নাই। শারীরিক অভাব ও আরাম ছাড়াও মানুষের মানসিক অভাব ও শান্তি রহিয়াছে। আব মানুষের মনুষ্যত্ব শরীরের দিক দিয়া ততদূর নয়, যতদূর মনের দিক দিয়া। অনেকেই দর্শনের কোন মূল্য আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তাহার কারণ—মানুষের যে অভাব পূরণের জন্য দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সেই অভাববোধ এখনও হয় নাই।

মানুষ সংসারে নানারকমের অসামঞ্জস্য ও বিরোধ দেখিতে পায়। প্রেমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আশার সঙ্গে নৈরাশ্য—স্থিতির সঙ্গে গতি, একের সঙ্গে বহু, ভালর সঙ্গে মন্দ নিতান্ত 'অসঙ্গত' অবস্থায় লাগিয়া রহিয়াছে। এই অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য বা বিরোধই চরম বলিয়া মনের বুদ্ধি সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। এই আপাতদৃশ্যমান বিরোধের পশ্চাতে সামঞ্জস্য রহিয়াছে এই বিশ্বাসে সেই সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণা আসে—এই প্রেরণার ফলেই দর্শনের উৎপত্তি। আমাদের বুদ্ধি সর্ব্বদাই সামঞ্জস্য শৃঙ্খলা দেখিতে চায়; তাহার অভাব শান্তভাবে সহ্য করিয়া যাওয়া বুদ্ধির স্বভাব নয়। সংসারে যাহা দেখি তাহাতে নানা রকমের অসামঞ্জস্য আছে বলিয়াই তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চায় না। তাই সত্যের সন্ধানে ধাবিত হয়। এই সত্যের অনুসন্ধানের নামই দর্শন। সাধু ঋষি বা কবি অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি বা সব বিরোধের সমাধান করিয়া থাকেন। দার্শনিক ঠিক সেই কাজই বুদ্ধির সাহায্যে করিতে চান। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও আংশিকভাবে তাহাই। কোন নিয়ম বা তত্ত্বের সাহায্যে পরস্পরবিরুদ্ধ বহুত্বময় বিষয় সমূহের ঐক্য সাধনই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য; ব্যোমযান, বিনাতারে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ইহার অবান্তর ফলমাত্র। বিশেষ বিশেষ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োগাদির সাহায্যে বিজ্ঞান যাহা করিতে চায় দর্শনশাস্ত্র কেবল বুদ্ধির সাহায্যে সমগ্র বিশ্বকে লইয়া ঠিক তাহাই করিতে চায়। অতএব দেখা গেল আমাদের জ্ঞানের মধ্যে আমরা যে সব বিরোধ দেখিতে পাই, তাহার সমাধানের উদ্দেশ্যেই দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। আমরা যাহা দেখি বা শুনি তাহাতে যদি কোনপ্রকার বিরোধের আভাস পাওয়া না যাইত তবে আমাদের দর্শনালোচনায় কোন প্রবৃত্তিই আসিত না। এই বিরোধের সন্তোষজনক সমাধানেই দর্শনের সার্থকতা।

এই বিরোধ সমাধানের চেষ্টায় দর্শন বিশ্বের মূলতত্ত্বে উপস্থিত হইতে চায় এবং সেই তত্ত্বের সাহায্যেই আপাত দৃষ্টিতে যে সব বিষয় পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় তাহার সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় কখনই সত্য হইতে

পারে না—কোন বস্তুই হাঁ ও না কে বুকে লইয়া টিকিতে পারে না। সুতরাং যখন আমরা আমাদের জ্ঞানে কোন রকমের বিরোধাভাস দেখিতে পাই তখন আমরা ভাবিয়া থাকি এই বিরোধ কখনই শেষ কথা হইতে পারে না। প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিলে এখন যে সব বিষয় আমাদের কাছে পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া লাগিতেছে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। আমরা যদি বিশ্বের মূলতত্ত্ব যথাযথভাবে জানিতে পারি তবে সমস্ত বিরোধের—আমাদের সব প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে। দর্শনের উপাসক সকলেই সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রার্থী। কিন্তু সেই তত্ত্ব এক কিংবা বহু সেই সম্বন্ধে প্রথমেই কোন কথা বলিতে পারা যায় না। তবে একথা সত্য সে তত্ত্ব অত্যন্ত ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। এমন কিছু থাকা উচিত না যাহা সেই তত্ত্বাধীন হইবে না—যাহা সেই তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বা কোন প্রকারে সেই তত্ত্বের সহিত সম্বদ্ধ হইবে না। এই তত্ত্বের বাহিরে যদি কিছু থাকে তবে শুধু এই তত্ত্ব দ্বারা সব বিরোধ মিটাইতে পারিবনা। কেননা সেই বাহিরের বস্তুর এই তত্ত্বের সহিত বিরোধ থাকিতে পারে বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। সেই বিরোধের সমাধানের জন্য আমাদের অন্য তত্ত্বের আশ্রয় লইতে হইবে।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি দর্শনশাস্ত্র যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হয় বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা যদি সত্য হয় তবে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই দর্শনশাস্ত্রের বিষয় হইয়া পড়ে। বিশ্বের মূলতত্ত্ব যখন ইহার অনুসন্ধানের বিষয় তখন সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এমন কোন বিষয় থাকিবে না যাহা ইহার বাহিরে পড়িতে পারে। বিশ্বের মূলতত্ত্ব এই কথার অর্থ হইতেই বোঝা যায় জগতে যাহা কিছু আছে তাহার মূলে এই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। এই তত্ত্ব হইতে কোন পদার্থ যদি বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া যায় তবে আমাদের দর্শন চর্চ্চার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই তত্ত্ব জ্ঞান আমরা চক্ষুকর্ণের সাহায্যে লাভ করিতে পারি না, মুখ্যত বিচারের সাহায্যেই এই তত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। সংসারে আছে বলিয়া যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাই আমাদের বিচারের সামগ্রী। যাহা কিছু আছে তাহাই এই তত্ত্বের সহিত অতি ঘনিষ্ট ভাবে সম্বদ্ধ; সুতরাং অন্তিম তত্ত্ব যখন সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা জানিতে পারি না, তখন তাহার সহিত সম্বদ্ধ জগতে যাবতীয় পদার্থের আলোচনা দ্বারাই তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে সত্য বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারিব না। হস্তী সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার সমস্ত অবয়ব আমাদের দেখা আবশ্যক। শরীরের অংশ বিশেষ দেখিয়া আমরা কখনই হস্তী সম্বন্ধে ঠিক ঠিক কল্পনা করিতে পারিব না।

অন্য উপায়েও তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারা যাইতে পারে। আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা বিষয় হইতে অনুমান ও বিচারের সাহায্যে মূল তত্ত্বে উপস্থিত না হইয়া প্রথমেই আমরা হয়ত উচ্চাঙ্গের কল্পনা বা অসাধারণ কোন অনুভূতির সাহায্যে মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যের জন্য শুধু সেই তত্ত্ব ভূমিতে অবস্থান না করিয়া আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়সমূহে নামিয়া আসিতে হয়। যতক্ষণ

পর্য্যন্ত আমরা আমাদের কল্পনা প্রসূত কিংবা অনুভূতিলব্ধ তত্ত্বের সহিত আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়সমূহের সম্বন্ধ দেখাইতে বা বুঝিতে না পারিব, ততক্ষণ আমাদের তত্ত্ব জ্ঞান সত্য কিংবা মিথ্যা, কিছুই বলিতে পারা যাইবে না। সুতরাং শেষোক্ত উপায়েও মূল তত্ত্বের দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জগতের যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা দরকার; দৃশ্য জগতের অন্তর্গত পদার্থ সমূহের সহিত এই তত্ত্বের সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য দেখাইতে না পারিলে দর্শনের কাজই সমাধা হয় না।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম—বিশ্বের মূলতত্ত্বই দর্শনের উপলব্ধির বিষয়। জগতের চরম সত্যবস্তু কি দর্শন তাহাই জানিতে চায়; এবং সেই জন্য জগতে যাহা কিছু আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় সেই সমুদায়ের আলোচনা দর্শনশাস্ত্রে করিতে হয়। আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মত অতি দূরবর্ত্তী পদার্থ—মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার মত অতি নিকটবর্ত্তী বস্তু—সকলই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। আকাশ ও কালের মত অতি ব্যাপক পদার্থ হইতে ধূলিকণার মত অতিক্ষুদ্র নিমেষের মত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী পদার্থ পর্য্যন্ত কোন কিছুর প্রতিই দর্শন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারে না।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাই জগতের নানা বিভাগের তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাপৃত আছে। এই বিজ্ঞানের উপর আবার দর্শনের আবশ্যকতা কি? আর যে রকম জ্ঞান দর্শনশাস্ত্র লাভ করিতে চায় তাহা কি কখনও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর?

বিভিন্ন বিজ্ঞান শাস্ত্র খণ্ডশঃ বিশ্বের আলোচনা করিয়া থাকে, সমস্ত দিক্ দিয়া সমস্ত বিশ্বের তত্ত্বনির্দ্ধারণ কোন বিজ্ঞানেরই উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তা বলিয়া দর্শনকে বিজ্ঞান সমষ্টিও বলা চলে না। বিভিন্ন বিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সব সময় সামঞ্জস্য নাও থাকিতে পারে। তার উপর প্রত্যেক বিজ্ঞানেই কতকগুলি বিষয় গৃহীত বলিয়া ধরিয়া লওয়া থাকে। ঐসকল গৃহীত বিষয়ের উপরই তাহাদের সব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু তাহাদের বিচার সেই সেই বিজ্ঞান শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। দর্শনশাস্ত্র ঐসব গৃহীত বিষয়গুলিরও বিচার করিয়া থাকে। আর এমনও অনেক বিষয় আছে যাহা কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রেই স্থান পায় নাই, সেই সবের আলোচনা দর্শনে থাকিতে পারে। সব বিজ্ঞানই পরাক্ বা বাহিরের বস্তু লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে—প্রত্যক্ অথবা ভিতরকার বিষয়সমূহের বিচার বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানে আমরা কি করিয়া কি ঘটে—তাহা জানিতে পারি। বৈজ্ঞানিক নিয়মের অর্থই তাই। কেন ঐরকম ঘটে তাহার উত্তর বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। দর্শন সে উত্তর দিবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞান যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রয়োগ করিয়া তাহার সত্য পরীক্ষা করিয়া থাকে, দর্শন শুধু যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে তত্ত্ব নির্ণয় করে। বিশ্বের মূল তত্ত্ব কি—যাহার সাহায্যে মানুষ তাহার জীবনের সব প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে—সত্তা হিসাবে বা জ্ঞান হিসাবে যাহা কিছু আছে সেই সমস্তের কারণ বা আধারস্বরূপ এমন তত্ত্ব কি—ইহার উত্তর কোন বিজ্ঞানই দিবার চেষ্টা করে না। শুধু দর্শনেই এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সুতরাং দেখা গেল দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য উপায় আলোচ্যবিষয় বা

ক্ষেত্র—সবই ভিন্ন। মানুষের যে অভাব বিজ্ঞান পূরণ করিতে পারে না দর্শন সে অভাব পূরণের চেষ্টা করে বলিয়াই দর্শনের সার্থকতা।

কিন্তু জগতের যাবতীয় বিষয় আলোচনার ফলেই যে দর্শনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে সে দর্শন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর? এমন কেহ এখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই যিনি জগতের প্রত্যেক বিষয়ই জানেন। সর্ব্বজ্ঞতা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। তবে কি দর্শন একটা অত্যন্ত অবাস্তব আদর্শের পশ্চাতে ছুটিয়াছে?

কোন এক ব্যক্তির পক্ষে সব বিষয় জানা সম্ভবপর না হইলেও অনেকের দ্বারাতে সম্ভবপর হইতে পারে? যিনি দার্শনিক হইবেন, তিনিত বিভিন্ন বিষয়বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইতে পারেন। অথবা অনেকে মিলিয়া একত্রে দর্শনের মঠ গড়িয়া তুলিতে পারেন। আজকাল তাই দর্শনেও অনেককে যৌথ চর্চ্চার আশ্রয় লইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তার উপর সব বিষয়ই যে তাহাদের বৈশিষ্ট্যের সহিত জানিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। জাতির জ্ঞান থাকিলে তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে না জানিলেও চলিতে পারে। সাধারণভাবে সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুর প্রকার বা রকম যদি জানিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের চলিবে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দর্শনের পক্ষে এই রকম জ্ঞানই যথেষ্ট। মাটী কি পদার্থ জানিতে হইলে সংসারে যত মাটী আছে তার সবই পরীক্ষা করিতে হইবে এমন নয়, একখণ্ড মাটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই চলে।

তার উপর যদিও একথা সত্য যে জগৎ আমাদের কোন ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানসাপেক্ষ নহে—জগতের কোন বস্তুরই থাকা না থাকা বা অস্তিত্ব কোন দার্শনিকেরই জানা না জানা বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। এমন অনেক বস্তু থাকিতে পারে—এবং আছেও—যাহা আমরা জানি না বা কখনই জানিতে পারিব না তথাপি আমাদের প্রত্যেকের জগৎ সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে—একথা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। জগৎকে আমরা জানি বলিয়াই আছে বলিতে পারি। এই জগতের স্বগত অস্তিত্ব যতই আমাদের জ্ঞাননিরপেক্ষ হউক না কেন ইহার অস্তিত্বের প্রকাশ আমাদের জ্ঞানের ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে। আমরা এমন কোন পদার্থ আছে বলিয়া চলিতে পারি না যাহার সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। কোন বস্তু আছে বলিয়া স্থির করিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা চাই ই চাই। আছে বলিতে গেলেই কি আছে জানা আবশ্যক যতক্ষণ কি সেটা—তাহার স্বরূপ কি—আমরা জানিতে না পারি ততক্ষণ সেটা আছে কি না আছে—তাও বলিতে পারি না। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় আমাদের জগৎ আমাদের জ্ঞানের সীমার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সীমা অতিক্রম করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমরা যে জগৎ জানিতেছি তাহার উপরই আমাদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে। অজানা—অজ্ঞেয় বা অজ্ঞাত-বিষয় সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানরাজ্যের মধ্যেই যে সব বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, দর্শনশাস্ত্র তাহারই সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে পারে। অজ্ঞেয় রাজ্যের কোন বার্ত্তা দর্শনের পক্ষে আনিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমাদের পক্ষে যে জগৎটা আছে তাহা আমাদের জ্ঞানেই আছে। যাহা

আমাদের জ্ঞানে নাই তাহা আছে বলিয়াও আমরা জানি না। তার সম্বন্ধে আমরা কোন বিচারও করিতে পারি না। আমাদের জ্ঞান জগৎ লইয়াই আমাদের বিশ্ব এবং এই বিশ্বের কোন অংশই আমাদের অজ্ঞাত নাই, এরই উপরে আমাদের দর্শনের কাঠাম গড়িয়া থাকি। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞানের অভাব আমাদের দর্শনালোচনা না করার কোন কারণ হইতে পারে না।

কিন্তু বাস্তব জগৎ ও আমাদের জ্ঞানজগৎ ত সমান মাপের নয়। দিন দিনই আমরা নূতন জ্ঞান লাভ করিতেছি। যখন নূতন কোন বিষয় জানি তখন সেটা 'নাই' হইতে হঠাৎ 'আছে' হইয়া পড়ে এমন নয়। যাহা ছিল বা আছে তাহাই জানিয়া থাকি। আমাদের দর্শন শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানরাজ্যের কথা কহিবে এমনত নয়; বাস্তব জগতের কথা আমরা জানিতে চাই। দার্শনিকের মনোরাজ্যের ইতিহাস বা বিবরণের দ্বারা আমাদের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সেই বাস্তব জগতের পরিসর কোন ব্যক্তির জ্ঞানের পরিধিব অন্তর্ভুক্ত হইবার নয়।

একথা সত্য আমাদের অজানা অনেক কিছু সংসারে আছে—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের জানার শেষ হইবে না। তবুও যখন আমরা আমাদের নিজেদের জ্ঞানের সাক্ষ্য লইয়া দর্শনের প্রতিমা গড়িয়া থাকি তখন আমাদের এই বিশ্বাস থাকে যে অপরের জ্ঞানও আমাদের জ্ঞানের মতই হইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অনুযায়ী হইবে। এই রকম বিশ্বাসই আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ভিত্তি। আমি যাহা লাল বলিয়া বুঝি আমার বন্ধু যদি তাহা কাল বলিয়া বুঝেন তাহা হইলে কোন কথা বলাই চলে না। আজ আমরা জগৎকে যে রকম ভাবে বুঝিতেছি কাল যদি তাহা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে কোন বিষয়ে কোন সাধারণ সত্যে পৌছিতে পারা যায় না। আমাদের অভিজ্ঞতার কোন অর্থ থাকে না—দর্শন বিজ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ আমি যাহা লাল বলিয়া বুঝি আমার বন্ধুও লাল বলিতে ঠিক তাহাই বুঝেন ইহা নির্ণয় করা দর্শন বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত। আমাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের প্রামাণ্য রক্ষা করিয়া চলিবে তাহাও নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে দার্শনিকের দৃষ্টিতে বলিতে পারা যায় না। সকলেই নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী দর্শন গড়িয়া তুলেন কিন্তু যদি অন্যান্য সব বিষয় সমান হয় তবে যাহার জ্ঞানের পরিসর যত বেশী তাহার দর্শনই সব চেয়ে বেশী আদরণীয় হয়। তবে যিনি যতই জ্ঞানী হউন না কেন ত্রিকালবিধিত সত্য তাঁহার দর্শনে পাওয়া যাইবে এমন কথা বলিতে পারা যাইবে না। হইতে পারে তিনি এমন সত্য জানিয়াছেন যাহা কখনই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে না কিন্তু যতদিন না আমাদের ভবিষ্যতের শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার ক্ষমতা হইয়াছে ততদিন সেকথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিব না। বর্ত্তমানে থাকিয়া ত্রিকালবিধিত রূপে কোন কথা জানা অসম্ভব। সব জ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। দর্শন সম্বন্ধেও একথা খুব দোষের নয়। ব্যক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং খুব উচ্চ দৃষ্টিতে বর্ত্তমান জ্ঞানের সন্দিগ্ধতাই জ্ঞান জীবনের প্রাণ। আমাদের যদি তৃতীয় নেত্র লাভ হইত—ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এক

দৃষ্টিতে নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যক্ষ ভাবে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে জীবনে আমাদের কোন প্রশ্ন থাকিত না—সংশয় থাকিত না—নিয়ত গতিশীল জ্ঞানের রথ আপনা হইতেই হঠাৎ থামিয়া যাইত। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাসবিহারী দাস।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(১২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতে 'রাজসিংহ'ই তাঁহার একমাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। সুতরাং তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শসম্বন্ধে কি ধারণা ছিল তাহা 'রাজসিংহ' হইতে বুঝা যাইবে। 'রাজসিংহের' চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনটী বিশ্লেষণ করিলে এ বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্কলন করা যাইতে পারে। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে প্রধান উদ্দেশ্য, হিন্দুদের যে বাহুবলের অভাব ছিল না এই বিষয়ের প্রতিপাদন করা। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক বিবরণের অভাবের ও ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতিত্বদোষের জন্য বঙ্কিম উপন্যাসের আশ্রয় লইয়াছেন; কারণ যদিও সর্ব্বত্র ইতিহাসের উদ্দেশ্য উপন্যাসের দ্বারা সুসিদ্ধ হয় না, তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ কোন প্রতিবন্ধক নাই, "যখন বাহুবলমাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।"

বঙ্কিমের এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা একটু দুরূহ। রাজপুতদের বাহুবলপ্রতিপাদনবিষয়ে উপন্যাস কেন ইতিহাসের উদ্দেশ্যসাধনক্ষম, তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই; বিশেষতঃ এই সম্বন্ধেই ঐতিহাসিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধিতার বিষয় বঙ্কিম নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, ও এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী প্রমাণসমূহের মধ্যে সত্যনির্ণয়ের দুঃসাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রকার বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য তাহা উপন্যাসের পক্ষে কেন সহজসাধ্য হইবে, উপন্যাস এই সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থিকে কিরূপে সরল করিবে, লেখক তাহার কোন বিশদ ব্যাখ্যা দেন নাই। ইতিহাসের উপর উপন্যাসের এক মাত্র শ্রেষ্ঠত্ব এই যে ইহা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, ইহা সত্যের বন্ধন হইতে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন; কিন্তু এই কল্পনাকে ইতিহাস ক্ষেত্রে দুই প্রকারে প্রয়োগ করা যায়; ইহা লেখককে ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের অপ্রীতিকর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতিলাভের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে, অথবা ইহা একপ্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ইতিহাসের পরস্পরবিরোধী জটিল

উক্তিসমূহ ভেদ করিয়া তাহার মর্ম্মগত সত্যে গিয়া হাত দিতে পারে। এখানে বঙ্কিম তাঁহার কল্পনার কিরূপ ব্যবহার করিতে চাহেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে; হিন্দুদের বাহুবলের যদি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকে, তবে কল্পনার সাহায্যে তাহার প্রতিপাদন করিতে গেলে কল্পনার আশ্রয়ের কাল্পনিকতার প্রশ্রয়ে পরিণত হইবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। বোধ হয় বঙ্কিমের উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম এই যে রাজপুতদের বাহুবল এতই সুপরিচিত ব্যাপার যে এক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় লওয়া তাদৃশ দূষনীয় নহে; কেননা এখানে অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক, কল্পনা ও ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে ব্যবধান নিতান্ত অল্প হইবারই সম্ভাবনা।

রাজপুতদের বাহুবল প্রতিপাদন যদি 'রাজসিংহে' বঙ্কিমের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়; তবে তাহা উপন্যাসের প্রকৃত ভিত্তি হইতে পারে কি না সে বিষয়েও সন্দেহের অবসর আছে, কেননা এরূপ একটা সঙ্কীর্ণ ও পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য ঠিক উচ্চতম আর্টের পক্ষে অনুকূল নহে। অবশ্য এই উদ্দেশ্য বঙ্কিমের কবি-কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার যুদ্ধবর্ণনাগুলির উপর একটা তীব্রতা ও কল্পনা গৌরব আনিয়া দিয়াছে সত্য; কিন্তু সত্য চিত্রণ, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক সত্য-নির্দ্ধারণ যে উপন্যাসের আদর্শ, তাহার সহিত এইরূপ সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের সুসঙ্গতি হইতে পারে না। বোধ হয় এখানে বঙ্কিম নিজ প্রতিভার প্রতি অবিচার করিয়াছেন; রাজপুতদের বাহুবলপ্রতিপাদন করা সম্বন্ধে তাঁহার যতই প্রবল ইচ্ছা থাক, তিনি সে ইচ্ছাকে কলাকৌশলের দ্বারা নিয়মিত ও সংযত করিয়াছেন, কোথাও কলা-সৌন্দর্য্যের ও সুসঙ্গতির সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে দেন নাই। স্থানে স্থানে মুসলমানের বিরুদ্ধে একটু অযথা তীব্র সমালোচনা, একটু অসঙ্গত ও অশোভন বিদ্বেষ উদ্গীরণ ভিন্ন অন্য কোথাও এই উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয় নাই; আর পরিস্ফুট হইলেও লেখক অসাধারণ দক্ষতার সহিত ইহাকে একটী অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, মানুষের চিরন্তন হৃদয়স্পন্দনের সহিত ইহার গতিবেগকে মিশাইয়া দিয়াছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে কল্পনার ক্রিয়া কতদূর প্রসারিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিমত আধুনিক সমালোচনার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। এবিষয়ে কল্পনার ক্রিয়ার সীমারেখা বঙ্কিম বেশ সুস্পষ্টভাবেই নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের মূল সত্যকে অবিকৃত রাখিতে বাধ্য; তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাপারে কল্পনা আপনার স্বাধীনতা দেখাইতে পারে। ইতিহাসের কার্য্যকারণপরম্পরা যেখানে যথেষ্ট পরিস্ফুট নহে, কল্পনা সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নূতন যোগসূত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ স্ফুটতর করিয়া তুলিতে পারে; ইতিহাসের যে সমস্ত ঘটনা আকস্মিক, তাহাদিগকে মানব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে পারে ইতিহাসকে dramatic, বা নাটকীয় উপযোগিতা মণ্ডিত করিবার জন্য তাহার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রসকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতে পারে। বঙ্কিম রাজসিংহে এই জাতীয় রূপান্তর সাধনের উদাহরণ দিয়াছেন। যুদ্ধের ফলাদি স্থূল ঘটনা অবিকৃত রাখিয়াছেন, তবে তাহার নূতন প্রকরণ বা নূতন উদ্দেশ্য কল্পনার দ্বারা গড়িয়া দিয়াছেন; ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি অবিকৃত রাখিয়াছেন, তবে ইহাদিগকে কাল্পনিক

দৃশ্যের মধ্যে ফেলিয়া ইহাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য স্ফুটতর করিয়াছেন; যেখানে একই ঘটনা সম্বন্ধে দুই বা ততোধিক বিবরণ প্রচলিত আছে, সেখানে নাটকীয় উপযোগিতার হিসাবেই তাঁহার নিজের নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। এ সমস্তই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা; ঐতিহাসিক উপন্যাস-কার ইতিহাসের বৃহত্তর সাধারণ সত্য দেখাইতেই বাধ্য; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা না দিলে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে কোন ভেদ থাকিতে পারে না। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বিবেক (historical conscience) বা সত্যনিষ্ঠা যে ইউরোপীয় উপন্যাসিকদের অপেক্ষা কম এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রামাণিক সত্যের অংশ যে পরিমাণে কম, কল্পনার প্রসার ঠিক সেই পরিমাণেই বেশী হইতে বাধ্য, নচেৎ একটী পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা গড়িয়া উঠিতে পারে না। বঙ্কিম তাঁহার কাল্পনিক চিত্রের দ্বারা ইতিহাসের শূন্যরন্ধ্র পূরণ করিয়া যদি অতিসাহসের পরিচয় দিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অপরিহার্য্য।

'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম' হইতে মূলতঃ ভিন্ন। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে ইতিহাস কেবল একটা প্রতিবেশরচনায় সহায়তা করিয়াছিল মাত্র; তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার আলোচনা। ঐতিহাসিক বিপ্লব আসিয়া এই ব্যক্তিগত সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে সত্য, তথাপি মোটের উপর এই সমস্ত উপন্যাসে ইতিহাস অপ্রধান অংশ অধিকার করে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ঐতিহাসিক প্রতিবেশ উপন্যাসের অনেক অংশ ব্যাপিয়া আছে; এবং নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়াছে সত্য: কিন্তু তথাপি ইহার প্রধান ব্যাপার ব্যক্তিগত জীবনের বাধা-বিঘ্ন-ঘটিত প্রণয় লইয়া। 'চন্দ্রশেখর' ও 'সীতারামে'ও ইতিহাসের এই দূরত্ব ও অপ্রধানতা সহজেই লক্ষিত হয়; শৈবলিনীর ও সীতারামের চরিত্রবিশ্লেষণই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ 'সীতারামে' সীতারামের অন্তর্দ্বন্দ্বই উপন্যাসের প্রধান বিষয়; তাহার রাজনৈতিক অধঃপতন নৈতিক অধঃপতনের পরোক্ষ ফল মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 'রাজসিংহে' ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত; এখানে ইতিহাসই প্রধান বিষয়, ব্যক্তিগত জীবন সমস্যা ইতিহাসের অনুবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র। উপন্যাসের মূল ব্যাপার হইতেছে রাজসিংহের সহিত আরঙ্গজেবের মহাযুদ্ধের বর্ণনা, তবে লেখক এই যুদ্ধের কেবল রাজনৈতিক ফলাফল নির্দ্দেশ না করিয়া, ব্যক্তিগত জীবনের উপর ইহার প্রভাব দেখাইয়াছেন, এই যুদ্ধের মহাবর্ত্তে পড়িয়া যে কয়েকটী প্রাণী পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মানসিক সংঘর্ষ ও পরিবর্ত্তনের চিত্রটিও উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

সুতরাং 'রাজসিংহে' ঐতিহাসিক অংশেরই প্রাধান্য; ইতিহাস এখানে পারিবারিক জীবনের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত, অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে; মানুষের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের উপর বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় একটা বজ্র-কঠোর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে ইতিহাস কেবল একটা

সুদূর দিগন্তরেখার ন্যায় পারিবারিক জীবনকে বেষ্টন করিয়াছে মাত্র ; তাহার স্বাধীনতার গৌরবকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে নাই ; যদিও সময় সময় ইতিহাস-সমুদ্রের দুই একটা প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রতিহত হইয়াছে, ও আমাদের শান্ত জীবনে একটা প্রলয়-বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, তথাপি মোটের উপর ইহার সুদূর অস্পষ্ট কল্লোল ব্যতীত ইহার অস্তিত্বের আর কোন স্পষ্টতর পরিচয় আমাদের গোচর হয় নাই। রাজসিংহে ইতিহাস তাহার উদাসীন দূরত্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে অতিসন্নিহিত পড়িয়াছে ও আমাদের পারিবারিক জীবনকে প্রায় স্পর্শ করিয়াছে, তাহার উষ্ণ নিশ্বাস আমাদের শরীরে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি, রক্তের মধ্যে একটা দ্রুততর স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে। আমাদের সাধারণ মনোবৃত্তি সমূহ, আমাদের প্রেম, ঈর্ষ্যা, বন্ধুত্ব প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের অভিনেতৃবর্গ ইতিহাসের ভ্রূকুটী-কুটিল দৃষ্টির তলে, ইতিহাসের নির্ম্মম অঙ্গুলি-সংকেত চালিত হইয়া একটা অলঙ্ঘনীয় প্রয়োজনের পেষণে আপন আপন অংশ অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই অসাধারণ তীব্র প্রভাবের বশে আমাদের সাধারণ জীবন তাহার সহজ-সরল স্বাধীনতা ও প্রসার হারাইয়া আপনার বিকাশকে ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছে, ও তীব্রতর গতিবেগের দ্বারা এই অপরিহার্য্য সঙ্কীর্ণতার অসুবিধা পূরণক রিয়াছে।

'রাজসিংহ' উপন্যাসটীকে মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ হিসাবে দেখিতে গেলে পদে পদে এই স্বাধীনতাসঙ্কোচের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম বিষয়-নির্ব্বাচনে। রাজসিংহের বৃহত্তব সংঘটনের মধ্যে, ইহার যুগান্তরকারী বিপ্লবের ভিতর সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষের কোন স্থান নাই। যাহারা শ্যামল সমভূমিতে বৃক্ষছায়াশীতল প্রদেশের পর্ণকুটীরে নিজ নিজ শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা এই উপন্যাসের জগতে প্রবেশাধিকার পায় নাই ; ইহার পাত্র-পাত্রীরা সকলেই উচ্চপদস্থ, সকলেই রাজনৈতিক আবর্ত্তের বিক্ষোভ-বিকম্পিত প্রদেশে, ইতিহাসের বজ্রমুষ্টির দুর্নিবার আকর্ষণপরিধির মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে সমস্ত নিম্ন-উপত্যকা-বাসী ক্ষুদ্র বৃক্ষ তাহাদের ক্ষুদ্রত্বের জন্যই কাল-বৈশাখীর হাত এড়াইয়া যায়, তাহাদের জন্য এই উপন্যাসের কোন প্রয়োজন নাই ; পরন্তু যে সমস্ত মহা-মহীরুহ উত্তুঙ্গ-পর্ব্বত-শৃঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রলয় ঝটিকার দুর্দ্ধর্ষবেগকে আহ্বান করে ও তাহার দ্বারা বিধ্বস্ত বিদলিত হয় তাহারাই এই উপন্যাস জগতের অধিবাসী। চঞ্চলকুমারী রাজকন্যা, নিজে আভিজাত্য-গর্ব্ব-গৌরবান্বিতা, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাধিরাজের সংঘর্ষের উপযুক্ত হেতু ও যোগ্য পুরস্কার। নির্ম্মলকুমারী বংশ-গৌরবে সামান্যা হইয়াও নিজ বুদ্ধি ও সাহস প্রভাবে এই রাজনৈতিক সংক্ষোভের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার বিবাহিত জীবন কোন্ অতল সমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে ; সে রাজপুতকুল-গৌরবের প্রতিনিধি হইয়া সগৌরবে ও অভ্রান্ত পদক্ষেপে রাজনৈতিক জগতের বন্ধুর পিচ্ছিল রক্তপথে বিচরণ করিয়াছে, ও স্বয়ং বাদশাহের সম্মুখীন হইয়া বাগ্‌বৈভবে ও চাতুর্য্যে তাঁহাকে নিরস্ত্র নিরাকৃত করিয়াছে। দরীব দরিয়া, কেবল সংবাদবিক্রেত্রী বলিয়া নহে, আরও উচ্চতর, শ্লাঘ্যতর অধিকারে, শাহজাদীর প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে, রংমহালের বহ্নিজ্বালাময় প্রাসাদ-সমূহে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কেবল

এক মাণিকলালই, তাহার অভাবনীয় রূপান্তর ও উচ্চপদে আরোহণ সত্ত্বেও, স্বভাব-সিদ্ধ ধূর্ত্ততার জন্যই তাহার plebeian originএর চিহ্ন রাখিয়াছে, সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে দেয় নাই।

আবার অন্য দিক্ দিয়াও ইতিহাস পারিবারিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে, ও তাহার তুচ্ছতম ব্যাপারের সহিত একান্ত অপ্রত্যাশিত কঠোর পরিণতির সংযোগ স্থাপন করিয়া দিয়াছে। চঞ্চলকুমারীর একটা নিতান্ত তুচ্ছ কার্য্য, একটা সামান্য বালিকাসুলভ চাপল্য দুই জাতির মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছে; যে আকাশ বাতাসে দাহ্য পদার্থ স্তূপীভূত হইয়া আছে, সেখানে একটা তুচ্ছ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রলয়ানল জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। পারিবারিক জীবনে যাহা সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—বিবাহ—এই বিদ্যুদগ্নিগর্ভ আকাশের তলে তাহার এক মুহূর্ত্তেই সমাধান হইতেছে; প্রেম নিতান্ত অনুগত অনুচরের ন্যায় দেশভক্তি বা রাজনৈতিক প্রয়োজনের অনুসরণ করিতেছে। চঞ্চলকুমারীর রাজসিংহের প্রতি যে অনুরাগ তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপার খুব কমই আছে; তাহা মূলতঃ স্বজাতি-প্রীতির একটা উচ্ছ্বসিত বিকাশ মাত্র; তাহা প্রণয়ীকে আত্মসমর্পণ নহে, বীরের পদে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি। নির্ম্মলকুমারীর বিবাহ ত একটা যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত আনুসঙ্গিক ফল মাত্র। এই রাজনীতির oxygenপূর্ণ বাতাসে অতি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সকল এক মুহূর্ত্তে সংসাধিত হইতেছে; দস্যু দেশ-ভক্ত ও যুদ্ধকুশল সেনানীতে পরিণত হইতেছে; শ্রদ্ধা প্রেমে রূপান্তরিত হইতেছে, ও এই প্রেম রমণীসুলভ লজ্জাসঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া, প্রত্যাখ্যানভয়শূন্য হইয়া প্রেমাস্পদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতেছে; নির্ম্মম প্রয়োজন ইচ্ছাকে বশীভূত করিয়া মুহূর্ত্তেকের পরিচিতের জন্য বরমাল্য রচনা করিতেছে। বিশেষতঃ রাজসিংহের সপ্তম খণ্ড হইতে প্রায় অবিমিশ্র ঐতিহাসিক কাহিনী গ্রন্থকে ব্যাপ্ত করিয়া কল্পনাপ্রসূত উপন্যাসকে সবলে ঠেলিয়া দিয়াছে; আরঙ্গজেব পার্ব্বত্য রন্ধ্রপথে প্রবেশ করার পর ইতিহাসেরই প্রায় একাধিপত্য; সেনার কোলাহলে, দ্রুত-সঞ্চারী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানবের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রায় নীরব হইয়া গিয়াছে। বিপুল ইতিহাস ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনকে প্রায় গ্রাস করিয়া লইয়াছে। আরঙ্গজেব রাজসিংহ ইহারাও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটেনই; কল্পনাপ্রসূত চরিত্রগুলিও—চঞ্চল, নির্ম্মল, মাণিকলাল-প্রভৃতি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া ঐতিহাসিক কোলাহলের মধ্যে নিজ নিজ কণ্ঠস্বর হারাইয়া ফেলিয়াছে, ও বৃহৎ ইতিহাস-যন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গমাত্রে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থের এই অংশকে ঠিক উপন্যাস না বলিয়া উদ্দীপনার ঘাতপ্রতিঘাত-চঞ্চল ইতিহাস-পৃষ্ঠা বলিলেও চলে। মোটকথা রাজসিংহ উপন্যাসে ইতিহাসের প্রবল আকর্ষণে আমাদের সাধারণ জীবন তাহার স্বভাব-মন্থর গতি হারাইয়া ঐতিহাসিক ঘটনার বেগবান্ প্রবাহের সহিত সমতালে চলিতে বাধ্য হইয়াছে।

অবশ্য এই ইতিহাসের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিম যে যুদ্ধ করেন নাই এমন নহে; ইতিহাসের গ্রাস হইতে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া-ছেন, এবং আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভও করিয়াছেন। যেখানে রাজনৈতিক কারণই আগুন জ্বালিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত, সেখানেও বঙ্কিম মানসিকসংঘর্ষজাত অগ্নিশিখার ক্রীড়া দেখাইতে

প্রয়াসী হইয়াছেন ; যেখানে রাজপুতের অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা ও মোগলের মদোদ্ধত, বলদৃপ্ত অত্যাচার বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানেও বঙ্কিম মানব চিত্তের স্বাধীন ক্রিয়া হইতেই প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপে তিনি ইতিহাসের সর্ব্বগ্রাসী একাধিপত্য হইতে মানবজীবনের স্বাধীনতা ও গৌরব বাঁচাইতে চাহিয়াছেন। আরংজীবের হিন্দুবেষিতা, যথেচ্ছাচার, জিজিয়া-কর-সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলকুমারীকৃত অপমানের প্রতিশোধস্পৃহাও তাহার কার্য্য করিয়াছে। অগ্নি জ্বালিবার ইন্ধনের মধ্যে বিক্রম-শোলাঙ্কির অভিশাপ ও জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীও স্থান পাইয়াছে। তা ছাড়া ইতিহাসের দারুণ নিষ্পেষণের মধ্যেও চরিত্রগুলি তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে হারায় নাই। চঞ্চল, নির্ম্মল ইহারা রাজনৈতিক যন্ত্রে ঘূর্ণিত হইয়াও তাহাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্খা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেয় নাই। দরিয়া সম্বন্ধে এই কথা আরও বিশিষ্টভাবে প্রযোজ্য, সে ইতিহাস-প্রবাহের মধ্যে এক উন্মত্ত একাগ্রতার সহিত, অভ্রান্তলক্ষ্যে আপন হৃদয়ের প্রণয়ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। স্বয়ং সম্রাট্ আওরেঙ্গজেবও সময় সময় নিজ উচ্চপদের মহিমা হইতে অবরোহণ করিয়া কুটিলতাবর্ম্মাবৃত হৃদয়ের রুদ্ধকপাট খুলিয়াছেন ও সাধারণ মানুষের ন্যায় আপন প্রাণের গভীর স্তরস্থ অতৃপ্তি ও ক্ষোভকে বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে উপন্যাসের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই ইতিহাস নাগপাশের মধ্যে মানব-হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন স্ফূরণ হইয়াছে মবারক-জেব-উন্নিসার প্রণয়কাহিনীতে। এইখানে বঙ্কিম ইতিহাসের বন্ধন কাটাইয়া উঠিয়া তাঁহার ঔপন্যাসিক প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন ; ইতিহাস এখানে মানব-হৃদয়-বিশ্লেষণকে অভিভূত না করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। মবারক রাজনৈতিক আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু সে কোথাও ইতিহাস-প্রবাহে নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীববৎ আপনাকে ভাসাইয়া দেয় নাই, তাহার নিজের স্বাধীন মনোবৃত্তিই প্রধানতঃ তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। জেব-উন্নিসার সহিত প্রথম প্রণয়-ব্যাপারে, মবারকের উৎপীড়িত বিবেক তাহার অবৈধ কলুষিত প্রেমের বিরুদ্ধে অন্ততঃ একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও করিয়াছে ; এবং তাহার পরবর্ত্তী জীবনের সমস্ত ভাগ্য বিপর্য্যয়কেও সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে। রূপনগরের যুদ্ধের পর জেব-উন্নিসাকে ত্যাগ, আবার পার্ব্বত্য যুদ্ধের পর দীনা, অনুতপ্তা সম্রাট্‌দুহিতাকে পুনর্গ্রহণ, স্বজাতিদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ নিশ্চিত মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া সম্রাট্ শিবিরে প্রতিগমন—এসমস্তই তাহার স্বাধীন ইচ্ছার ফল। ইতিহাসের পাষাণ প্রাচীর তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার স্বাধীন আত্মাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তাহার এই অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতার শেষ প্রমাণ এই যে রাজপুত মোগলের অনলোদ্গারী কামান রাশির মধ্যে যে অস্ত্র তাহাকে মৃত্যুমুখে পাঠাইল তাহা দরিয়াহস্তনিক্ষিপ্ত।

উপন্যাস মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছে জেব-উন্নিসার চরিত্রে। যেমন পর্ব্বতের কঠিন বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া যে নির্ঝরিণী নির্গত হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য আরও মনোহর, সেইরূপ ইতিহাসের পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধা জেব-উন্নিসার অন্তরের গোপন কাহিনীটী অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী, ও অনুপম মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। জেব-উন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্র : কিন্তু তাহার ঐতিহাসিকতাই তাহার প্রধান আকর্ষণ নহে, তাহার মধ্যে যে দুঃখজ্বালাপূর্ণ, প্রণয়াবেগশালী মানবহৃদয় আছে তাহাই তাহার মুখ্য পরিচয়। গ্রন্থারম্ভে জেবউন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্রহিসাবেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; সে সম্রাটের প্রিয় দুহিতা, সাম্রাজ্যশাসনে তাঁহার প্রধান সহায়, রঙ্ মহালের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। মবারক তাহার প্রণয়াস্পদ বটে, কিন্তু এই প্রেমকে সে একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া নিতান্ত উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছে—যৌবন প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া সে প্রেমের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। মবারকের বিবাহ প্রস্তাবকে সে অবজ্ঞার হাসিতে উড়াইয়া দিয়াছে ; প্রণয়ের মাহাত্ম্য সে প্রতিপদক্ষেপে অস্বীকার করিয়াছে ; শেষে প্রণয়ী

অপ্রাপ্য হইলে ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা অপেক্ষা বাদশাহজাদীর কুপিত অহঙ্কারই তাহাকে প্রেমাস্পদকে পিপীলিকার মত টিপিয়া মারিতে প্রণোদিত করিয়াছে। ইহার পরই অপমানিত, অস্বীকৃত, নির্ব্বাসিত প্রেম আপনার অনিবার্য্য দীপ্ততেজে তাহার হৃদয় মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার স্বাভাবিক মহিমার অবিসংবাদিত, অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিয়াছে; এই নবজাগ্রত প্রেম তাহাকে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য হইতে নির্ম্মমভাবে টানিয়া আনিয়া একান্ত রিক্ততার মাঝে দাঁড় করাইয়াছে; তাহার সর্ব্ব অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাহাকে প্রেমের অতি দীনা ও অনুতপ্তা পূজারিণীতে পরিণত করিয়াছে; তাহার শাহজাদীত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে সাধারণ মানবীর সমতলভূমিতে আনিয়া অধিষ্ঠিত করিয়াছে। তারপর সে আর ইতিহাসের ধার ধারে নাই, ইতিহাসের সমস্ত বিপর্যায়ের মাঝে সে আপন চিন্তায় নিমগ্না, আপন শোকে অধীরা, পূর্ব্বস্মৃতির বৃশ্চিকদংশনে কাতরা। পিতার অপমান ও পরাজয়, নিজ উচ্চাভিলাষের উন্মূলন, সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূচনা—এ সমস্ত আর তাহার চিন্তায় স্থান পায় নাই। সর্ব্বশেষে ইতিহাস আবার তাহার পুনর্লব্ধ প্রণয়ীকে তাহার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জীবনের উপর আর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই—তাহার ঐকান্তিক প্রেমের পরিসমাপ্তিকে এক মহাব্যর্থতার করুণ সুরে ভরিয়া দিয়াছে মাত্র।

'রাজসিংহে' এইরূপ দুই চারিটী দৃশ্য ছাড়া উপন্যাসোচিত গুণ খুব বেশী নাই। চরিত্র-বিশ্লেষণ যদি উপন্যাসের প্রাণ হয়, তবে রাজসিংহে তাহার অবসর অপেক্ষাকৃত কম। ইতিহাসের প্রবল স্রোতে চরিত্রের বিশেষত্ব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বিশাল সমুদ্র-মন্থনে যে রস উঠিয়াছে তাহা আমাদের সাধারণ জীবনের পক্ষে অতিশয় তীব্র; দুই যুদ্ধোদ্যত সৈন্যদলের মাঝে স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা চঞ্চলকুমারীর মুখে যে সমস্ত তেজঃপূর্ণ বাক্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা জীবনের বীরত্বপূর্ণ সন্ধিস্থলেরই উপযুক্ত; এই ভাব ব্যক্তিগত নহে, typical; সেইরূপ বাদসাহের নিকট নির্ম্মলকুমারীর সরস বাকপটুতা ও সতেজ নির্ভীকতাও তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্বের অপেক্ষা জাতির প্রতিনিধিত্বেরই অধিক সূচক। রাজসিংহে বিবৃত ঘটনাগুলি এতই বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক যে পাঠকের মন চরিত্রবিশ্লেষণের দাবী করিতে ভুলিয়া যায়; আর এরূপ রোমাঞ্চকর সংঘটনের মধ্যে চরিত্রের উচিত বিকাশ ও পরিণতিও অসম্ভব। সুতরাং সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে 'রাজসিংহের' মধ্যে উপন্যাসোচিতগুণের অপেক্ষাকৃত অভাব লক্ষিত হইবে। কিন্তু কেবল আখ্যায়িকা হিসাবে, একটা জাতি-সংঘর্ষমূলক মহাযুদ্ধের জীবন্ত ও উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা হিসাবে, 'রাজসিংহ' অতুলনীয়। ইহার গঠন-কৌশলও (constructive power) অনবদ্য; দৃশ্যের পর দৃশ্য দ্রুতবেগে পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্য নাই, কোথাও গতিবেগ মন্থর হইয়া আসে নাই, কোথাও কেন্দ্রাভিমুখী রেখা হইতে তিলমাত্র বিচ্যুতি হয় নাই। অবশ্য স্থানে স্থানে দুই একটী দৃশ্য অসম্ভবতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে; দরিয়ার মোগল-অশ্বারোহীর ছদ্মবেশ, মাণিকলালের ঐন্দ্রজালিক চতুরতা রোমান্সের পক্ষেও ঠিক সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বঙ্কিম তাঁহার আখ্যায়িকাকে এরূপ প্রচণ্ড গতিবেগ দিয়াছেন যে পাঠক এই সমস্ত ক্ষুদ্র ত্রুটির উপর মনোযোগ দিতেই অবসর পায় না। রাজসিংহে বঙ্কিমের এক নূতন রকমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; তাঁহার কৃতিত্ব এই যে তিনি একদিকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার মধ্যে চরিত্র-মূলক শৃঙ্খল যোজনা করিয়া দিয়াছেন। অপর দিকে ব্যক্তিগত জীবনে ইতিহাসের গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন; এবং এইরূপে দুই বিভিন্ন প্রকৃতির উপাদানের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ে গড়িয়া তুলিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] মাঘ, ১৩৩১ [১০ম সংখ্যা

বৌদ্ধজ্ঞানে উপনিষদের প্রভাব

বেদ নিত্য, যেহেতু বেদ জ্ঞান ও শব্দ। যাহার ক্ষয়-ব্যয় নাই, যাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই, যাহার উৎপাদ-নিরোধ নাই, তাহাই নিত্য। জ্ঞান কেবল জানা নয়; উহা অন্তর ও বহির্বিষয়ে ভাব-অভাব বুদ্ধি, কার্য্য-কারণ ও সম্বন্ধ বুদ্ধি এবং সৌন্দর্য্য বুদ্ধি। যে কোন জাতি পৃথিবীতে কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান কোন না কোন আকারে দেখা দিয়াছে। যেখানে মানুষ, সেইখানে জ্ঞান। অসভ্য জাতিরও জানিবার চেষ্টা আছে, বুঝিবার চেষ্টা আছে, তাহাদের আখ্যান উপাখ্যান আছে, তাহাদের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি ও সাহিত্য আছে। জ্ঞান নিত্য বলিয়া উহা আদিকারণের স্বরূপ। আবার জ্ঞানের মূর্ত্তি ভাষার দ্বারা প্রকাশ হয়, কাজেই জ্ঞান ও ভাষা পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ। এই ভাষাই শব্দ এবং শব্দ লইয়াই জ্ঞান যেন আপনার মূর্ত্তি আপনি দেখাইতেছে। অতএব শব্দও নিত্য এবং উহাও মূলকারণের স্বরূপ বা ব্রহ্ম। এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন জাতি সমূহের অভ্যুদয় ও সমৃদ্ধি। তবে ভারতে উহার একটু বিশেষত্ব আছে। ভারতে বেদই জ্ঞানের বীজ; এবং অপরাপর পল্লব, শাখা যাহা কিছু হইয়াছে তাহা যেন লতার মত বেদকে জড়াইয়া আছে। এমন কোনও জ্ঞানের বিষয় নাই যাহা বেদে কোন না কোন আকারে পাওয়া যায়। মানুষের যাহাতে জ্ঞানের বিকাশ বা জ্ঞান যে আকার লইয়া মানুষের সম্মুখীন হইয়াছে সে সকলই বেদমূলক। যথারীতি মন্ত্র উচ্চারণের জন্য শিক্ষা, মন্ত্র পাঠের জন্য ছন্দ, অনুষ্ঠানের জন্য জ্যোতিষ, শব্দ বুঝিবার জন্য নিরুক্ত, পদ-বিন্যাসজন্য ব্যাকরণ, এ সমস্তই কেবল বেদে অনুপ্রবেশ করিবার জন্য উদ্ভূত হইয়াছে। বেদ ছাড়া উহাদের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। বেদ বুঝিবার জন্যই উহাদের আবির্ভাব, কাজেই উহারা বেদ-প্রাণ। মানুষ জ্ঞান সৃষ্টি করে না, উহা মানব হৃদয়ে দেখা দেয়, ইহাই বোধ হয় জ্ঞানের স্বভাব, ভারতে জ্ঞানের শাখাসমূহ বেদমূলক বলিয়া বেদই সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রসূতি।

নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে দর্শন-শাখায় পঠিত।

একটা প্রচলিত কথা আছে যে, এখন কোনও জ্ঞান বা বিজ্ঞান নাই যাহা পূর্ব্বে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল। এমন কি অভিব্যক্তি-বাদও ভারতে ও গ্রীক জাতির মধ্যে সুপরিচিত ছিল। মূলমন্ত্রটা জানা ছিল, তবে উহার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে এই পর্য্যন্ত। ভূতত্ত্ব একটি নব্য বিজ্ঞান বলিয়া আমরা বুঝি, কিন্তু পৌরাণিক আখ্যায়িকায় সৃষ্টিপ্রকরণ ভূতত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা মাত্র। কোনও সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ব-লেখক (১) তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে সাদরে বিভিন্ন দেশের ঐ সকল প্রাচীন আখ্যায়িকায় উল্লেখ করিয়াছেন। রসায়নকেও নব্য শাস্ত্র মনে ক'রিবার কোনও কারণ নাই। ভূত সমূহের যোগে ও অণু, পরমাণু দ্বারা জগত সংগঠিত হইয়াছে ইহা প্রাচীনেরাও অনুভব করিয়াছিলেন।

যাহা হউক জ্ঞান এক হইলেও ইহার শাখা প্রশাখা বড় নদীর মত অনেক হইয়া থাকে। ভারতের জ্ঞান যদিও বেদমাতৃক, কিন্তু পরে উহা ক্রমশঃ বেদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে মাথা তুলিয়াছে। জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ প্রভৃতি ক্রমশঃ বেদের বাহিরে আসিয়া নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নূতনত্ব হইতে স্বতন্ত্র ভাব এবং স্বতন্ত্র ভাব হইতে স্বাধীনতা দেখা দিয়াছে, এবং সেই সময় হইতে ভারতের দৃষ্টিকেন্দ্রও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সেটা একটা নূতন যুগ। প্রাচীনেরা প্রাচীন দৃষ্টিকেন্দ্রে জাগতিক রহস্য দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু নবীনেরা প্রাচীনের গণ্ডী ছাড়াইয়া নূতন ভাবে জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষে একটা দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। যাহা হউক জ্ঞান ত একই, তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে উহার বিভিন্ন আকার হয় কেন? অথবা যাহা লইয়া কলহ উহার মূল ব্যক্তিগত দৃষ্টিভ্রম আছে কি না? সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক কলহ বাহ্যিক আবরণ লইয়া হইয়া থাকে। সত্য এক ছাড়া দুই হইতে পারে না। উভয় পক্ষেই একই সত্যের বিভিন্ন আচ্ছাদন লইয়া কলহ করে। একটা কথা আছে যদি একশত লোক সূর্য্য দেখে, তাহা হইলে প্রত্যেকেই উহা বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকে। অর্থাৎ কেহ উহার আকার, কেহ বর্ণ, কেহ উজ্জ্বলতা, কেহ উত্তাপ, কেহ দেবত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব লইয়া নাড়া চাড়া করে। বিষয় যতই জটিল হইবে তাহা সেইরূপ বহুধর্ম্মী ও বহুকারণসমন্বিত হইবে। কাজেই কেহ কতকগুলি ধর্ম্ম দেখিয়া সমস্ত বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিবে, আবার অপর কেহ অন্য ধর্ম্মগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া ঐ বিষয়ের অনুভব করিবে। যেস্থলে কেহ কোন বস্তুর নূতন ধর্ম্ম বা গুণ দেখিতে পায় অপরে সেখানে কিছুই দেখে না। ইহার জন্যই মতভেদ। স্বর্ণকার যেরূপ সোণা চিনে সাধারণ লোক সেরূপ চিনিতে পারে না। অতএব স্বর্ণকার সোণার এমন একটা ধর্ম্ম বা ভাব দেখে যাহা সাধারণে দেখিতে পায় না। আবার খনিজ পণ্ডিত যে প্রস্তরের সহিত যে সোণা থাকে তাহা যেমন চিনেন, স্বর্ণকার তাহা জানেনা। পদার্থ-তত্ত্ববিৎ, তাহার উত্তাপ-গ্রহণ শক্তি, তাহার তড়িৎ-পরিচালকত্ব (কনডকটিভিটি) বিশেষ ভাবে বুঝেন। অতএব

(১) লায়েল।

একই বিষয়ে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দৃষ্টি হইয়া থাকে। ইঁহারা প্রত্যেকেই যাহা দেখেন তাহা সত্য। তবে সোণা দৃশ্য বস্তু বলিয়া বিশেষ কোনও গোল নাই। কিন্তু অরূপ, অদৃশ্য বিষয়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে বহু মত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইউরোপীয় জাতি গণনাপ্রিয়, কাজেই তাঁহারা ভারতীয় জ্ঞানের একটা কাল নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন। কালটা ঠিক না হউক, তবে পৌর্বাপর্য্যটা কতকটা ধরিতে পারা যায় এবং ইহাও একটা হিসাবের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। যাঁহারা মন্ত্র ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ প্রভৃতি সব এক সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছে মনে করেন, তাঁহাদের সংখ্যা আজকাল খুব কম বলিতে পারা যায়। বৈদিক মন্ত্র ভাগই ভারতীয় জ্ঞানের প্রথম স্তর তাহা মনে করিলে কোনও দোষের হয় না। জ্ঞান কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হয় না। ইহা আপনার পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া লয়। মন্ত্রভাগের বিষয় উপনিষৎ ভাগের বিষয় হইতে ভিন্ন। আবার উপনিষৎভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ বিষয় অনুপাতে এক নহে। উপনিষৎ পাঠে বুঝা যায় যে ঐ সময়ে প্রকৃতি ও প্রকৃতির সূক্ষ্ম রহস্য সমূহ অর্থাৎ প্রাণতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি অনুসন্ধানে ঋষিগণ তৎপর রহিয়াছেন। বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি তখন আর দেবশক্তিসম্পন্ন নহেন, উঁহারা পঞ্চভূতের অন্যতম। বৈদিক যুগের "ঋত", শ্বেতাশ্বতরে, ও বোধ হয় পরে সাংখ্য-তত্ত্বে, প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছেন। "ঋত" শব্দে প্রাকৃতিক নিয়ম, শৃঙ্খলা ও কার্য্যকারণ ভাব। মহাভারতের যুগে বৈদিক অনুষ্ঠান সমূহে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে বুঝা যায়। যদি গীতার উপদেশ ঐ সময়ে প্রচার হইয়া থাকে তাহা হইলে বেদ তখন "ত্রৈগুণ্যবিষয়" হইয়া পড়িয়াছে। দেবতারাও সমগ্রভাবে বিশ্বদেবে পরিণত হইতেছেন। অতএব ভারতের মানসিক দৃষ্টি ঐ সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। বৃহস্পতির মত কোন্ সময়ের তাহা বলা যায় না। হয়ত উহা বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেই হইয়া থাকিবে। আত্মা ও ঈশ্বর তখন হইতে সংসারের বস্তু এবং চারিবেদ ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরের ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আজকালকার ভাষায় বলিলে উপনিষদের যুগ হইতেই জ্ঞান ও যুক্তিবাদের (১) প্রারম্ভ বলা যায়। কোন এক ইউরোপীয় বড় পণ্ডিতের মতে (২) সাংখ্য তত্ত্ব বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী। যাহা হউক ঐ সময়টা মোটামুটি বিজ্ঞানের যুগ বলা যায়। জ্যোতিষ, চিকিৎসাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বসমূহের ক্রমশঃ আবির্ভাব হইতেছিল। বৌদ্ধসূত্র ও অভিধর্ম্ম গ্রন্থে যেরূপ মনস্তত্ত্বের গভীর বিচার দেখা যায় তাহা হইতে মনে হয় আধুনিক যুগের মত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ঐসময়ে পুরাভাবে চলিতেছিল।

পূর্ব্বের প্রশ্নটি আর একবার তোলা আবশ্যক। জ্ঞান ক্রমভাবী—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রাচীনের উপর বিতৃষ্ণা ও নূতনের আদর মানুষের স্বভাবগত। ধর্ম্ম অভ্যন্তরের বস্তু, উহা মানবের প্রকৃতিগত (৩) বলিলেও চলে। বৈদিক যুগে অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি

---

(১) র‍্যাসান্তালিসম্

(২) গার্ব্বে।

(৩) ইনসটিন্‌কটিব্।

দেবতার স্তব স্তুতি করিয়া ঋষিদের ধর্ম্মপিপাসা মিটিত। উপনিষৎ যুগে ধ্যান, আত্মজ্ঞান কর্ম্ম ও যজ্ঞ দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইত। কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি নাই, জৈন ও বৌদ্ধ আন্দোলন একটা অতৃপ্ত অবস্থার পরিচয় দিয়া থাকে। জৈন ও বৌদ্ধ ধারা ভারতে নূতন কিছু আনিয়া দেয় নাই। উপনিষৎতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উভয় ধর্ম্ম দেখা দিয়াছে।

জৈন ও বৌদ্ধ আন্দোলন প্রায় সমসাময়িক। উভয় ধর্ম্মই আবার শুদ্ধি করুণা ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির উপর অধিক ঝোঁক দিয়াছিল। উভয় ধর্ম্মই ভারতীয় জ্ঞানবিকাশের ফল এবং উভয় ধর্ম্মই বেদবিরোধী। আবার জৈন ধর্ম্ম কেবল বেদবিদ্বেষী নহে; উহাতে ব্রাহ্মণবিদ্বেষও আছে। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ দেব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন; মহাকশ্যপ, বুদ্ধঘোষ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধমতের ও ধর্ম্মের বহু উন্নতিসাধন করিয়াছেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বেদ-বিদ্বেষ ছিল এবং তিনি বেদকে তাঁহার তন্ত্রভুক্ত করিয়া লইলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিকধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইত। জৈন-ধর্ম্ম ব্রাহ্মণবিদ্বেষ লইয়া সেরূপ শিষ্য সংগ্রহ করিতে পারিল না, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণহস্তে পালিত হইয়া সার্ব্বজনীন হইয়া পড়িল।

বৌদ্ধধর্ম্ম একপ্রকার দার্শনিক ধর্ম্ম; কেবল জ্ঞান আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের যতটুকু উৎকর্ষ সাধন হইতে পাবে তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের হইয়াছে। আমাদের ষড় দর্শনও একপ্রকার ধর্ম্মমার্গ। ঐ সকল দর্শনের সারতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে অপবর্গ নিশ্রেয়স, মোক্ষ প্রভৃতি হইয়া থাকে। তবে প্রত্যেক দর্শনেই স্বমতপ্রতিষ্ঠা হইলেও উহাতে বৈদিক আচার ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতির সমর্থন আছে বলিয়া উহা প্রাচীন পন্থায় স্থান পাইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উপনিষদের যুগ জ্ঞানের যুগ, তত্ত্বান্বেষণের যুগ এবং ঐ যুগকে দর্শন ও বিজ্ঞানের যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল আন্দোলন ও বাদ প্রতিবাদের মধ্যে বুদ্ধের জন্ম হয়। প্রাকৃতিক ক্রিয়া তখন আর দেবগণের ক্রীড়া নহে, উহা নিয়ম ও কার্য্য-কারণনিয়ন্ত্রিত, যেহেতু উহা যাদৃচ্ছিক নহে। প্রকৃতিতত্ত্ব অধ্যয়ন হইতে বিজ্ঞানের জন্ম এবং বিজ্ঞান হইতে উহার মূল মন্ত্র দর্শনের উৎপত্তি। জগতে মানুষের স্থান, বিশ্বের সহিত উহার সম্বন্ধ, জগতে উহার কার্য্য—এই সকল প্রশ্ন আপনা হইতে উঠিতে লাগিল। উপনিষদেও যে এ সকল তত্ত্ব নাই তাহা বলা যায় না, বরং ইহার প্রভাব বেশ দেখা যায়, এক মূল বস্তু, এক আদি কারণ হইতে এই বহু ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং উহা মায়া বা প্রকৃতি-সৃষ্ট এই কল্পনা উপনিষৎ হইতেই আমরা পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া কর্ম্ম ও সংসার, ধ্যান, অমৃতত্ব প্রভৃতির আলোচনা উপনিষদেই দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শনের উৎপত্তি বুদ্ধপূর্ব্বযুগের হইতে পারে তাহার আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্রের কালগণনা বিড়ম্বনা মাত্র। সাংখ্যকে যদি আদিদর্শন ধরা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সাংখ্য জগৎরহস্যের এক অভিনব দ্বার খুলিয়া দিয়া ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিশ্লেষণ করিয়া আমরা অবশেষে দুইটি মাত্র পদার্থে পঁহুছিতে পারি। সেই দুই পদার্থ মন ও জড়; এবং তাহাদের ক্রিয়াশীল অবস্থাই জগৎ বা প্রকৃতি। এত অল্প ভাষায় প্রকৃতির স্বরূপ বুঝান তীক্ষ্ণ দার্শনিক দৃষ্টি না থাকিলে

হয় না। আর এই গভীর চিন্তা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের গবেষণার ফল ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। চার্বাক সম্প্রদায় চপল দার্শনিক, কাজেই তাঁহাদের রচিত দর্শন অন্ধ দর্শন এবং উহা পুরা ভাবে যুক্তিবাদীর চিন্তার ফল মাত্র। উহার বিস্তৃতি আছে, কিন্তু গভীরতা নাই, উহা আশুবোধ্য কিন্তু তত্ত্বের হিসাবে উহা লঘু।

এই যুক্তিবাদের দিনে এই তর্ক, বিচার ও পর্য্যবেক্ষণের যুগে বৌদ্ধ-মতের উদয় হইল। ঐ সময় বোধ হয় বুদ্ধের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ভারতে কেহ ছিলেন না। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান ও চিন্তা উপেক্ষা করিতেন ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই, অথবা তিনি প্রাচীন মত ও বিশ্বাস সমূহ একবারে ধ্বংস করিয়া তাহার কঙ্কালের উপর তাঁহার মত বচনা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। জীবশরীর যেমন সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করে সেইরূপ জাতীয় জ্ঞানও অব্যক্ত অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়। জাতীয় জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া তিনি তত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সামাজিক গ্লানি উপস্থিত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজ নষ্ট না করিয়া তাহার গ্লানি মোচন করিতেই চেষ্টা করেন। উপনিষদের জ্ঞানই তাঁহার আদরের বস্তু, তাঁহার শ্রদ্ধার সামগ্রী, সেই জ্ঞান মূলে আবোহন করিয়া তিনি প্রাচীনপন্থীদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। সমাজ দেশ ও সত্য রক্ষা করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তদানীন্তন গলিত সংস্কারসমূহ তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্মুখে ধরিয়া দিতেন, এবং প্রাচীন অসৎ বিশ্বাসের উপর যে সকল ক্রিয়া কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহার তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। এই সকল বিষয়ের বৃত্তান্ত আমরা তিবেজ্জ সূত্ত ও অপবাপর সূত্র গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি এবং ঐ সকল গ্রন্থে ইহার যথাযথ বর্ণনা আছে। তদানীন্তন আচার ব্যবহার সংস্কার সমূহ তিনি সুবংশজাত ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকদের নিকট কি ভাবে তুলিতেন, কি ভাবে উহার দোষ দেখাইতেন এবং অবশেষে কি প্রকারে তাহাদেব স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিতেন তাহার অনেক বৃত্তান্ত আছে। বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজবংশ জাত দুই যুবক তাঁহার নিকট ধর্ম্ম উপদেশ লইবার জন্য গিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহারা বুদ্ধ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ কবিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সূত্র ও অভিধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে বুদ্ধদেব কি ভাবে বিষয়ের মূলে উপস্থিত হইতেন ও তাঁহার কি রূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অসাধারণ বিচারশক্তি ছিল তাহার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাঁহার উপদেশ সমূহ বাঁধা কথায় রচিত নহে অথবা সাধারণ ধর্ম্ম উপদেষ্টারা যে ভাবে প্রচলিত কথায় লোক সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন বুদ্ধদেবের সে ভাব ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃবর্গ সাধারণ জনসংঘ নহে অথবা শ্রমজীবী শ্রেণীও নহে। যাঁহারা বিদ্যাপারদর্শী, শাস্ত্রমর্ম্মগ্রাহী, তত্ত্ব পিপাসু, তাঁহারাই তাঁহার শ্রোতা ছিলেন। বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন যে মানব চিত্তের গঠন ও ক্রিয়ার উপর আচার, নীতি, বিশ্বাস ও ধর্ম্ম প্রভৃতি দাঁড়াইয়া আছে। বাহ্য বস্তু ও বিশ্বক্রিয়ার অনুভব, মানবের মূল প্রত্যয় সমূহ এবং যে সকল সামাজিক কার্য্য ও নিয়মের উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহার আদিতে মন রহিয়াছে। কাজেই তাঁহাকে মনস্তত্ত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল এবং উহার সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণ এতই গভীর ও সমীচীন যে নব্য থিওরেটীক্যাল মনস্তত্ত্ব তাহা অপেক্ষা অধিক শিখাইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। তবে বুদ্ধ যে উহা নূতন করিয়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন

তাহা মনে করিতে পারা যায় না। নূতন জিনিস হইলে লোকে সহজে তাহা বুঝিতে পারে না। মনস্তত্ব বুদ্ধপূর্ব্বযুগের রচিত, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাই।

হিন্দুর ষড় দর্শনের মত বৌদ্ধের কোনও বাঁধা দর্শন নাই, অন্তত বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় ও তাঁহার মহা নির্ব্বাণের দুই একশত শতাব্দীর মধ্যে কোনও দর্শন দেখা দেয় নাই। বুদ্ধদেবের অভিভাষণ ও উপদেশ গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ও দার্শনিক ছন্দে গঠিত এবং বোধ হয় সেই জন্যই অন্য কোনও দর্শনের তখন বিশেষ আবশ্যক হয় নাই। বুদ্ধউপদেশসমূহ এক প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব বলিলেও চলে, আমাদের ষড় দর্শনেও কিছু কিছু ধর্ম্মের গন্ধ আছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রত্যেক দর্শনের রচয়িতা কেবল যে জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা নহে, ঐ সঙ্গে তিনি ধর্ম্ম উপদেষ্টা, যেহেতু প্রত্যেক দর্শনে সম্যক অধ্যয়নে অপবর্গ ও মোক্ষ প্রভৃতি আছে এবং এ কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

বুদ্ধের উপদেশে পূর্ণমাত্রায় বেদবিদ্বেষ অথবা উহার নিন্দা নাই। যে সকল শুষ্ক ও অন্তঃসারশূন্য বৈদিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল ও উপাসনার অর্থহীন বিধান ছিল তাহার তিনি প্রতিবাদ করিতেন ও তাহাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। বৈদিক পন্থীদিগের মধ্যেও যে প্রাচীন কর্ম্ম অনুষ্ঠান, উপাসনা ও সামাজিক নিয়মের প্রতি কটাক্ষপাত ছিল না তাহা বলা যায় না। মহাভারতে, গীতায় এমন কি উপনিষদেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যাহা হউক বৌদ্ধ জ্ঞান ভারতীয় জ্ঞানেরই একটি স্তর বা উহার একটা অঙ্গ। উহা বাহিরের সামগ্রী নহে এবং যাঁহারা বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন তাঁহাদের বংশোদ্ভব লোকেরাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের আকার গঠন, চাকচিক্য সম্পাদন করিয়াছেন। ভারতে চিন্তা রাজ্যে যাহা কিছু নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সহিত ব্রাহ্মণবুদ্ধি ও পটুতা সংযোগ আছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের শ্রীবৃদ্ধি তাঁহাদের দ্বারাই হইয়াছে।

বৌদ্ধদর্শন ও জ্ঞান সম্বন্ধে সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিলেও উহা শেষ করা যায় না, কাজেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার কেবল কণিকা এবং আভাস মাত্র দেওয়া যাইতে পারে। তাহার উপর বৌদ্ধ সাহিত্যে নির্দ্দিষ্ট কোনও দর্শন না থাকায় উহার বিষয় লইয়া আলোচনা আরও দুরূহ হইয়া পড়ে, বৌদ্ধ মনস্তত্ব, বিভিন্ন সূত্র ও অভিধর্ম্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়। মন ও মানসিক ক্রিয়া আলোচনায় বুদ্ধদেব সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তাঁহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ গভীরতা হিসাবে নব্য পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের সমকক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতির ক্রিয়া রহস্য, পরকাল, সৎ পবিত্র ধর্ম্ম কি হইতে পারে এই সকল প্রশ্ন বুদ্ধের অন্তরে জাগরূক ছিল। পরস্পর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান ও উপদেশই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। যাহা হউক ইহা বিশেষ শক্তিমান পুরুষের কাজ এবং তখন চিন্তার আদান প্রদান ও দেশ পর্য্যটন আধুনিক যুগের মত সহজ ছিল না। ইহা ছাড়া বহু ধর্ম্ম সমন্বিত ভারতে বৌদ্ধ মতের উপযোগিতা প্রমাণকরাও সহজ কাজ নহে।

বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব :—সম্প্রতি বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিব। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই মনকে জড় ও একটি আগারবিশেষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। যেমন কলে কোন একটি জিনিস তৈয়ারী করিতে হইলে বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন কার্য্য হইয়া থাকে সেই রূপ জ্ঞান রচনায় মনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে। সেই প্রকোষ্ঠ পাঁচটি এবং তাহাদিগের নাম স্কন্ধ। স্কন্ধ অর্থে রাশি এবং সেই স্কন্ধগুলি যথাক্রমে রূপ, বেদনা. সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও সংস্কার। নব্য মনস্তত্ত্বে ইহা অপেক্ষা ভাল বিভাগ নাই। ইন্দ্রিয়সমূহ যে সকল সংবাদ দেয় তাহাই রূপ। রূপের সঙ্গে সুখদুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে উহাই বেদনা। রূপসমূহ প্রকটিত হইয়া নাম, কাল, দেশ, জাতি প্রভৃতির সংস্রবে আসিয়া যে বিষয় জ্ঞান হয় তাহা সংজ্ঞাস্কন্ধের কার্য্যে। তাহার পর অপরাপর বিষয়ের সহিত অর্থাৎ কার্য্য-কারণ, পরস্পর সম্বন্ধ সংখ্যা প্রভৃতি সংযুক্ত হইলে যে উচ্চতর বিষয় জ্ঞান হয় তাহা সংস্কার স্কন্ধ সংঘটিত। তাহার পর বিজ্ঞান স্কন্ধ; বিজ্ঞান অর্থে সম্বিৎ অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিষয় সমূহ আলোকের মত প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধদের মনসিকার মনের একাগ্রভাব বা মনঃসংযোগ অবস্থা। বস্তু সমূহে কাল, দেশ, জাতির সংস্থান কি করিয়া হয় অথবা সংখ্যা, পরিমাণ, কার্য্য কারণ ভাব এবং সম্বন্ধ বোধ কাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়? রূপসমূহ উত্তেজনা মাত্র। আলোকের উত্তেজনায় চক্ষুর ক্রিয়া, গন্ধের উত্তেজনায় নাসিকার ক্রিয়া হইয়া থাকে। অতএব রূপ-গ্রহণ শারীরিক ক্রিয়া। কার্য্য কারণ অনুভূতি অথবা সম্বন্ধবোধ উত্তেজনা বশতঃ হয় না, ইহা রূপ প্রভৃতি গ্রহণের পর হইয়া থাকে। অতএব রূপ-স্কন্ধ একপ্রকার শারীরিক ব্যাপারমাত্র। তাহা হইলে জ্ঞান ও সমাধান প্রভৃতি কি করিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং উত্তরোত্তর জ্ঞান বৃদ্ধিই বা কি করিয়া হয়? বিদ্যার্থীর অধ্যয়নের প্রাক্কালের জ্ঞানের সহিত অধ্যয়ন সমাপ্তির পর যে জ্ঞান হয় এই উভয়ের তুলনায় শেষোক্ত জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বা বিস্তৃত। ইহা কিরূপে হইয়া থাকে? ইহা হইতে মনের এমন একটা শক্তি অনুমান করিতে হয়, যাহা দ্বারা জ্ঞান-খণ্ড সমূহ একত্রিত হইয়া বিশাল জ্ঞানে পরিণত হয়। বৌদ্ধেরা তাহাকে প্রজ্ঞা বা অভিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। এ সকল জ্ঞান, রূপ ও অরূপ লোকের কথা অর্থাৎ বাহ্যিক ও মানসিক ব্যাপার সমূহের প্রতীতিমাত্র। ঋষি, অর্থাৎ, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি ব্যক্তির পারমার্থিক জ্ঞান কোথা হইতে আসে? সাধারণ জ্ঞান মনসিকার প্রভৃতির দ্বারা হইয়া থাকে কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান কেবলমাত্র ধ্যানসাধ্য। বৌদ্ধ মতে পারমার্থিক জগতও রূপ-জগতের মত স্তর বিশিষ্ট অর্থাৎ এক এক অবস্থায় এক এক জনের জ্ঞান হয় মাত্র। সকলের শেষ অবস্থায় অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় সাধকের শূন্যতা, সংসার প্রভৃতি পারমার্থিক তত্ত্ব সমূহের অনুভূতি হয়। এই অবস্থাই পূর্ণ অবস্থা এবং উহাই বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি। পারমার্থিক জ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থাও প্রজ্ঞা-সাধ্য, যেহেতু লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় জগতেই জ্ঞানের পরিপুষ্টি আছে এবং উহার এক একটি জগত প্রজ্ঞা নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াতীত জগতেও প্রজ্ঞার বৃদ্ধি আছে এবং উন্নত প্রজ্ঞার নাম অভিজ্ঞা বা সম্প্রজ্ঞান। যাহা হউক বৌদ্ধের পঞ্চস্কন্ধ তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাওয়া যায় এবং ধ্যানও উপনিষদের সামগ্রী, কাজেই উহা প্রাচীন বস্তু।

বৌদ্ধ ন্যায়—বাহ্যজগতের ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া এই উভয়ই ক্ষণিক কি না

এবং ইহার পশ্চাতে কোনও পদার্থ বা আত্মা আছে কি না বুদ্ধ উপদেশ হইতে তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না। বুদ্ধ প্রয়াণের পরে যে সকল বৌদ্ধ মত দর্শন-আকার ধারণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে এ সকল বিষয় অনেক আলোচনা দেখা যায় এবং তাহাদের সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। সম্প্রতি বৌদ্ধন্যায় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। একই ন্যায় শাস্ত্র বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই সাধারণ ভাবে অধ্যয়ন করিতেন। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধেরা প্রমাণ শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতেন এবং বাস্তবিকই বৌদ্ধাচার্য্যেরাই উহার উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে আমরা অনুমান বিষয়ক নূতন তত্ত্ব পাইয়াছি। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিক্‌নাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন লেখক "অবয়ব" ও "অনুমান" অধ্যায়ের উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁহাদের বিষয় নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার কারণ ন্যায় বিষয়ক সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ সাধারণ বৌদ্ধ বুঝিত না এবং বিচার বিতর্ক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সহিত হইত। তবে দুঃখের বিষয় এই যে অধিকাংশ বৌদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ সংস্কৃতে বড় পাওয়া যায় না এবং উহারা তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া জীবনধারণ করিয়া আছে। অধুনা ন্যায়বিন্দু গ্রন্থ কেবল সংস্কৃতে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্কৃতে লিখিত ছয়খানি ন্যায় গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক গ্রন্থ, উহা ঠিক ন্যায় বিষয়ক প্রবন্ধ নহে। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়বিন্দু গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ঐ গ্রন্থের প্রত্যক্ষ অর্থে কেবল মাত্র প্রতীতি, উহাতে অপর কোনও বিশেষণ নাই অর্থাৎ উহাতে দেশ, সম্বন্ধ বা নামের সংস্রব নাই। উক্ত মতে জাতির প্রত্যক্ষ হয় না উহা অনুমানসাপেক্ষ, আবার ব্যক্তিজ্ঞান স্বলক্ষণবশতঃ হইয়া থাকে। অবয়বী বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। হিন্দু ন্যায় গ্রন্থে বস্তু সমূহ অবয়ব এবং পরমাণু উহার অবয়বী। ন্যায়বিন্দুকার বলেন অবয়ব সমূহের সমবায়ই অবয়বী। ন্যায়বিন্দুলেখক অনুমানবিষয়ক প্রস্তাব কিছু নূতন ভাবে লিখিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ উহাই স্বনামখ্যাত নব্যন্যায়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। অতএব এস্থলেও আমরা দেখিতেছি যে উভয় সম্প্রদায়ই গোতমীয় ন্যায় অবলম্বন করিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

বৌদ্ধনীতি :—ইউরোপীয় লেখকেরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রে অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে নীতি বা চরিত্রের স্থান নাই। প্রাচীন হিন্দু স্তব, স্তুতি ও যাগ যজ্ঞ প্রভৃতিকেই ধর্ম্মচর্য্যা বলিয়া মনে করিতেন এবং বুদ্ধই নীতি ও আচরণকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। একথা ঠিক নহে, নীতি অনুসরণ বা কর্ম্ম প্রাচীনেরা ধর্ম্মের প্রধান সহায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং বৃহদারণ্য ও তৈত্তিরীয় ঐতরেয় প্রভৃতি উপনিষদে ইহার অনেক উল্লেখ আছে। তবে আত্মজ্ঞান উপদেশই উপনিষদের প্রধান কার্য্য। কথা প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে অবতারণা দেখিয়া বেশ বোধ হয় যে উপনিষদের মতে শম দম অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক সৎ-অভ্যাস গঠন মানুষের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক এবং বেদ অধ্যয়নকারীকে উহা অভ্যাস করিতে হইবে। কর্ম্ম অনুসারে পরলোক এবং পরলোকেই মানব জীবনের ফলাফল নির্ণয় করিয়া দেয় ইহা বুদ্ধ জীবনের পূর্ব্বে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। যাহা হউক নীতি

মার্গ লইয়া বুদ্ধ বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। কুশল ও অকুশল কর্ম্মের লক্ষণ অনেক দেখাইয়াছেন। জগতের ধর্ম্মসাহিত্যে বৌদ্ধনীতির স্থান অতি উচ্চ। নির্ব্বাণ যাঁহাদের লক্ষ্য তাঁহাদের কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে এবং নির্ব্বাণলাভ করিলে সংস্কার সমূহ ধ্বংস হইয়া যাইবে। শীল ও আচরণ এবং পারমিতা (সদ্‌গুণ) অবলম্বন ধর্ম্ম উৎসাহীকে করিতেই হইবে। ইহাই ধর্ম্মের প্রারম্ভ এবং কুশল কর্ম্মসমূহের তালিকা এতই বৃহৎ যে তাহার সামান্য-ভাবে উল্লেখেরও এস্থলে সংকুলান হইবে না। যাঁহাদের শীল ও পারমিতা অবলম্বনে জীবন গঠিত হইয়াছে তাঁহাদের আরও উচ্চতর জীবন আছে এবং সে জীবন কেবলমাত্র ধ্যানলভ্য। বৌদ্ধনীতিব্যূহ এতই বৃহৎ এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের এত অধিক স্থান অধিকার করিয়া আছে যে ভূমিকা ভাবে বলিলেও অল্পস্থানে শেষ করা যায় না। তবে নীতি তত্ত্ব, বুদ্ধ, কোনও স্থলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা হেতুতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। নীতি-বুদ্ধি যুক্তি অথবা হিতাহিত- বুদ্ধি, শ্রেয় প্রেয়জ্ঞান প্রভৃতি নীতিমূল অথবা নীতি-চর্য্যা, মানুষ প্রকৃতিকে ও প্রবৃত্তিকে দলন করিয়া কি করিয়া সাধন করে তাহার বিচার আলোচনা বড় দেখা যায় না। তাঁহাব উপদেশই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই মানুষকে দুঃখ হইতে মুক্তি দেয় ইহাই তাঁহার বাণী। কাজেই উহা বিধি নিষেধের উপদেশ মাত্র, ইহা করিওনা এবং ইহা কর। ইহার হেতু জানিবার আবশ্যক নাই, ইহা ধ্যান দ্বারা তত্ত্ব দর্শনে জানা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধদর্শন। বুদ্ধের প্রকৃত দার্শনিক মত বুঝিবার বিশেষ উপায় নাই। ক্লেশ ও দুঃখ আছে তাহা বৌদ্ধ ও হিন্দুর স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। হিন্দু দর্শনেও দুঃখই মানব জীবনেব বিশেষ ব্যাপার এবং উহাব মোচনই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। তাহার পর মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং তাহার অস্তিত্বই বা কিসের জন্য? মানুষ দ্বাদশ অঙ্গের বশীভূত, অবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া এই দ্বাদশ ব্যাপার মানুষকে চক্রের ন্যায় ঘুবাইতেছে। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান ইত্যাদি। অবিদ্যাই দুঃখের কারণ, কাজেই অবিদ্যা ও দুঃখ নিবৃত্তিই মানুষের চরম লক্ষ্য। কিন্তু অবিদ্যাও জগতের মূল কারণ নহে, জগতের আদি ও পূর্ণ কারণ শূন্য। এই শূন্য, অবস্তু বা অসৎবস্তু নহে এবং এই শূন্যের আপরনাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ। (১) অতএব মানবজ্ঞানে দুইটি ব্যাপার ধরিয়া লইতে হইবে। প্রথমতঃ এই ইন্দ্রিয়গম্যরূপ লোক এবং তাহা লৌকিক প্রত্যয়ের বিষয় এবং দ্বিতীয়তঃ অলৌকিক পরমার্থ-তত্ত্ব তাহা কেবল প্রজ্ঞা বা সম্প্রজ্ঞান গ্রাহ্য। অতএব সত্যেরও দুইটি পর্য্যায় এবং তাহারা লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক সত্য মাধ্যমিক সূত্রের ভাষায় সংবৃত্তি সত্য এবং বৈদান্তিক মতে উহা ব্যবহারিক সত্য, এবং অলৌকিক সত্য—পরমার্থিক সত্য। সাধারণ-লোকের পক্ষে যাহা সত্য তাহাই সংবৃত্তি—এবং যাহা মণীষীগণের জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় উহাই পরমার্থ সত্য। ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞান কেবল মাত্র দৃশ্য জগতের হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান কেবল সৎবস্তুরই হয় অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই এইরূপ বস্তুরই হইয়া থাকে।

(১) যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষতে। মাধ্যমিক সূত্র ২৪শ প্রকরণ

বৌদ্ধ মণীষী নাগার্জ্জুনই শূন্যবাদ রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সময় হইতেই বৌদ্ধ দর্শনের আরম্ভ ধরিতে পারা যায়। শূন্যবাদ হইতে পূর্ণভাবে কোনও দার্শনিক মত পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ বিশ্বাস সমূহ যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে উহা তাহারই খণ্ডন মাত্র। শূন্য বা প্রতীত্য-সমুৎপাদ ছাড়া জগতে আর কিছুই নিত্য নাই; জড়, মন, দুঃখ ও এমন কি নির্ব্বানও নিত্য নহে। শূন্য ভাবও নহে অভাবও নহে, সৎও নহে অসৎও নহে। উপনিষৎ যুগেও অসৎবাদীর পরিচয় পাওয়া যায়, সুতরাং শূন্যবাদও বৌদ্ধযুগের নূতন সামগ্রী নহে। শূন্য বস্তুটি কি তাহা বুঝা সুকঠিন। ইহাকে বৈদান্তিকের ব্রহ্ম বা হেগেলের "আবসলিউটের" সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইহাকে জগতের মূল কারণও বলা যাইতে পারে এবং প্রতীত জগৎ উহা হইতেই উৎপন্ন তাহাও ধরা যাইতে পারে। জীবন চক্রের মধ্যে বীজ হইতে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি এবং বৃক্ষ হইতে পুনরায় বীজ অর্থাৎ উহা ধারাবাহিক ভাবে উৎপাদ ও নিরোধ। ইহাই শূন্যেরও অভিযান অথবা ইহাই বিশ্বকারণ এবং ইহার আনুসঙ্গিক হেতু, আলম্বন প্রভৃতি পঞ্চপ্রত্যয়। বীজ হইতে বৃক্ষ হইলে উহাতে কতকগুলি উপাধির আবশ্যক এবং উহার একটির অভাবে বৃক্ষের উৎপত্তি কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। জীব বা উদ্ভিদ শরীরের উৎপত্তি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বর্ত্তমান ভাব বা অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবের অভাবই জ্ঞাপন করিয়া থাকে। বীজ অথবা অণ্ড হইতে উদ্ভিদ ও জীবের অভিব্যক্তি ধারাবাহিকরূপে ভাব ও অভাবের বিনিময় ও আবর্ত্তন। প্রকৃতির এই মূর্ত্তি প্রাচীনেরাও দেখিয়াছিলেন। এবং অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে না দেখিলে এই রহস্য বুঝা যায় না। বিশ্ব অভিযান শূন্যবাদীর মতে মায়োপম, স্বপ্নোপম ও নাট্যশালার দৃশ্যের মত।

শূন্যবাদ ছাড়া আরও দুইটি প্রসিদ্ধ দার্শনিক মত আছে এবং উহা সম্ভবত: শূন্যবাদের পরে স্বীয় আকার গ্রহণ করিয়াছে। উহা অশ্বঘোষের তথতাবাদ ও রত্নকীর্ত্তির ক্ষণভঙ্গবাদ। জগৎ পরিণামশীল উহা উপনিষৎ যুগেরই কথা এবং বৌদ্ধেরা উহা ছাটিয়া বাছিয়া আরও পরিষ্কার করিয়াছেন। আধুনিক ভাবে বলিতে গেলে এই পরিণাম রাসায়নিক, শারীরিক ও মানসিক এবং কাহারও কাহারও মতে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন রাসায়নিক ক্রিয়া। যখন কোনও ভাবসন্তান ক, খ, গ, রূপে লক্ষিত হয়, তখন খ'এর বর্ত্তমানে "ক" অন্তর্হিত হইয়াছে এবং গ'এর তখনও আবির্ভাব হয় নাই। আবার যখন "গ" অবস্থার আরম্ভ হইয়াছে তখন ক ও খ দুইই নাই, অতএব যখন কোনও রূপের আবির্ভাব হয় তখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ আর নাই বা অভাবে পরিণত হইয়াছে। যাহা দৃশ্যমান্ তাহা একই ভাবে থাকিতে পারে না অতএব উহা ক্রিয়া-সন্তানের ফল এবং উহার পরও আবার রূপান্তর হয় অতএব সমস্তই ক্ষণিক। পরিবর্ত্তন অর্থে পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহারই অন্য ভাব হওয়া, কাজেই ইহা একটা ধারা বা ক্রমভাব এবং ক্রম বা ধারা কাল সাপেক্ষ। এক একটা ক্রম কালসাপেক্ষ বলিয়া ক্ষণ অধিকার করিয়া থাকে, কাজেই উহা ক্ষণিক। কিন্তু যদি সমস্তই ক্ষণিক হয় তাহা হইলে আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সত্য হইতে পারে না। এখন যাহা দেখিলাম পরে যদি উহা না থাকে তাহা হইলে জ্ঞানের সম্ভব কি করিয়া হয়। বস্তু

যদি স্থায়ী না হয় তাহা হইলে তাহার জ্ঞান কি করিয়া স্থায়ী হইবে। ক্ষণিকবাদ মতে অর্থক্রিয়াকারিত্ব সাহায্যে আমাদের জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থ ক্রিয়া-কারিত্ব শব্দে বস্তুর কার্য্য জনন শক্তি বুঝায়। এইটুকু আমাদের জানা আছে বলিয়া আমাদের জ্ঞান সম্ভব। জ্ঞান মাত্রেই আপেক্ষিক, উহা অপোহস্বভাব অর্থাৎ যে বস্তুর আমাদের জ্ঞান হয় উহা ভিন্ন অপর সকল বিষয়ের জ্ঞান আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। যখন আমরা গোপ্রত্যক্ষ করি তখন গরুর জ্ঞানটা আগে হয় না প্রথমে যাহা "অগো" বা যাহাতে গো ধর্ম্মতা নাই তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাই অপোহ-জ্ঞান।

শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ উভয়ই দর্শনের নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছে। বিচার ও যুক্তি সাপেক্ষ জ্ঞানে ইহার স্থান অতিউচ্চ এবং বৌদ্ধমতের আগমনে দেশে যে গভীর আন্দোলন হইয়াছিল ইহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ ভারতীয় জ্ঞানের এক অভিনব সৃষ্টি এবং জগতের দার্শনিক সাহিত্যে ইহা সমুজ্জ্বল রত্ন।

যাহা হউক বৌদ্ধ মত আমরা যে ভাবেই দেখি উহা উপনিষদেরই দ্বারা এবং উপনিষদের মেরুদণ্ড লইয়াই এক নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বোধ হয় সেইজন্যই বুদ্ধ অবতারবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। যে বিষয়ই বলি বৌদ্ধ মত ও জ্ঞান প্রাচীন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহার ধ্যান, নীতি, দর্শন, আচার অধিকাংশই উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা উপনিষদের বর্ণে অনুরঞ্জিত এবং উপনিষদের সুরে বৌদ্ধমন্ত্র বাঁধা। যুগে যুগে মানসিক ভাবের ও জ্ঞান-কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন হয়। বুদ্ধ যে যুগে জন্মাইয়াছিলেন তখন ভারত এক অভিনব জ্ঞান-জ্যোতির প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিল। যাহাকে আমরা বৌদ্ধ-মন্ত্র, বৌদ্ধ দীক্ষা বা বৌদ্ধজ্ঞান বলি তাহা অপরাপর ব্যাপারের সহিত ঐ জ্ঞান জ্যোতি দ্বারা উদ্দিপীত হইয়াছিল।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং জাতিগঠনের ও স্বরাজলাভের অন্তরায়।

বড় বড় রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের মধ্যে আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন যে আমাদের স্বরাজলাভের ও জাতীয়তার প্রধান অন্তরায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ; এই বিরোধ হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ বা শ্রেষ্ঠ ও অন্ত্যজবর্গের মধ্যে বিশেষ ও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ চোখ রাঙাইয়া বলিতেছেন তোমাদের এই বিরোধের মীমাংসা না হইলে তোমরা স্বরাজলাভ করিতে পারিবে না; এই অবস্থায় তোমাদের "স্বরাজ" অরাজে পরিণত হইবে। দেশের নেতৃবর্গ এই বিরোধ মীমাংসার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া নানাবিধ মিলন বৈঠকের আয়োজন করিয়া কি করিলে হিন্দু মুসলমানে প্রীতি

সংস্থাপিত হইতে পারে তাহার বিধান নির্দ্ধারণে যত্নপর হইয়াছেন। জাতীয় মহাসভা প্রাদেশিক সমিতি ও জেলাসমিতি সমূহ হিন্দুমুসলমান প্রীতি ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রস্তাব পেশ করিতেছে। কোন কোন রাজনৈতিক দল আবার হিন্দুমুসলমানে প্রীতিসংস্থাপনের জন্য চুক্তিপত্রে উভয় সম্প্রদায়কে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এত চেষ্টা এত যত্ন সত্ত্বেও হিন্দুমুসলমানে মিলন সংস্থাপনে বা অনাচরণীয় জাতির উন্নয়নে আমরা এখনও প্রকৃতভাবে কিছুই অগ্রসর হইতে পারি নাই, ইহার কারণ অনুসন্ধান বা এই রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করা বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং এই চেষ্টা ব্যর্থ পরিশ্রম হইবে না মনে করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

প্রথমতঃ আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত এই রোগের ভিত্তি কোথায়; ইহা সত্যকার রোগ না মনের বিকার বা মিথ্যার ভান; ইহা জাতীয় শরীরের হঠাৎ বিকৃতিজনিত উপদ্রব না বাহিক আবহাওয়ার দোষে স্থানিক ক্ষণস্থায়ী অস্বোয়াস্তি। ইহার বীজ ভিতরের না বাহির হইতে প্রক্ষিপ্ত। সর্ব্বোপরি দেখিতে হইবে ইহা কি বাস্তবিকই জাতিগঠনের বা স্বরাজলাভের অন্তরায়। আমি জানি মিলনপ্রয়াসী অনেকের ধারণা যে যতদিন হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আহার বিহার বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক বন্ধন স্থাপিত না হইবে ও যতদিন শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে সামাজিক বন্ধনের সর্ব্ববিধ বাধাবিপত্তি ঘুচিয়া না যাইবে ততদিন স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। এইরূপ ধারণার কোন মূল্য আছে কিনা আমরা পরে আলোচনা করিব। যাবতীয় বিরোধের, সে ব্যক্তিগত হউক কিম্বা সাম্প্রদায়িক হউক, মূল ভিত্তি স্বার্থের সংঘাত। এই বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ হয়ত আমার বাক্যের সমর্থন করিবেন। হিন্দুমুসলমানে কিম্বা ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে যাহা কিছু বিরোধ ইহাদেরও মূলে স্বার্থের সংঘাত। তবে এই স্বার্থ যদি সাম্প্রদায়িক সমষ্টিগত স্বার্থ হয় অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি এই স্বার্থের হানি বা উৎকর্ষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান হয় তবেই এই স্বার্থের সংঘাত জনিত যে বিরোধ তাহা সত্যকার বিরোধ। এই সত্যকার বিরোধ যে জাতিগঠনের বা স্বরাজলাভের প্রধান অন্তরায় এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনে করুন হিন্দু সম্প্রদায় কিম্বা হিন্দুবহুল মন্ত্রিসভা যদি দেশের শাসনদণ্ড লাভ করিয়া এমন আইন কানুন প্রচলন করেন যে তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিমাত্রেরই কিম্বা অধিকাংশেরই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং অন্যদিকে হিন্দুসম্প্রদায়ের অধিকাংশই লাভবান বা ক্ষতিহীন হন তাহা হইলে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হইবে তাহা সত্যকার বিরোধ—তাহাতে স্বরাজ "টিকিতে" পারিবে না। অবশ্যই লাভ বা ক্ষতির মূল্য আর্থিক হিসাবেই ধরিতে হইবে। এবং স্বার্থ বলিতেও আমি আর্থিক স্বার্থকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। এই সত্যকার বিরোধ স্বরাজের প্রধান অন্তরায় এবং স্বরাজলাভ হইলেও স্বরাজকে অরাজে পরিণত করিবে। এইরূপ অন্যদিকে যদি মুসলমান বহুল মন্ত্রিসভা দেশের শাসনদণ্ড লাভ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিমাত্রেরই বা অধিকাংশের লাভজনক আইন কানুন প্রচলন করেন যাহাতে হিন্দুসমাজের অধিকাংশেরই কোন লাভ হয় না কিম্বা অধিকন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলে আবার সেই সত্যকার

সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হইয়া অরাজকতার সৃষ্টি করিবে। এই অবস্থা যেমন হিন্দুমুসলমানের পক্ষে সেইরূপ ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বর্ণের পক্ষেও ঘটিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি দেশের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে তোমাদের এইরূপ সত্যকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে, সুতরাং তোমরা এখনও স্বরাজলাভের উপযুক্ত নও,—তাহা হইলে তাঁহারা কিছু অন্যায় বলিবেন না। এইরূপ অবস্থার সম্ভাবনা থাকিলে দেশের শাসন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের হাতেই সুচারুরূপে পরিচালিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় এইরূপ অবস্থা ঘটিবার কোন সত্যকার সম্ভাবনা আছে কিনা? এতদ্ব্যতীত সামাজিক আচার অনুষ্ঠান বা ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া স্থানে স্থানে যে বিরোধ ঘটিতেছে তাহাকে সত্যকার বিরোধ মনে করা ভুল। এবং সেই সমস্ত বিরোধ যাহা অর্থগত নহে, যাহা শুধু মানসিক প্রবৃত্তি সম্ভূত, তাহা কখনো "স্বরাজলাভের" বা "স্বদেশ শাসনের" অন্তরায় হইতে পারে না। যে সমস্ত অর্থগত বিরোধও বিরোধীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশকে আঘাত করে না তাহাও স্বরাজলাভের বাধা ঘটাইবে না। হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভা যদি বাস্তবিকই মুসলমান বা অন্ত্যজ জাতির উপর অত্যাচার করে, কিম্বা মুসলমান বহুল মন্ত্রীসভা যদি শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করে তাহা হইলে "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আর যদি হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশের উপকারে ব্রতী হয় তবে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই তাঁহাদের শাসন সসম্মানে মানিয়া লইবে। সেইরূপ মুসলমানবহুল মন্ত্রিসভা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশের কল্যাণে রত হইলে হিন্দুমুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। অত্যাচারী হিন্দু মন্ত্রিকে হিন্দুরাও সমর্থন করিবে না এবং অত্যাচারী মুসলমান মন্ত্রীকে মুসলমানেরাও সমর্থন করিবে না।

এখন আলোচনার বিষয় হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভার মুসলমানের উপর এবং মুসলমান বহুল মন্ত্রীসভার হিন্দুর উপর অত্যাচার বা অবিচারের সম্ভাবনা আছে কি না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কেহও আছেন কিনা যিনি মনে করেন যে উপযুক্ত হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভা মুসলমান বা নিকৃষ্ট বর্ণের উপর অধিকতর কর ধার্য্য করিবেন, অথবা হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভা হিন্দুসম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যই শুধু ব্যবস্থা করিবেন এবং মুসলমানবহুল মন্ত্রীসভা শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি ও শিক্ষার ব্যবস্থাতেই অর্থব্যয় করিবেন, উপযুক্ত ও শিক্ষিত হিন্দুমুসলমানের বিরুদ্ধে এইরূপ নিকৃষ্ট ধারণা কেহই পোষণ করেন না। কথাটী আরো একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে করি, দেশের মধ্যে শতকরা ৯০ জনেরও অধিক লোক কি হিন্দু কি মুসলমান কৃষিজীবি, ভূমিকর্ষণ করিয়া ও জমিতে উৎপন্নদ্রব্য বিক্রী করিয়া তাহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের লইয়াই দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়, ইহাদের জীবন যাত্রায় কি হিন্দু বহুল কি মুসলমানবহুল কোন মন্ত্রীসভা যে ব্যাঘাত জন্মাইবে ইহা কেহই সন্দেহ করেন না। আমাদের যাহা কিছু স্বার্থের বিরোধ সে শুধু শতকরা ৮।১০ জন স্বার্থান্বেষী সম্মান ও মর্য্যাদালোভী চাকরীজীবিদের মধ্যে এই মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধকে সাম্প্রদায়িক সত্যকার বিরোধ বলিয়া বাড়াইয়া তোলা আর সত্যের অপলাপ করা দুইই সমান, ইহাতে ঐ স্বার্থান্বেষী কয়েকটি লোকেরই সুবিধা হয় মাত্র। কর্ত্তৃপক্ষও যে এইরূপ স্বার্থান্বেষীর পরামর্শে ভুলিয়া অনেক সময়

আমাদের বলিয়া থাকেন যে তোমরা এখনও "স্বরাজলাভের" উপযুক্ত হও নাই ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে ; এবং অনেকে আরো বিশ্বাস করেন যে কর্তৃপক্ষও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহাদের সমর্থন করিতে দ্বিধা করেন না।

স্মুতরাং মোটের উপর আমরা এখন দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যে জাতীয়তা ও স্বরাজ লাভের অন্তরায় স্বরূপ কোনরূপ সত্যকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই। আমাদের যাহা কিছু বিরোধ সে সাধারণ সামাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া, জগতে কোন জাতিই এই প্রকার সাধারণ বিরোধ হইতে মুক্ত নহে। যে জাতির মধ্যে সামাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন বিশেষ তারতম্য নাই সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত লইয়া বিশেষ বিরোধ ও অনৈক্য রহিয়াছে, এই রাজনৈতিক দলের মতবিরোধ অনেক সময় আমাদের সামাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধ হইতেও গুরুতর আকার ধারণ করে। ইহা ছাড়া ধনী ও শ্রমজীবির বিরোধও অনেক দেশে প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে। তাই বলিয়া কি কেহ বলিবেন যে ঐ সব জাতি "স্বরাজ" সম্ভোগের অনুপযুক্ত। তাঁহারা শত শত বৎসর নির্ব্বিবাদে দেশ শাসন করিতেছেন—এবং তাহাদের দেশকে অসভ্য বা অরাজক বলিতে কেহই সাহস করিবেন না। আবার অন্যপক্ষে দেশে কোন সামাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধ না থাকিলেই যে দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে এই সম্বন্ধেও ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করিবে না। রুসিয়া, চীনবা আয়র্ল্যণ্ডে কোন বিশেষ সামাজিক আচার বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধ নাই, কিন্তু রুশিয়া, চীন বা আয়র্লণ্ডবাসীরা এখনও তাহাদের দেশে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। আমার বলিবার বিষয় এই যে রাজনৈতিক বিরোধ এবং প্রকৃত স্বার্থের সংঘাতেই রাজ্যশাসনের অন্তরায়, সামাজিক আচার বা ধর্ম্মানুষ্ঠান অন্তরায় নহে। তবে স্বার্থান্বেষীরা এই সামাজিক আচার বা ধর্ম্মানুষ্ঠানকে রাজনৈতিক বিরোধে পরিণত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন।

অবশ্য সভ্যতার এমন এক স্তর গিয়াছে যখন ব্যবহারিক ধর্ম্মের জন্য রাজ্যবিস্তার ও অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে, ইউরোপের ইতিহাসে ইহার অনেক বিবরণ আমরা পাই। মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাসও ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মবিস্তারের উদ্দেশ্যেই মুসলমান শাহ ও সম্রাটগণ রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইউরোপ আর এমন ব্যবহারিক বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মকে বড় উচ্চস্থান প্রদান করে না, ইউরোপ এখন ধর্ম্মযাজকের অনুশাসন হইতে মানবের স্বাধীন বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচারকে অধিকতর সম্মান করিতে শিখিয়াছে, তাই আজ ইউরোপের সর্ব্বত্রই প্রজা বা গণতন্ত্রের দ্বারা শাসনযন্ত্র নিয়মিত হইতেছে। গণতন্ত্রে সাধারণতঃ ধর্ম্মোন্মত্ততা বা ব্যক্তিবিশেষের দুরাকাঙ্ক্ষার স্থান নাই। তাই ইউরোপের রাজ্যবিস্তার এখন সমষ্টিগত স্বার্থের দ্বারাই প্রণোদিত। মুসলমান অধিকৃত বা শাসিত রাজ্যেও এই ভাবের আমদানী দেখিতে পাই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আজ নবীন তুরস্ক এই নব ভাবকে বরণ করিয়া লইয়াছে। ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রের প্রাচীন বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া তুরস্ক আজ নিজদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তুরস্কের ত্রাণকর্ত্তা কামালপাশা এই মন্ত্রের প্রধান পুরোহিত। মিশর নামে রাজতন্ত্র হইলেও গণতন্ত্রের অনুকরণে রাজ্য শাসন করিতেছে।

অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ জনমতের প্রাধান্য, এই জন বা প্রজাতন্ত্র স্বভাবতঃই কখনও অত্যাচারী বা অবিচারী হইতে পারে না। স্বার্থান্বেষী লোকের চক্রান্ত ভিন্ন এই জনতন্ত্রে কখনও ধর্ম্মোন্মত্ততা জাগিয়া উঠিতে পারে না, আমাদের ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষেও এই কথা খাটে। ভারতবর্ষে "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠা হইলে তাহা মুসলমান কি হিন্দু স্বরাজ হইবে সেই জন্য কেহই চিন্তিত নন, কারণ সকলেই বুঝিতে পারেন ভারতবর্ষে শুধু একমাত্র প্রজা বা গণতন্ত্রের দ্বারা নিয়মিত "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠারই সম্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জনসমূহ বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে যে যুক্তস্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে তাহাই একমাত্র স্থায়ী শাসনযন্ত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে অন্যবিধ চেষ্টা কখন ও ফলবতী হইতে পারে না। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায় বা খৃষ্টীয় সম্প্রদায় হইতে ধর্ম্মের জন্য যে রাষ্ট্রীয়শাসনের বিঘ্নপ্রদ কোনপ্রকার বিরোধ সৃষ্ট হইতে পারে ইহার কোন আশঙ্কা নাই, হিন্দু ধর্ম্ম তাহার নানাবিধ কুসংস্কার সংকীর্ণতা সত্বেও নিজের রাজ্য বিস্তার করিতে বা পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে চিরকালই নারাজ। হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন এইরূপ ব্যবস্থার ঘোর প্রতিকূল, সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায় হইতেও ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত রাষ্ট্রীয় শাসনের বিঘ্ন ঘটিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমানে যে সামাজিক আচার বা ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া যে সমস্ত অপ্রীতিকর সংঘটন ঘটিতেছে ইহার মূলে স্বার্থান্বেষীর চক্রান্ত থাকিতে পারে ; না থাকিলেও এই সমস্ত সংঘর্ষকে "স্বরাজ" লাভের অন্তরায় স্বরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।

এই সমস্ত সাধারণ সমাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত বিরোধের যাহাতে প্রতীকার হইতে পারে তাহার জন্য দেশের নেতৃবর্গ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন, এই সম্বন্ধে দেশের শীর্ষস্থানীয় হিন্দুমুসলমান নেতাগণ অনেক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহার অধিক কিছু যে আমি বলিতে পারিব এমন ধৃষ্টতা আমার নাই। তবে গ্রামস্থ হিন্দুমুসলমানের নিকটসংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি।

গ্রামবাসী হিন্দুমুসলমানেরা অধিকাংশই কৃষিজীবি বা শ্রমজীবি, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ বিসংবাদ বড়ই কম, তাহাদের বিবাদ বিসংবাদ সাধারণতঃ প্রাত্যাহিক জীবনের খুঁটিনাটি লইয়াই ঘটিয়া থাকে, যাহারা তাহাদের সাহায্য ও উপকার করে হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে তাহারা তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া চলে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে গ্রামবাসী মুসলমানগণ শিক্ষিত হিন্দুভদ্রলোকের নিকট হইতেই তাহাদের অভাব অভিযোগের অধিকতর প্রতীকারলাভ করিয়া থাকে, একবার গ্রীষ্মের অবকাশে যখন গ্রামে ছিলাম তখন দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটি মুসলমান মৎস্যব্যবসায়ী আমাদের গ্রামে আসিয়া হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়, সে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করে ; পাড়ার সমস্ত মুসলমানকে খবর দিয়াও তাহাদের কোনও সাহায্য পাই নাই। আমাদের মধ্যে কয়েকজন উৎসাহী হিন্দুযুবক ও ভদ্রলোকে মিলিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষাও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাত্রিতে তাহার মৃত্যু ঘটে। পরিশেষে তাহার কবরের ব্যবস্থার জন্য হিন্দুদের উদ্যোগী হইতে হয়, অবশ্য পরিশেষে এক মুসলমান জমিদারের সাহায্যে এই কাজ নিষ্পন্ন হয়

অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন হিন্দুরা বেশী শিক্ষিত বলিয়াই দেশের ও দশের কল্যাণ ক্রমে সকলের অগ্রগামী হয়, এবং মুসলমানদের মধ্যে ও শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে তাহারাও যে স্বদেশে ও সাধারণের সেবা ব্রতী হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আমাদেরও বক্তব্য তাই, শিক্ষার সঙ্গে সন্দেহ আমাদের সঙ্কীর্ণতা ক্রমশঃ ঘুচিয়া যাইবে এবং কি হিন্দু কি মুসলমান আমরা সকলেই এখন দেশের ও সাধারণের স্বার্থের জন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র সার্থের ও সংস্কারের বলি দিতে সঙ্কুচিত হইব না।

পল্লী গ্রামে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে হিন্দুর ধর্ম্মোৎসবে সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন শারদীয় পূজা চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও বিবাহোৎসব ইত্যাদিতে মুসলমান গণ আনন্দের সহিত যোগদান করিতেছে এবং মুসলমানগণের ধর্ম্মোৎসবে যেমন মহরম ইত্যাদিতে হিন্দুগণও যোগদান এবং সাহায্য প্রদান করিতেছে, শুধু বড় বড় সহরে যেখানে তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানগণ নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত যেখানেই এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে, স্বীয় স্বার্থসাধনপ্রয়াসী ব্যক্তি গণ নিজের ক্ষুদ্রতাকে গৌরবের আবরণ দিবার জন্যই তাহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে খাঁটী সাম্প্রদায়িক স্বার্থরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন, ইহার একমাত্র প্রতীকার মুসলমান ও হিন্দু গ্রামবাসীগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অবাধ বিস্তার। যখন হিন্দু ও মুসলমান কৃষি ও শ্রমজীবিগণ নিজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারিবে তখন আর তাহারা স্বার্থান্বেষী তথাকথিত হিতার্থী বন্ধুগণের বাক্যে বিপথগামী হইয়া পরস্পরের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি করিবে না। উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের যে বিরোধ তাহার ও একমাত্র প্রতিকার শিক্ষার বিস্তারের দ্বারাই সম্ভব, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ নিম্নবর্ণের সাহায্য ব্যতীত অনেকস্থলে তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে অক্ষম। আজ যদি নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ মিলিত হইয়া উচ্চবর্ণের সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জ্জন করেন তাহা হইলে অনেক স্থানে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ টিকিয়া থাকিতে পারেন না, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ যদি নিম্নবর্ণকে আপনাদের সমাজে স্থান না দেন, তবে নিম্নবর্ণেরাও একদিন তাঁহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবেন, তখন উচ্চবর্ণকে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। অবাধ প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা যখন নিম্নবর্ণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিবে, তখনই এই বিরোধ শান্তির সূচনা হইবে।

এই শিক্ষা শুধু পুরুষের শিক্ষা হইলে চলিবে না, মেয়েদের শিক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন। হিন্দুগণের যাহা কিছু কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা তাহা তাহাদের অন্দর মহলের চতুঃসীমার মধ্যেই জন্ম। বৃদ্ধিলাভ করিয়া পরে সমস্ত সমাজে ছড়াইয়া পড়ে, এই কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করিতে হইলে মাতৃজাতির শিক্ষার দিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে মাতৃস্তন্যের সহিতই শিশুগণ এই কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা পান করিয়া বৃদ্ধিলাভ করে। বর্ত্তমানে বালিকাগণের শিক্ষার ব্যবস্থাই সমাজের ও দেশের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে হইবে, আমাদের নানাবিধ সামাজিক পারিবারিক এমন কি শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির মূল কারণ আমাদের মাতৃজাতির সুশিক্ষার অভাব।

মোটের উপর আমাদের এই ব্যাধির একমাত্র প্রতীকার শিক্ষা।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়।

আমরা ফিউড্যাল্‌তন্ত্রের প্রকৃতি ও প্রভাব পর্য্যালোচনা করিয়াছি। এখন পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় চর্চের ইতিহাস আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। মনে রাখিবেন আমরা খৃষ্টীয় চর্চের আলোচনা করিব, খৃষ্টধর্ম্মের নহে। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মপদ্ধতি ও ধর্ম্মমতের কথা আমি বলিতে আসি নাই; খৃষ্টিয় যাজকতন্ত্র,খৃষ্টিয় যাজকসম্প্রদায়ের শাসন ব্যবস্থার দিকেই আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

পঞ্চমশতাব্দীতে এই যাজক সমাজের গঠন ও ব্যবস্থিতি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; অবশ্য তাহার পর ইহার মধ্যে অনেক বড় বড় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এটা বলা যায় যে সংঘ হিসাবে, খ্রীষ্টপন্থীসমাজের ধর্ম্মশাসন ব্যবস্থা হিসাবে চর্চ তখনই একটা সম্পূর্ণ ও স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল।

পঞ্চম শতাব্দীতে চর্চের অবস্থা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গের অবস্থায় যে কি প্রভেদ ছিল তাহা দৃষ্টিপাতমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ইউরোপীয় সভ্যতার চারিটি মৌলিক উপাদান—পৌরতন্ত্র, ফিউড্যালতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও যাজক-তন্ত্র। পঞ্চম শতাব্দীতে পৌরতন্ত্র রোমসাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষমাত্র, একটা অস্পষ্ট নির্জ্জীব ছায়ামাত্র। চারিদিকের বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে ফিউড্যালিজম্‌ তখনও মাথা তুলিয়া উঠে নাই। রাজতন্ত্র তখন নামে মাত্র আছে। আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার সমস্ত অঙ্গই তখন, হয় জরাজীর্ণ না হয় শৈশবাবস্থ। সে সময়ে চর্চই কেবল যৌবনবলসম্পন্ন ও সুগঠিত, চর্চ্চের মধ্যেই কেবল গতিবেগ ও শৃঙ্খলা, উদ্যম ও নিয়মের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের উপর প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করিতে হইলে স্বাভাবিক সচলতা ও নিয়মশৃঙ্খলার যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক তখন কেবল চর্চের মধ্যেই তাহা ছিল। তাহাছাড়া মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত বড় বড় সমস্যা, মানুষের ভাগ্যনিয়তি সম্বন্ধে যত কিছু সম্ভাবনা,—এক কথায় যে সমস্ত বড় বড় প্রশ্নের দিকে মানুষের মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়, চর্চ সে সমস্তগুলিই লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল। এইরূপে আধুনিক সভ্যতার উপর চর্চের প্রভাব অত্যন্ত অধিক,—এত অধিক যে তাহা চর্চের শত্রুমিত্র উভয়পক্ষেরই ধারণাতীত।

পঞ্চমতশাব্দীতে খৃষ্টীয় চর্চ একটি স্বাধীন ও সুব্যবস্থিত সমাজরূপে দেখা দেয়। একদিকে রাজশক্তিমণ্ডিত ঐহিক শাসনাধিকারী শাসকবৃন্দ, অপরদিকে সাধারণ জনসমাজ, এই উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থরূপে, যোগসূত্ররূপে, উভয়ত্র প্রভাবশীল শক্তিরূপে চর্চের অবস্থিতি।

অতএব ইহার ক্রিয়া ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে জানিতে বা বুঝিতে হইলে তিন দিক দিয়া ইহার আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমে ইহার নিজস্ব স্বরূপটি কি, ইহার আভ্যন্তরীণ গঠন কিরূপ, ইহার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ তত্ত্ব বা নীতির প্রাধান্য, ইহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা দেখিয়া

লইতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে রাজা, ভূস্বামী প্রভৃতি চারিদিকের ঐহিক শাসনী-শক্তির সহিত ইহার সম্বন্ধ কিরূপ ; এবং সর্ব্বশেষে দেখিতে হইবে সাধারণ জনবর্গের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ। এই ত্রিবিধ বিচারের ফলে যখন আমরা চর্চের নীতি, অবস্থান ও অবশ্যম্ভাবী প্রভাব সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ চিত্র খাড়া করিতে পারিব, তখন ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার সহিত আমাদের এই আনুমানিক চিত্রটি মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

সর্ব্বাগ্রে চর্চের স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

চর্চের অস্তিত্বই একটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার। ঐরূপ একটা ধর্ম্মশাসনের ব্যবস্থা, একটা সংঘবদ্ধ যাজক সম্প্রদায়, একটা যাজকপ্রধান ধর্ম্ম যে গড়িয়া উঠিতে ও টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল, ইহাই একটা বড় কথা।

আধুনিক চিন্তালোকপ্রাপ্ত অনেকে মনে করেন "যাজক সম্প্রদায়", "ধর্ম্মশাসন ব্যবস্থা" এই কথাগুলিদ্বারাই ব্যাপারটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। তাঁহারা মনে করেন যদি কোন ধর্ম্ম কালক্রমে গিয়া একটা যাজকতন্ত্রে বা ঐরূপ কোন একটা শাসনপদ্ধতিতে গিয়া পরিণত হয়, তাহা হইলে মোটের উপর সে ধর্ম্মদ্বারা সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই সাধিত হয়। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম মানুষের সঙ্গে ভগবানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ মাত্র ; এবং যখনই এই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভাবটুকু নষ্ট হইয়া যায়, যখনই ব্যক্তিমানব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের আধারস্বরূপ ভগবানের মধ্যে কোন বাহিরের কর্ত্তৃত্বশক্তি আসিয়া পড়ে, তখন ধর্ম্মেরও অবনতি হয়, সমাজও সঙ্কটাপন্ন হয়।

এ প্রশ্নটি ভাল করিয়া বিচার না করিলে আমাদের চলিবে না। খৃষ্টীয় চর্চের প্রভাব কিরূপ হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে, কোন একটা চর্চ বা যাজকতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি হওয়া উচিত তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। এই প্রভাবের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে ধর্ম্ম কি বাস্তবিক পক্ষেই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, বাস্তবিক পক্ষেই কি মানুষের সঙ্গে ভগবানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ মাত্র ব্যতীত ধর্ম্ম হইতে অন্য কোন কিছুর উদ্ভব হয় না,—না ধর্ম্ম হইতে অবশ্যম্ভাবিরূপে মানুষে মানুষে নূতন নূতন সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, একটা ধর্ম্মসমাজ ও ধর্ম্মব্যবস্থা গড়িয়া উঠে।

যদি ধর্ম্ম বলিতে শুধু ধর্ম্মভাব বুঝি—যে ভাব বাস্তব হইলেও অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট ; যাহার প্রকৃতি নির্দ্দেশকরা একরূপ অসাধ্য, যাহা কখনও বাহ্য প্রকৃতি, কখনও বা মানবাত্মার নিভৃত অন্তঃপুর, কখনও বা কাব্য, কখনও বা জগতের ভাবী-রহস্য, অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠে,এক কথায় যাহা সর্ব্বত্রই আপনার চরিতার্থতা খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কোথাও বাঁধা পড়ে না—ধর্ম্ম বলিতে যদি শুধু এই ভাবটুকু মাত্র, তাহা হইলে অবশ্য ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু বলিয়া মনে হয় না। এরূপ একটা ভাবের প্রেরণায় মানুষে মানুষে একটা ক্ষণিক সম্মিলন ঘটিতে পারে ; মানুষের প্রতি মানুষের পরস্পর সহানুভূতিতে এই ধর্ম্মভাবের কতকটা তৃপ্তি এবং পুষ্টিও সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তার দরুণ ইহা কোন স্থায়ী বা যাজক সমাজ বন্ধনের মূলসূত্র হইতে পারে না, ইহা কোন একটা উপদেশ পদ্ধতি বা আচরণ পদ্ধতির সঙ্গে নিজকে খাপ খাওয়াইতে পারে না ; এক কথায়, ইহা একটা ধর্ম্মসমাজ বা ধর্ম্মশাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে না।

কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় এই ধর্ম্মভাব মানুষের ধর্ম্মপ্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রকাশ নহে। ধর্ম্মভাব হইতে ধর্ম্ম একটি বিভিন্ন ও পূর্ণতর বস্তু। মানবের স্বভাব ও পরিণতির মধ্যে এমন সকল রহস্য আছে, যাহাদের চূড়ান্ত মীমাংসা এ জগতের বাহিরে; যাহা কতকগুলি অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ, যাহা মানুষের মনকে একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিতেছে না, যাহাদিগের মীমাংসা উদ্ধার করিবার জন্য মানুষের মন অনবরত লাগিয়া রহিয়াছে। এই সকল সমস্যার মীমাংসা, এবং যে সকল মতবাদ ও বিশ্বাসের মধ্যে এই মীমাংসাগুলি আবদ্ধ আছে—ইহাই হইল ধর্ম্মের আদিমূল ও আধার।

মানুষ আর এক পথ দিয়াও ধর্ম্মে উপনীত হইতে পারে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বোধ হয় স্পষ্ট প্রতীত হইবে চরিত্রনীতি ও ধর্ম্ম পৃথক ও পরস্পর নিরপেক্ষভাবে থাকিতে পারে। নৈতিক সদসদ্বিচার, অসৎপন্থা বর্জ্জন করিয়া সৎপন্থা অবলম্বন করিবার পক্ষে যে দায়িত্ব—এ সমস্ত তত্ত্ব ন্যায়শাস্ত্রের তত্ত্বের ন্যায় মানুষ নিজের স্বভাবের মধ্য হইতেই পায়; তাহার প্রকৃতির মধ্যেই ইহার মূল নিহিত তাহার জীবনক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োগ। কিন্তু চরিত্রনীতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইলেও মানুষের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠে—চরিত্রনীতি আসে কোথা হইতে? কোথায় বা ইহার পরিণতি? এই যে নৈতিক কর্ত্তব্যবোধ ইহা কি একটা স্বতঃসিদ্ধ নিরবলম্ব ব্যাপার, ইহার কি কোন বিধাতা নাই, লক্ষ্য নাই? ইহার পশ্চাতে কি মানুষের একটা সংসারাতীত পরিণতির কথা লুকাইয়া নাই, সেই পরিণতির দিকেই কি ইহা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেয় না? এ প্রশ্ন আপনা আপনি উঠিতে বাধ্য এবং এই প্রশ্নের দ্বারাই চরিত্রনীতি মানুষকে ধর্ম্মের দ্বারদেশে পৌছাইয়া দেয়।

এইরূপে একদিকে মানবপ্রকৃতিগত রহস্যের মধ্যে, অপরদিকে মানুষের নীতিবোধের প্রামাণ্য, উৎপত্তিমূল ও লক্ষ্যসন্ধানের মধ্যে ধর্ম্মের দুইটি সুনির্দ্দিষ্ট মূল পাওয়া গেল। ধর্ম্ম তাহা হইলে প্রথমতঃ, মানুষের প্রকৃতিগত রহস্যসম্ভূত কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি; দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল মতবাদের অনুযায়ী কতকগুলি উপদেশের সমষ্টি, যাহা মানুষের স্বাভাবিক নীতিবোধকে তাৎপর্য্য ও প্রামাণ্য দিতেছে; এবং তৃতীয়তঃ মানুষের চরমপরিণতি সম্বন্ধে কতকগুলি আশ্বাসবাণীর সমষ্টি। এইগুলি লইয়াই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের গঠন। ধর্ম্ম কেবল একটা ভাব বা অনুভূতি নহে, কল্পনার খেলা নহে, শুদ্ধমাত্র কাব্য নহে।

এইরূপে ধর্ম্মের প্রকৃত মূল ও উপাদান এবং যথার্থ প্রকৃতি ধরিয়া দেখিলে ধর্ম্ম আর শুদ্ধ ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে না, ধর্ম্মের মধ্যে একটা প্রবল ও সৃজনশীল সংহতি-শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে কতকগুলি মত ও বিশ্বাসের সমষ্টিরূপে দেখুন:—সেক্ষেত্রে দেখিবেন সত্য কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে; সত্য বিশ্বব্যাপী, স্থানকালপাত্রনির্ব্বিশেষ; মানুষ একাকী নহে, সকলের সহিত মিলিত হইয়াই অলব্ধ সত্যের সন্ধান করিবে, লব্ধ সত্য স্বীকার করিবে। আবার এই সকল মত ও বিশ্বাসের অনুযায়ী উপদেশের সমষ্টি হিসাবে ধর্ম্মকে দেখুন; সে ক্ষেত্রে দেখিবেন একজনের পক্ষে যাহা অবশ্য পালনীয় বিধি, সকলের পক্ষেও তাহাই; এ বিধি-উপদেশ প্রচার করা আবশ্যক, সমস্ত মানুষকে এই বিধির অধীন করিয়া

আনা আবশ্যক। মানুষের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে ধর্ম্মের যে আশ্বাসবাণী, সে ক্ষেত্রেও ঐ রূপ। এ সকল বাণী চারিদিকে প্রচার করা আবশ্যক, সমস্ত মানুষকেই এই আশ্বাসবাণীর ফল আহরণ করিবার জন্য আহ্বান করা আবশ্যক। অতএব ধর্ম্মের মূলপ্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মসমাজের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। তত্ত্বপ্রচার ও সমাজবিস্তারের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য 'প্রোজলিটিজ্‌ম্‌' বলিয়া যে কথাটি ব্যবহার করা হয়, ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষ্যেই তাহার সৃষ্টি এবং ধর্ম্মপ্রচার ক্ষেত্রেই তাহার যথার্থ প্রয়োগ।

ধর্ম্ম হইতে যখন একটা ধর্ম্মসমাজ জন্মলাভ করে, কতকগুলি লোক যখন কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস, সাধারণ ধর্ম্মোপদেশ ও সাধারণ ধর্ম্মাশ্বাস লইয়া সম্মিলিত হয়, তখন সে সমাজের একটা শাসনব্যবস্থাও প্রয়োজন হয়। শাসনব্যবস্থা ব্যতিরেকে কোন সমাজ এক সপ্তাহ, এমন কি একঘণ্টাকালও টিকিয়া থাকিতে পারে না। সমাজ যখন গঠিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই গঠনব্যাপারটি সম্ভব ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্যই একটা শাসনতন্ত্রের আবশ্যক হয়, যাহা সমাজের বন্ধন-স্বরূপ সাধারণ সত্যটিকে প্রচার করিবে, যাহা ঐ সত্যের অনুযায়ী বিধি-উপদেশগুলি শিক্ষা দিবে ও সমর্থন করিবে। অন্যান্য সমাজের ন্যায় ধর্ম্মসমাজের উপরও যে একটা শক্তিকেন্দ্র, একটা শাসনতন্ত্র স্থাপন করা প্রয়োজন, তাহা ঐ সমাজের অস্তিত্ব হইতেই অনুমেয়। এবং শুধু যে শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয় তাহা নহে, স্বাভাবিক নিয়মে তাহা গড়িয়াও উঠে। সাধারণভাবে সমাজে কিরূপে শাসনতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়, সে কথা আলোচনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইটুকুমাত্র বলিব, যে স্বাভাবিক নিয়মের গতি সেখানে কোন বাহিরের শক্তিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায় না, সেখানে শক্তি যোগ্যতমেরই হস্তগত হয়, যাহারা সমাজকে তাহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিবে, তাহারাই সমাজের কর্তৃত্ব শক্তি লাভ করে। সামরিক অভিযানে যিনি বীরশ্রেষ্ঠ, তিনিই নেতৃত্ব লাভ করেন। ঐরূপ যদি কোন সংঘের উদ্দেশ্য হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা তদ্বিধ কোন নৈপুণ্যসাপেক্ষ ব্যাপার, তাহা হইলে যিনি দক্ষতম তিনিই সংঘের অধিপতি হইবেন। সর্ব্ববিষয়েই, যদি স্বাভাবিক নিয়ম অবাধে কাজ করিতে পায়, তাহা হইলে মানুষে মানুষে যে স্বাভাবিক শক্তি বৈষম্য, তাহা সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং যাহার যেটি যথাযোগ্য স্থান সে তাহাই অধিকার করিয়া বসে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও প্রতিভা, স্বাভাবিক বৃত্তি এবং ক্ষমতা হিসাবে মানুষে মানুষে কোনই সাম্য নাই, কেহবা ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতে এবং ধর্ম্মমতের দিকে লোকসাধারণকে আকর্ষণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ; কাহারও বা চরিত্রের মধ্যে এমন একটা নেতৃত্বশক্তি আছে যাহার দ্বারা সে সমাজকে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশপালনে সম্মত করিতে পারে; কেহবা আবার মানুষের মনের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মের আশা জাগাইয়া দিতে ও বাঁচাইয়া রাখিতে বিশেষ পারদর্শী। গুণ ও সামর্থ্যের যে তারতম্যের দরুণ ব্যবহারিক সমাজে কর্তৃত্বশক্তির উদ্ভব হয়, ধর্ম্মসমাজেও সেই তারতম্যের জন্যই কর্তৃত্বশক্তির উদ্ভব হয়। এক একজন মিশনরী বা প্রচারক উঠিয়া পড়ে ও সেনানায়কের মতই আত্মঘোষণা করে। এইরূপে একদিকে যেমন ধর্ম্মসমাজের প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের উদ্ভব হয়, অপরদিকে তেমনি এই তন্ত্রের পুষ্টি ও

পরিণতি মানুষের গুণকর্ম্মের স্বাভাবিক বৈষম্যবশতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়। অতএব দেখা গেল, যে মুহূর্ত্তে মানুষের মধ্যে ধর্ম্মের উদ্ভব হয়, সেই মুহূর্ত্তেই একটি ধর্ম্মসমাজ গড়িয়া উঠে ; এবং ধর্ম্মসমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজের একটি শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠে।

কিন্তু এইখানে একটা গোড়াকার আপত্তি উঠিতেছে। এই ধর্ম্মসমাজের ক্ষেত্রে হুকুম চালাইবার বা জোর খাটাইবার, এক কথায় শাসন ব্যাপারেরও কোন অবকাশ নাই। অবাধ-স্বাধীনতাই যখন এ সমাজের লক্ষণ, তখন ইহার মধ্যে শাসনের স্থান কোথায় ?

নিজের বিধিবিধান মানাইবার জন্য ও হুকুম চালাইবার জন্য প্রত্যেক শাসনতন্ত্র যে বাহ্য-শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ সেই শক্তির মধ্যেই তাহার যথার্থ সত্ত্বা নিঃশেষিত হইয়াছে মনে করি, তাহা হইলে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত স্থূল ও সঙ্কীর্ণ ধারণা করা হইবে।

ধর্ম্মশাসনের কথা ছাড়িয়া দিয়া ঐহিক শাসনতন্ত্রের কথাই ধরুন। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেই ঘটনা পরম্পরায় সকল স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করিয়া দেখুন। প্রথমে ধরুন একটা সমাজ আছে ; সমাজ থাকিলেই সমাজের নাম ও সমাজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটা কিছু কর্ত্তব্য আছে ; হয় ত একটা বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, হয় ত একটা বিধান প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, হয় ত বা একটা রায় প্রকাশ করিতে হইবে। এই সমস্ত সামাজিক প্রয়োজন-সাধনের জন্য একটা যথাযোগ্য আদর্শ প্রণালীও নিশ্চয় আছে ; আদর্শ বিধিই প্রণয়ন করিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বিধানই প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, নির্দ্দোষ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিতে হইবে। আলোচ্যবিষয় যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেকস্থলেই একটা আদর্শ আছে, একটা জ্ঞাতব্য সত্য আছে, এবং সেই সত্য অনুসারেই সমাজের প্রত্যেক কার্য্যের প্রণালী ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই সত্যের সন্ধান লওয়া, কোন্ ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও সমাজের উপযোগী তাহা আবিষ্কার করা—ইহাই শাসনতন্ত্রের প্রথম কর্ত্তব্য। এই সত্যাদর্শের সন্ধান পাইলেই শাসনতন্ত্র ইহা ঘোষণা করিবে। তখন আবশ্যক হয় লোকসমাজের মনের মধ্যে এই সত্য মুদ্রিত করিয়া দেওয়া ; শাসনতন্ত্র যাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহাদের অনুমোদন লাভ করা ; তাহার বিধিবিধান যে ন্যায়যুক্তির অনুকূল, লোকের মনে এই ধারণা উৎপাদন করা। ইহার মধ্যে কি বাহ্যশক্তি প্রয়োগের কোন লক্ষণ পাইলেন ? নিশ্চয়ই না। এখন মনে করুন যে সত্য দ্বারা সমাজের বিধিবিধান শাসিত হওয়া উচিত, তাহা আবিষ্কৃত ও ঘোষিত হওয়া মাত্র সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা তাহাকে স্বীকার করিয়া লইল, সকলেই তাহার নিকট স্ব স্ব স্বাধীন ইচ্ছা অবনত করিল, সকলেই শাসনতন্ত্রের ন্যায়যুক্তিপরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিধিবিধান মানিয়া চলিতে লাগিল। এ ক্ষেত্রেও শাসনপরিচালনের, শক্তিপ্রয়োগের কোন অবসর নাই। তাহা হইলে কি এরূপ স্থলে শাসনতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নাই ? এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে শাসনতন্ত্রের কোন বিশিষ্ট ক্রিয়া নাই ? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রও আছে এবং সে তাহার বিশিষ্ট কর্ত্তব্যও সম্পন্ন করিতেছে। বাহ্যশাসন তখনই আবশ্যক হয় যখন শাসনতন্ত্রাবলম্বিত আদর্শ বা নীতি

সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মতি ও স্বতঃপ্রণোদিত বশ্যতা প্রাপ্ত হয় না, যখন সমাজের ব্যক্তি-বিশেষে এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসে। শাসনতন্ত্র তখন বশ্যতালাভ করিবার জন্য বাহ্য-শক্তি প্রয়োগ করে; ইহা মানুষের স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতার অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং এ অসম্পূর্ণতা সমাজের মধ্যেও আছে, শাসনতন্ত্রের মধ্যেও আছে। এ অসঙ্গতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয় ত কোনকালেই সম্ভব হইবে না; ঐহিক শাসনতন্ত্র মাত্রই কিয়ৎপরিমাণে বাহ্যশাসনশক্তি প্রয়োগ করিতে চিরকালই বাধ্য হইবে। কিন্তু এই বাহ্যশক্তি দ্বারাই কোন শাসনতন্ত্র গঠিত হয় না; যখনই এই শক্তি প্রয়োগ পরিহার করা সম্ভব হয় তখনই সে নিরস্ত হয়, এবং তাহাতে সকল পক্ষেরই প্রভূত কল্যাণ হয়। এমন কি, শাসনতন্ত্র যখন বাহ্যশাসন পরিহার করিতে পারে, এবং মানুষের স্বাধীন ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে, তখনই সে যথার্থ সম্পূর্ণতা লাভ করে। অতএব সে যে পরিমাণে বাহ্যশাসন পরিহার করিবে সেই পরিমাণে সে নিজের যথার্থ প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করিবে। ইহাতে বাস্তবিকপক্ষে তাহার শক্তির হ্রাস বা প্রভাব সঙ্কীর্ণ হয় না; সে তখন আর একপ্রণালীতে কাজ করে মাত্র, এবং সে প্রণালী বাহ্যশক্তি প্রয়োগ অপেক্ষা শতকোটীগুণ ব্যাপক ও প্রবল। যে সকল শাসনতন্ত্র সমধিকপরিমাণে বাহ্য শাসন প্রয়োগ করে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা ঐ পদ্ধতি একেবারেই অবলম্বন করে না বলিলেই হয়, তাহারা অধিকপরিমাণে কৃতকার্য্য হয়।

কেবলমাত্র মানুষের বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করাতে, কেবল-মাত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়ের উপর নির্ভর করাতে শাসনতন্ত্রের সঙ্কোচ না ঘটিয়া বিস্তৃতি ও উন্নতিই সাধিত হয়। তখনই সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য সাধন করে, মহত্তম ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন করে। বিপরীতপক্ষে, যখন তাহাকে কেবলই বাহ্যশাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া চলিতে হয়, তখনই সে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন সে সামান্যই করিতে পারে, এবং যাহা করে তাহাও ভাল করিয়া করিতে পারে না।

অতএব দেখা গেল যে শক্তিপ্রয়োগ ও শাসনদণ্ড পরিচালনই শাসনতন্ত্রের সারতত্ত্ব নহে; শাসনতন্ত্রের প্রধান উপাদান হইতেছে এমন কতকগুলি উপায় ও শক্তির সমষ্টি, যাহা দ্বারা ক্ষেত্রানুযায়ী ব্যবস্থা আবিষ্কার করা যাইবে, যাহা দ্বারা সমাজনীতির সত্য আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই সত্যই সমাজকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে একমাত্র অধিকারী। সুতরাং এই সত্যের আদর্শ সমাজের সমক্ষে ধরিলেই মানুষের চিত্ত স্বভাবতঃই ইহাকে স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে বরণ করিয়া লইবে। অতএব শাসনদণ্ড পরিচালনের কোন অবসর না থাকিলেও শাসন-তন্ত্রের একটা প্রয়োজন ও সার্থকতা থাকিতে পারে ইহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে। এখন, ধর্ম্মসমাজের যে শাসনতন্ত্র, তাহা এই প্রকৃতির শাসনতন্ত্র। এ শাসনতন্ত্রের পক্ষে শক্তিপ্রয়োগ অবশ্যই নিষিদ্ধ; এ যদি শক্তিপ্রয়োগ করিতে যায়, তা সে যে উদ্দেশ্যেই হউক না, কেন, তাহা হইলে ইহার পক্ষে অবৈধ আচরণ হইবে, কারণ ইহার একমাত্র শাসনাধিকার মানুষের বিবেকের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ শাসনতন্ত্রের একটা অস্তিত্ব আছে, তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ সমস্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে কোন কোন

ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বারা মানুষের ভাগ্যসমস্তার সমাধান হয় ; অথবা, যদি ঐরূপ ধর্ম্মতত্ব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সমষ্টি পূর্ব্ব হইতেই থাকে তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ সকল সাধারণ তত্ত্বের কিরূপ প্রয়োগ হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ ও প্রচার করিতে হইবে ; ঐ সকল তত্ত্বের অনুযায়ী উপদেশ ও ব্যবহারবিধি প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে ; জনসমাজে এই সকল উপদেশ শিখাইতে ও প্রচার করিতে হইবে এবং সমাজ পথভ্রষ্ট হইলে পুনরায় তাহাকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কোনরূপ জোর খাটান এখানে চলিবে না ; এ শাসনতন্ত্রের কর্ত্তব্য কেবল ধর্ম্মকর্ত্তব্যের আলোচনা, প্রচার ও শিক্ষণ, এবং প্রয়োজনানুসারে ত্রুটী প্রদর্শন ও তিরস্কার। বাহুশাসন যতই পরিহার করুন না কেন, তথাপি দেখিবেন শাসনতন্ত্র গঠনের সমস্ত মূলগত সমস্তাই মাথা তুলিয়া উঠিবে ও সমাধান দাবী করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ প্রশ্নটী সর্ব্বদাই উঠিবে, সর্ব্বদাই আলোচনা করা আবশ্যক হইবে যে ধর্ম্মের জন্য একসম্প্রদায় ধর্ম্মশাসকের কোন প্রয়োজন আছে কি না, সমাজভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মভাবের প্রেরণার উপর নির্ভর করা সম্ভব কি না। আপনারা জানেন এই প্রশ্ন লইয়া একদিকে অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়, অপরদিকে কোয়েকার দিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঐরূপ একটা ধর্ম্মশাসকবর্গের প্রয়োজন আছে স্বীকার করিয়া লইলেও, এই সকল ধর্ম্মশাসক পরস্পর সমপদস্থ ও সমানাধিকারী হইবেন, সমানভাবে একত্র সম্মিলিত হইয়া আলোচনামীমাংসা করিবেন, না উচ্চ নীচ পদাধিকারক্রমে বিন্যস্ত হইয়া একটী জটীল শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিবেন—এ প্রশ্নেরও কখনও শেষ মীমাংসা হইবে না, কারণ কোন ধর্ম্মশাসকেরই হাতে বাহুশক্তি প্রয়োগের অধিকার নাই। অতএব ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে গিয়া ধর্ম্মসমাজের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব উড়াইয়া না দিয়া বরং ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্মসমাজ স্বাভাবিকরূপেই গড়িয়া উঠে, এবং ধর্ম্মসমাজ হইতে ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের উদ্ভবও তেমনি স্বাভাবিক, এবং কি আকারে এই শাসনতন্ত্রের গঠন হওয়া উচিত, ইহার ভিত্তি কোথায়, ইহার মূলনীতি কি কি, ইহার অধিকারের ন্যায় সঙ্গত সীমা কোথায়—এই প্রশ্নেরই বিচার আবশ্যক। অন্যান্য শাসনতন্ত্রের পক্ষেও যেমন ধর্ম্মশাসনতন্ত্রেরও পক্ষে তেমনি এই প্রশ্নের বিচারই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিচার।

অন্যান্য শাসনতন্ত্রের যে যে গুণে বৈধতা নিষ্পন্ন হয়, ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের পক্ষেও সেই সেই গুণের আবশ্যক। সে গুণ প্রধানতঃ দুইটি :—প্রথমে আবশ্যক যে যোগ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির হস্তে শাসন ক্ষমতা থাকিবে ; সমাজের মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠব্যক্তি ছড়াইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে বাছিয়া আনিয়া তাঁহাদের হাতেই সামাজিক বিধি প্রণয়ন ও শাসনক্ষমতা পরিচালনের ভার দিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ আবশ্যক যে বৈধভাবে গঠিত শাসনশক্তি শাসনভুক্ত প্রত্যেকব্যক্তির বৈধ অধিকার মানিয়া চলিবে। একদিকে শাসনশক্তি গঠনপ্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব, অপর দিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাসংরক্ষণের সুব্যবস্থা, এই দুইটি গুণের দ্বারাই কি ধর্ম্মশাসনতন্ত্র, কি ঐহিকশাসনতন্ত্র, সকলপ্রকার শাসনব্যবস্থারই মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়, এই মাপকাঠিদ্বারাই সমস্ত শাসনতন্ত্রের বিচার হওয়া উচিত।

অতএব খ্রীষ্টীয় যাজকতন্ত্রের অস্তিত্ব ধরিয়াই বিদ্রূপ না করিয়া, আমাদের দেখা উচিত ইহার গঠন কিরূপ, উৎকৃষ্ট শাসনপদ্ধতির যে দুইটি লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা গেল তাহার সহিত

মূলনীতির মিল আছে কি না। এখন এই দুই দিক দিয়া খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রের বিচার করা যাউক।

চর্চের শাসনশক্তির উদ্ভব ও বিস্তার আলোচনাস্থলে খৃষ্টিয় যাজকসম্প্রদায় সম্বন্ধে caste বা জাতি বলিয়া একটা শব্দ প্রয়োগ করা হয়, আমি ঐ শব্দটি বর্জ্জন করিতে চাই। ধর্ম্মশাসকসম্প্রদায়কে অনেক সময় একটা জাতি বলা হয়। জগতের চারিদিকে তাকাইয়া দেখুন; ভারতবর্ষ বলুন, মিশর বলুন, যেখানে যেখানে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছে, সর্ব্বত্রই দেখিবেন জাতি মূলতঃ বংশগত, ইহাদ্বারা পিতার পদ, পিতার অধিকার পুত্রে সঞ্চারিত হয়। যেখানে বংশগত উত্তরাধিকার নাই, সেখানে জাতি নাই, সে সমাজকে জাতি না বলিয়া সংঘ বলা উচিত। সংঘগত ভাবের কতকগুলি অসুবিধা আছে, কিন্তু ইহা জাতীয়ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। "জাতি" কথাটা খৃষ্টিয় চর্চ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। যাজকদিগের চিরকৌমার্য্য তাহাদিগকে কখনও "জাতি" গড়িতে দেয় নাই।

এই বিভিন্নতার ফল আপনারা এখনই কতকটা বুঝিতে পারিতেছেন। জাতিপ্রথা ও উত্তরাধিকার প্রথা অনেকটা এক চেটিয়া ধরণের ব্যাপার। জাতি কথাটার সংজ্ঞায় মধ্যেই ঐ এক চেটিয়ার ভাব রহিয়াছে। যখন বিশেষ বিশেষ পরিবারের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তখন ঐ সকল বৃত্তি ও অধিকার যে ঐঐ পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইবে, যাহারা ঐসকল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহাদের পক্ষে যে ঐ সকল বৃত্তি ও অধিকার অনধিগম্য হইবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই ঘটিয়াছিল, ধর্ম্মশাসনতন্ত্র যেখানে যেখানে একটা জাতির হাতে গিয়া পড়িয়াছে, সেই সেই স্থলেই ইহা একটা বিশিষ্ট অধিকারের আকার ধারণ করিয়াছে, যাহারা ঐ জাতির কোন পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহারা এই শাসনতন্ত্রে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না! খৃষ্টিয় চর্চে এতৎসদৃশ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল যে কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না তাহা নহে, পরন্তু খৃষ্টিয় চর্চ বরাবরই বলিয়া আসিতেছে যে জন্মজাতিনির্বিশেষে সকল ব্যক্তিই চর্চের বৃত্তি অবলম্বন করিতে ও সম্মান পাইতে সমান অধিকারী। বিশেষতঃ পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাজকবৃত্তির দ্বার সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত ছিল। সমাজের উচ্চ নীচ সকল পদবী হইতেই চর্চ লোকসংগ্রহ করিয়া লইত, অধিকাংশ স্থলে নিম্নশ্রেণী হইতেই লইত। চর্চের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্রই অধিকারবৈশিষ্ট্যের রাজ্য, চর্চই কেবল সাম্য ও সমান সমানপ্রতিযোগিতার নীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, সেই কেবল সমাজের মধ্যে যে কেহ গুণশ্রেষ্ঠ জাতিপদবীনির্ব্বিশেষে সকলকেই শাসনক্ষমতা পরিচালনের জন্ম আহ্বান করিয়াছিল। চর্চ যে জাতি নহে, সংঘমাত্র, ইহাই হইল তাহার সর্ব্বপ্রধান ফল।

আবার, জাতিভেদ প্রথার মধ্যে একটা অচলতাব ভাব আছে। এ কথায় কোন প্রমাণ আবশ্যক নাই। যে কোন ইতিহাস খুলিয়া দেখুন, যেখানে যেখানে জাতিভেদ প্রথার প্রাধান্য, সেই সেই সমাজের মধ্যে একটা স্থাবরতার ভাব দেখিবেন। একথা অবশ্য সত্য, যে খৃষ্টিয় চর্চের মধ্যেও এক সময়ে কতকপরিমাণে অগ্রগমনভীতি দেখা দিয়াছিল।

কিন্তু একথা আমরা বলিতে পারি না যে ঐ নীতি চর্চের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিতে পারিয়াছে, একথা বলা যায় না যে খৃষ্টিয় চর্চ অচল ও স্থাণু হইয়া রহিয়াছে। বহু দীর্ঘযুগ ধরিয়া সে সচলভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, কখনও বা বাহিরের আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া, কখনও বা অন্তর হইতেই আভ্যন্তরীণ পুষ্টি ও সংস্কার প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া। মোটের উপর এ সমাজ কেবলই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইহার ইতিহাস বৈচিত্র্যময় ও অগ্রগামী। সকল শ্রেণীর লোককে যাজকবৃত্তিতে বরণ করিয়া লওয়ার ফলেই, সাম্যনীতি অনুসারে লোকসংগ্রহের ফলেই অবশ্য চর্চের সজীবতা ও সচলতা বরাবর রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থিতিস্থাবরতা ধর্ম্মের প্রাধান্য ঘটিতে পারে নাই।

চর্চ ত সকল লোকের নিকট শাসনক্ষমতার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, কিন্তু এ ক্ষমতা পরিচালনের পক্ষে ন্যায্য অধিকার কাহার আছে, যোগ্যতা ও গুণশ্রেষ্ঠতা কাহার আছে তাহা সে কি করিয়া আবিষ্কার করিত?

চর্চের মধ্যে দুইটি নির্ব্বাচননীতির প্রাধান্য দেখিতে পাই। একটি শ্রেষ্ঠের দ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন বা মনোনয়ন, অপরটি নিকৃষ্টদ্বারা শ্রেষ্ঠের নির্ব্বাচন, অর্থাৎ আজকাল নির্ব্বাচন বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহাই।

যাজক নিয়োগের ক্ষমতা, কোন লোককে যাজকপদে বরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা কেবল সংঘাধিপতির অধিকারে। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন হইল। সেইরূপ ফিউড্যাল-স্বত্ব-সম্পর্কিত কোন কোন যাজকবৃত্তিবন্টনের সময় রাজা বা পোপ বা ভূস্বামী বৃত্তিভোগীর নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে আবার যথার্থ নির্ব্বাচন প্রণালীই অবলম্বিত হইত। বিশপ্‌রা বহু পূর্ব্ব হইতেই, এবং আমাদের আলোচ্য যুগেও, প্রায়শঃ যাজকসংঘকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন, অনেক সময়ে উপাসকবর্গও এই সকল নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ করিত। মঠের মধ্যে মঠধারী সন্ন্যাসীবর্গই মঠের আবট্‌ বা মোহন্ত নির্ব্বাচন করিত। রোমে কার্ডিনাল্‌সংঘ কর্ত্তৃক পোপের নির্ব্বাচন হইত, এক সময়ে সমগ্র রোমীয় যাজকবর্গ এই নির্ব্বাচনে যোগদান করিত। এইরূপে চর্চের ইতিহাস, বিশেষতঃ আমাদের আলোচ্য যুগে দুইটি নির্ব্বাচননীতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—এক শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন, আর এক নিকৃষ্টের দ্বারা শ্রেষ্ঠের নির্ব্বাচন। হয় পূর্ব্বোক্ত নয় শেষোক্ত প্রণালীতে চর্চ ধর্ম্মশাসনক্ষমতার একাংশ পরিচালনের জন্য লোকনির্ব্বাচন করিয়া লইত।

উভয়পদ্ধতি যে একত্র পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল তাহাই নহে, উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধও ছিল। বহুশতাব্দীব্যাপী বহুপরিবর্ত্তনের পর খৃষ্টিয় চর্চে শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টনির্ব্বাচন-পদ্ধতিই প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু, সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, নিকৃষ্টদ্বারা শ্রেষ্ঠের নির্ব্বাচন—এই পদ্ধতিরই অধিক প্রসার ছিল। এইরূপ দুইটি বিরুদ্ধ নীতির একত্র সমাবেশে বিস্মিত হইবেন না। সাধারণসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, জগতের স্বাভাবিক গতি পর্য্যালোচনা করুন, জগতের মধ্যে অধিকার ও ক্ষমতা কিরূপে সঞ্চারিত হয় দেখুন, এই সঞ্চার ব্যাপার কখনও প্রথমোক্ত নীতিঅনুসারে কখনও দ্বিতীয়োক্ত নীতিঅনুসারে সম্পন্ন হয়। চর্চ এ নীতিদ্বয়ের সৃষ্টি করে

নাই ; মানবব্যাপারে বিধাতার শাসন পদ্ধতির মধ্যেই এই নীতি সে পাইয়াছে এবং তাহা হইতেই সে ইহা গ্রহণ করিয়াছে। উভয়ের মধ্যেই সত্য আছে, উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে ; অনেক সময়ে উভয়নীতির সম্মিলনই যথার্থ শাসনাধিকারী নির্ব্বাচনের শ্রেষ্ঠ উপায়! আমার মনে হয় এ একটা পরমদুর্ভাগ্য যে উভয়ের মধ্যে কেবল একটি নীতি—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন চর্চের প্রাধান্য লাভ করিল। এ নীতি কিন্তু কখনই সম্পূর্ণ একাধিপত্য করিতে পারে নাই ; নানা বিচিত্র নামে, বিভিন্ন যুগে এই দুই নীতির সংঘর্ষ চলিয়া আসিয়াছে—তাহাতে প্রথম নীতিটি পরাজিত হইলেও অন্ততঃ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে ও চিরপ্রতিষ্ঠিত শক্তিকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি তখন এই সাম্যনীতি অবলম্বন ও যোগ্যতার আদর করায় চর্চের প্রভূত বলবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। চর্চই তখন সর্ব্বজনপ্রিয় সমাজ ছিল, সর্ব্বপ্রকার প্রতিভা ও যোগ্যতার পক্ষে ইহা সহজাধিগম্য ও মুক্ত দ্বার ছিল; মানব প্রকৃতির যত মহদাকাঙ্ক্ষা, তাহা চরিতার্থ করার পক্ষে ইহা একমাত্র সুগম ক্ষেত্র ছিল। ইহাই হইল ইহার শক্তির যথার্থ স্থল, এ শক্তি তাহার অর্থ সম্পত্তি হইতেও উদ্ভূত হয় নাই, যুগে যুগে যে সমস্ত অবৈধ উপায় সে অবলম্বন করিয়াছে তাহা হইতেও হয় নাই।

ব্যক্তিস্বাধীনতার মর্য্যাদাবোধরূপ সুশাসনপদ্ধতির যে দ্বিতীয় লক্ষণ, সে বিষয়ে চর্চের অনেক ত্রুটি ছিল। চর্চের মধ্যে দুইটি কুনীতির একত্র সন্নিবেশ ঘটিয়াছিল :—একটি চর্চের মতবাদের সহিত অনুস্যূত ও অবিচ্ছেদ্য ; অপরটি মানুষের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য হইতে উদ্ভূত, চর্চের মতবাদের অনিবার্য্য ফল নহে।

প্রথমটা এই যে চর্চ ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির অধিকার অস্বীকার করে, সে সমগ্র ধর্ম্ম-সমাজের মধ্যে স্বানুমোদিত ধর্ম্মবিশ্বাস চালাইবার দাবী করে, সে কাহারও স্বাধীনভাবে বিচার করিবার অধিকার স্বীকার করে না। এ নীতি প্রবর্ত্তন করা সহজ, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে চালান তত সহজ নহে। মানুষের বুদ্ধি নিজে স্বীকার করিয়া না লইলে তাহার মধ্যে একটা নূতন মত বা বিশ্বাস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় না বিশ্বাসটিকে প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ যোগ্য করিয়া তোলা চাই। সে যে আকারেই উপস্থিত হউক না কেন, যত বড় নামেরই দোহাই দিক না কেন, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে বিচার করিয়া লইবে, সে বিশ্বাস যদি লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করে, তাহা হইলে মানুষের বিচারবুদ্ধি তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়াই সে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছে। এইরূপে মানুষের বুদ্ধির উপর যে কোন ধারণা বা বিশ্বাস চাপাইবার চেষ্টা করা হয়, মানুষের বুদ্ধি তাহা লইয়া স্বাধীনভাবে বিচার বিতর্ক করিবেই ; ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নানা প্রচ্ছন্ন আকারে আত্মগোপন করিতে পারে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একথা খুব সত্য যে মানুষের বুদ্ধিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, সে কিয়ৎপরিমাণে নিজকে বিকলাঙ্গ ও স্বাধিকারভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে, তাহাকে নিজের বৃত্তিগুলির অপব্যবহার বা অসম্পূর্ণব্যবহার করিতে সম্মত করা যাইতে পারে। চর্চ-প্রবর্ত্তিত উল্লিখিত কুনীতির ফলে ইহাই বাস্তবিকপক্ষে

ঘটিয়াছিল। কিন্তু এনীতির বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ প্রভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিব ইহা কখনই সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না বা পারে নাই।

চর্চ প্রবর্ত্তিত দ্বিতীয় কুনীতি এই যে সে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা লোককে বাধ্য করিবার অধিকার দাবী করে। বাস্তবিকপক্ষে এ অধিকার ধর্ম্মসমাজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, চর্চের উদ্ভব-তত্ত্বের বিরোধী, চর্চ্চের আদিম নীতি ও উপদেশের প্রতিকূল। সেন্ট আম্ব্রোস্, সেন্ট হিলারী, সেন্ট মার্টিন প্রভৃতি চর্চের সুপ্রসিদ্ধ আদিম নেতৃগণ এ অধিকার স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তথাপি ইহা চর্চের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। লোককে শারীরিক দণ্ড দেওয়া, অত্যাচারের দ্বারা পাষণ্ডদলন, মানবচিন্তার স্বাধীন গতির প্রতি অবজ্ঞা,—এ কুনীতি পঞ্চমশতাব্দীর পূর্ব্বেই চর্চে প্রবেশলাভ করিয়াছিল; এবং ইহার জন্য চর্চকে কম দুর্দ্দশাভোগ করিতে হয় নাই।

অতএব যদি চর্চ-শাসনভুক্ত ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতার সম্পর্কে চর্চের বিচার করি, তাহা হইলে দেখিব এ বিষয়ে চর্চের শাসননীতি তাহার নেতৃনির্ব্বাচননীতি অপেক্ষা অবৈধ ও অকল্যাণকর। তাই একথা মনে করা উচিত নহে যে একমাত্র কুনীতিদ্বারা সমস্ত প্রতিষ্ঠানই দূষিত হইয়া যায়; বা তাহার মধ্যে যাহা কিছু মন্দ দেখা যায়, সমস্তই ঐ একমাত্র কুনীতি হইতে প্রসূত। বিশুদ্ধন্যায়ের যুক্তি যেমন ইতিহাসকে সত্যভ্রষ্ট করে তেমন আর কিছুই নহে। একটা বিশেষ চিন্তা বা ধারণা যখন মানুষের মনকে অধিকার করিয়া বসে, তখন সে ঐ একটি তত্ত্ব হইতে যতকিছু ব্যাপারের উদ্ভব হওয়ার সম্ভব, যুক্তিবলে সবগুলি টানিয়া বাহির করে এবং সবশুদ্ধ ইতিহাসের ঘাড়ে চাপাইয়া বসে। কিন্তু বাস্তবজগতে ঠিক এইরূপ ঘটে না; মানুষের ন্যায়বুদ্ধির নিকট কার্য্যকারণের যেরূপ অব্যবহিত সম্বন্ধ, বাহ্যঘটনার ক্ষেত্রে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। জগতের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই ভালমন্দের এমন একটা সুনিবিড় সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে মানবসমাজ বা মানবাত্মার সুগভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলেও দেখিতে পাইব এই দুই তত্ত্ব পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিতেছে, পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে কিন্তু কেহ কাহাকেও নির্ম্মূল করিতে পারিতেছে না। মানবপ্রকৃতি কখনও ভালমন্দ কোনটিরই চরমসীমায় পদার্পণ করে না; সে অনবরত একটি হইতে অপরটিতে যাতায়াত করিতেছে, কখনও বা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মাথাখাড়া করিয়া উঠিতেছে, আবার কখনও বা দৃঢ়পদক্ষেপে চলিতে চলিতে হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। যে বৈষম্য, বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব আমি ইউরোপীয় সভ্যতার মূলগত প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি এক্ষেত্রে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব। (ক্রমশঃ)

(শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(১৩)

এইবার বঙ্কিমের সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। চারিখানি উপন্যাসকে এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে—বিষবৃক্ষ (১লা জুন, ১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), রজনী (২রা জুন, ১৮৭৭), ও কৃষ্ণকান্তের উইল (২৯শে আগষ্ট, ১৮৭৮)। বঙ্কিম সামাজিক উপন্যাসেও রোমান্সের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই—তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিও অনেকটা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। 'রজনী'তে এই অতিপ্রাকৃত ও অসাধারণের স্পর্শ খুব সুস্পষ্ট; 'বিষবৃক্ষে'ও একটা সাঙ্কেতিকতার আভাস বর্ত্তমান; 'ইন্দিরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই প্রভাব হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে—কিন্তু এই দুইখানি উপন্যাসেও অনৈসর্গিকের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই; 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' এই দুইখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নহে, ইহাদের মধ্যে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা ঘটনা বৈচিত্র্যেরই প্রাধান্য বেশী; 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই দুইখানিই প্রকৃত উপন্যাস-পদ বাচ্য, উপন্যাসের অর্থ-গৌরব ও সমস্যা-বিশ্লেষণ ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। সুতরাং আর্টের ক্রম-বিকাশের দিক দিয়া প্রথমোক্ত উপন্যাস দুইটীর আলোচনা প্রথম হওয়া উচিত। আমরা এখানে এই প্রণালীই অবলম্বন করিব।

ইন্দিরা একটা ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস; কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র অবয়ব ঘটনা-বিন্যাসে অনবদ্য, তীক্ষ্ণ পরিহাস নিপুণতায় উপভোগ্য, সুরুচি-সম্মত হাস্যালোকপাতে ভাস্বর। একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আভা শাণিত ছুরিকার চাকচিক্যের ন্যায়ই গল্পটীকে উজ্জ্বল করিয়াছে; এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একটা স্ত্রীজনোচিত মাধুর্য্য ও সহৃদয়তার একটা কোমল প্রেম-বিহ্বলতায় মণ্ডিত হইয়াছে; পুরুষের পাণ্ডিত্যাভিমান ও অনিপুণ কর্কশতা কোথাও ইহাকে স্পর্শ করে নাই; রমণীর সুরই গল্পটীর আদ্যোপান্ত অভ্রান্তভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। অবশ্য চিলিয়ানওয়ালা ও শিখদের বিশ্বাস-ঘাতকতা উল্লেখ বঙ্গ-পুরস্ত্রীর মুখে একটু অসঙ্গতই শুনায়; কিন্তু এরূপ ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত খুবই বিরল; বিশেষতঃ শিখ-যুদ্ধপ্রত্যাগত রসদ-বিভাগের কর্ম্মচারীর পত্নীর পক্ষে এরূপ খবর রাখা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নাও হইতে পারে। এই বিষয়ে 'রজনী'র সহিত 'ইন্দিরা'র একটী গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। 'রজনী'তে বিভিন্ন বক্তা বক্ত্রীদের মধ্যে বিশেষ কোন ভাষা-গত পার্থক্য রক্ষা করা হয় নাই, স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলের মুখেই একরূপ ভাষা ধ্বনিত হইয়াছে, সে ভাষা লেখকের নিজের ভাষা হইতে অভিন্ন। অবশ্য বঙ্কিম যে এরূপ একটা প্রভেদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে; রজনীর অন্ধতা, অমরনাথের দার্শনিকোচিত চিন্তাশীলতা, শচীন্দ্রের ভিন্ন প্রকৃতির বুদ্ধিমত্তা, লবঙ্গলতার রমণীসুলভ স্নেহশীলতা ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসপ্রবণতা—এই প্রবৃত্তি

গুলির বিশেষ প্রভাব তাহাদের মুখনিঃসৃত ভাষাতে প্রতিফলিত করিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু চেষ্টা বিশেষ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'রজনী' সমালোচনার সময় এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইবে।

'ইন্দিরা'র উপাখ্যান ভাগ নিতান্তই সামান্য; দস্যুহস্তে অপহরণের পর ইন্দিরার দুঃখ ও স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন, ইহাই ইহার মুখ্য বিষয়। এই সামান্য আয়তনের মধ্যে কোন গভীর সমস্যা আলোচিত হয় নাই, এবং বোধ হয় কোন গভীর সমস্যার অবসরও ছিল না। কিন্তু গ্রন্থখানির স্বল্প-সংখ্যক পরিচ্ছেদ গুলি একটা উদ্বেল আনন্দ-রসে সিঞ্চিত, একটা করুণ-মধুর সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রগুলি—ইন্দিরা, সুভাষিণী, তাহার শাশুড়ী কালির বোতল, সোণার মা পাচিকা ও হারাণী ঝি—অল্প কয়েকটী রেখাপাতেই জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের ঘটনা-বিরল জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণরসের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছেন; একটী পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জীবনের বিচিত্র লীলা ও চিত্তাকর্ষক ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র দেখাইয়াছেন। অবশ্য ইহাদের কাহারও মধ্যে বিশেষ একটা চরিত্রগত গভীরতা নাই: সকলেই কতকগুলি সাধারণ ও প্রাথমিক ভাবেরই বিকাশ দেখাইয়াছে; ইন্দিরার অদম্য কৌতুকপ্রিয়তা, সুভাষিণীর সরল ও আন্তরিক সহানুভূতি, গৃহিনীর সন্দেহ-প্রবণতা ও পুত্রস্নেহ, সোণার মার কৌতুক-জনক ঈর্ষা ও আত্মবিস্মৃতি খুব গভীর স্তরের ভাব নহে; কিন্তু ইহারাই আমাদের সাধারণ জীবনের উপাদান; আমাদের অধিকাংশের জীবনের যাহা কিছু রস, যাহা কিছু বৈচিত্র্য, তাহা ইহাদেরই ক্রিয়া ও পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। অধিকাংশেরই জীবনে খুব গভীর স্তর থাকে না; ইহাদের প্রকৃতির মধ্যে গভীরতা ও জটিলতা খুঁজিতে গেলে চরিত্রসৃষ্টি প্রায়ই অস্বাভাবিক হইয়া উঠে; বিশ্লেষণ-প্রাচুর্য্য ও বিশ্লেষণ-যোগ্য পদার্থের মধ্যে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্য জন্মে; অথবা এই সমস্ত উপর স্তরের নীচে যে একটা আদিম পাশবিক স্তর আছে তাহাতেই অবতরণ করিতে হয়। সুতরাং ইন্দিরার চরিত্রগুলির মধ্যে গভীরতা না থাকুক, স্বাভাবিকতা যথেষ্ট আছে।

গ্রন্থমধ্যে যদি কোথাও কলা-কুশলতার দিক্ হইতে কোন সন্দেহের অবসর আছে, তবে তাহা ইন্দিরার স্বামিলাভের জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের বিবরণে। এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত গ্রন্থিই সমান বিচারসহ নহে; বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিজেকে স্বামীর উপর বিদ্যাধরী বলিয়া চালাইবার চেষ্টা ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। তবে বঙ্কিম ইন্দিরার স্বামীকে কুসংস্কারপ্রবণ ও ভূত-প্রেতে বিশ্বাসবান বলিয়া বর্ণনা করিয়া ব্যাপারটাকে অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামীকে বশীভূত করিবার অন্যান্য উপায় ও প্রচেষ্টাগুলি খুব সুকৌশলেই নির্ব্বাচিত হইয়াছে, স্ত্রীজাতির মোহ বাড়াইবার অমোঘ অস্ত্রগুলি আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। মোটের উপর 'ইন্দিরা' সরল বর্ণনায়, অফুরন্ত হাস্যরসে, ও একটা অবর্ণনীয় স্ত্রীজাতিসুলভ মাধুর্য্য ও রমণীয়তায় উপভোগ্য হইয়াছে।

'ইন্দিরা' ও 'রজনী'তে বঙ্কিম উপন্যাস-ক্ষেত্রে একটী নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, আখ্যায়িকাটী নিজে না বলিয়া উপন্যাসের চরিত্রগুলিকেই বক্তার আসনে বসাইয়াছেন। 'ইন্দিরা'তে একমাত্র ইন্দিরাই বক্ত্রী; সুতরাং এখানে ব্যাপার ততদূর জটিল হয় নাই; কিন্তু 'রজনী'তে উপাখ্যানটী বলিবার ভার অনেকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থাতে বঙ্কিম একটী নূতন গুরুতর দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে চাপাইয়াছেন; প্রত্যেক বক্তার প্রকৃতির সহিত তাহার ভাষার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই; বিভিন্ন বক্তার চরিত্রানুযায়ী ভাষাগত প্রভেদ বঙ্কিম রক্ষা করিতে পারেন নাই। নায়িকা রজনী সম্বন্ধেই এই বিষয়ে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায়; অন্যান্য চরিত্রের সাক্ষ্য হইতে অন্ধ রজনীর যে কোমল, ব্রীড়া-সঙ্কুচিত, প্রকাশ-বিমুখ, সমবেদনাপূর্ণ ও স্বার্থবিসর্জ্জনতৎপর প্রকৃতিটী ফুটিয়া উঠে, তাহার নিজের পরিহাসনিপুণ, মৃদু বিদ্রূপ-মণ্ডিত, ও বিশ্লেষণকুশল উক্তিগুলি ঠিক তাহার সমর্থন করে না। তারপর তাহার মুখে যে সমস্ত গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ দার্শনিকোচিত উক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার প্রকৃতির পক্ষে ঠিক শোভন হয় নাই, তাহা অমরনাথ বা শচীন্দ্রের মুখে অধিকতর সঙ্গত হইত। আবার তাহার কথাবার্ত্তায় যেরূপ গভীর সংসারাভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাও তাহার মত সমাজসংস্রব-রহিত সরল অন্ধ যুবতীর পক্ষে অনধিগম্য বলিয়াই মনে হয়। তবে রজনীর চরিত্রসম্বন্ধে যে অসামঞ্জস্যের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব নয়। রজনীর শান্ত, স্তব্ধ পাষাণোপম মূর্ত্তির অভ্যন্তরে যে একটা প্রবল প্রেমের আগ্নেয়গিরি জ্বলিতেছে, তাহা তাহার নিজেরই জানার সম্ভাবনা আছে; অপরের পক্ষে অন্ধের রূপোন্মাদ ও প্রবল চিত্তচাঞ্চল্য উপলব্ধি করা যে কত দুরূহ তাহা শচীন্দ্রের উক্তিতেই প্রমাণ হইয়াছে। অন্তঃপ্রকৃতির এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, হৃদয়ের গোপন রহস্যের এরূপ পূর্ণ উদ্ঘাটন অপরের নিকট আশা করা যায় না, সুতরাং রজনীর আত্মপরিচয় ও অপরের বিবরণের মধ্যে এরূপ একটা অনৈক্য থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ গল্পের যে অংশে উপাখ্যানের সূত্র রজনীর হাত হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার জীবনের একটা সন্ধিস্থল; তখন সে নির্জ্জন অন্তর্গূঢ় প্রেমের ধ্যান হইতে বাহ্য জগতের কোলাহলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই সময় তাহার চরিত্রের একটা পরিবর্ত্তন ঘটাও সঙ্গত। অমরনাথ ও শচীন্দ্র যখন বক্তার আসন গ্রহণ করিলেন, তখন রজনীর উপর বাহিরের জগতের দৃষ্টি পড়িয়াছে; সে তখন একটা বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার প্রেম লইয়া একটা কাড়াকাড়ি, একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া গিয়াছে, তাহার অন্ধকার-হৃদয়-কন্দরাবদ্ধ চিন্তা এখন বাহ্যজগতের জটিল সম্পর্কজালের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াছে; সে নিজের নবলব্ধ প্রাচুর্য্য হইতে বিলাইতে বসিয়াছে; কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতেছে; এই সময় তাহার অন্তরের উচ্ছ্বাস অনেকটা শান্ত-সংযত হইয়া আত্মস্থ কোমল, মধুর রমণীপ্রকৃতিটী প্রস্ফুট করিয়া দিতেছে। আবার এই সময় রজনীর হৃদয়বিশ্লেষণের কাজ তাহার নিজের হাত হইতে অপরের হাতে চলিয়া গিয়াছে; তাহার আভ্যন্তরীণ [illegible]

চিত্রটী কাজেই ফুটিয়া উঠে নাই ; অমরনাথ বা শচীন্দ্র প্রেমিকের মুগ্ধদৃষ্টিতেই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে ; লবঙ্গলতাও তাহাকে বাহিরের দিক হইতেই, দয়াবতী, পরদুঃখকাতরা রমণীরূপেই দেখিয়াছে। সুতরাং রমণীর এই দুই চিত্রের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য অনেকটা অপরিহার্য্য। কেবল অমরনাথের ক্ষেত্রেই উক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে একটা যথেষ্ট সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় ; তাহার উদাসীন, সংসার-বিমুখ, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু প্রকৃতি তাহার বাক্যের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। শচীন্দ্রের বাক্যে বা চরিত্রে সেরূপ উল্লেখ-যোগ্য বিশেষত্ব কিছুই নাই। লবঙ্গ-লতার ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে অতি-প্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাসের—'আমার বউএর পিতলের টুকনি সোণা করিয়া দিয়াছিলেন। উনি না পারেন কি ?'—ইত্যাদি উক্তির সামঞ্জস্য করা একটু কঠিন।

বঙ্কিম 'রজনী'তে যে বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার আর একটী বিপদ আছে। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা যে তাহাদের নিজ নিজ অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়াছে, তাহা একদিকে খুব সরস ও জীবন্ত হইয়াছে ; কিন্তু এখানে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনার কোন্ অংশ বা stage হইতে তাহাদের এই আত্ম বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে ? অবশ্য ঘটনা শেষ হইবার পরেই বিবৃতি আরম্ভ হইয়াছে ; শচীন্দ্র-রজনীর প্রেম সার্থকতা লাভ করার পরেই সকলে আপন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তাহা হইলে লিখিবার সময় প্রত্যেকেই শেষ পরিণতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল না। এখন এই শেষ পরিণতির জ্ঞান তাহাদের অতীতের বিশ্লেষণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে কি না, বা করিয়া থাকিলে কতদূর করিয়াছে, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। উপন্যাসের পাত্র পাত্রীরা যখন কোন বিশেষ ঘটনার আলোচনা করিতেছে, তখন তাহাদের দৃষ্টি বর্ত্তমানেই সীমাবদ্ধ, না ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে তাহার লক্ষ্য আছে ? অবশ্য লেখক নিজে বর্ণনা করিলে, এ সমস্যা আসে না ; কেননা তিনি উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভাগ্য-বিধাতা, তাহাদের সম্বন্ধে ত্রিকালদর্শী ; বর্ত্তমানের ক্ষুদ্রতম ঘটনার সহিত অতীতের অঙ্কুর ও ভবিষ্যৎ পরিণতির সংযোগ তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান। কিন্তু উপন্যাসের মানুষগুলি যখন আপন আপন কাহিনী বর্ণনা করিবার ভার লয়, তখন একটা অসুবিধা এই হয় যে বর্ত্তমানের আলোচনায় শেষকালের জ্ঞান তাহারা ধরিয়া লইবে কি না ; পদে পদে এরূপ ভবিষ্যৎ পরিণতির জ্ঞান ধরিয়া লইলে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের রস জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে না, বর্ত্তমান বিপদ বর্ণনার সময় যদি আমি আসন্ন উদ্ধারের উল্লেখ করি, তাহা হইলে নাটকোচিত সুসঙ্গতির (dramatic fitness) হানি হয় ; আবার কেবল বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিলে, বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখাইলে চিত্র খণ্ডিত, আংশিক ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই উভয় সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া খুব উচ্চাঙ্গের প্রতিভা ভিন্ন সুসাধ্য হইতে পারে না।

এইবার কতকগুলি বিশেষ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টীর আলোচনা করা যাউক। রজনীর উক্তিটী একেবারে আদ্যোপান্ত একটা গভীর ক্ষোভ ও খেদের সুরে পরিপূর্ণ ; তাঁহার প্রেম যে এরূপ আশাতীত সাফল্য লাভ করিবে, তৎসম্বন্ধে কোন পূর্ব্বজ্ঞান তাহার উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে তাহার

দৃষ্টি—হীরালালের সহিত তাহার গৃহত্যাগ ও বিজন-গঙ্গা-সৈকতে তৎকর্ত্তৃক বিসর্জ্জন—ইহাতেই সীমা-বদ্ধ; তৎপরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞানের পরিচয় পাই না। রজনীর চক্ষে এইখানেই তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতন; তাহার যাহা-কিছু খেদোক্তি, ও নৈরাশ্য ভাব, সৃষ্টি-বিধানের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বিদ্রোহ-জ্ঞাপন, সমস্তই এই সময়ের মানসিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই বর্ত্তমানের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ (concentration) নিশ্চয়ই আখ্যানের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে; বর্ণনার মধ্যে একটা উচ্ছ্বসিত ভাব প্রাবল্য আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু এইখানে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতিও আসিয়া পড়িয়াছে—ভবিষ্যতের বর্জ্জন লেখক যেরূপ সম্পূর্ণভাবে করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই; রজনীর আখ্যায়িকার দুই একটী উপাদান ভবিষ্যৎ হইতে আহরণ করিতে হইয়াছে। যেমন হীরালালের অসচ্চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান। এইখানে রজনীর উক্তি এই :—"আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই, পশ্চাৎ শুনিয়াছি" (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ); এই পরবর্ত্তী জ্ঞান লাভ যে কখন হইল, হীরালালের জীবনীর সহিত বিস্তৃত পরিচয় যে কিরূপে সম্ভব হইল—যদি গঙ্গাতীরে বিসর্জ্জনই রজনীর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত বলিয়া মনে করি তাহা হইলে—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না। অবশ্য এই ঘটনার পূর্ব্বে হীরালালের অসচ্চরিত্র সম্বন্ধে রজনীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, এই কথা বলিলে কোন দোষ হইত না; কিন্তু "পশ্চাৎ শুনিয়াছি" এই কথা স্বীকার করিলে, ও হীরালালের অতীত জীবনের বিস্তৃত কাহিনী সংগ্রহ করিলে বর্ত্তমানের সীমা রেখা অতিক্রম করিতে হয়, ও যে ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে যাওয়া হইয়াছিল, তাহারই আশ্রয় লইতে হয়। সেইরূপ প্রথম খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদে "কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবন-চরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।" এই উক্তিই ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে বলিয়া রজনীর মুখে সুসঙ্গত হয় নাই। আবার রজনীর নিজ অন্ধত্ব সম্বন্ধে যে খেদোক্তি, আলোকের ধারণা পর্য্যন্ত করিতে তাহার অক্ষমতাও সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমানেই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; নচেৎ তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিলাভের সহিত এ অংশের সমন্বয় করা কঠিন হইবে। যদিও অন্ধের আত্ম-বিশ্লেষণ কলা কৌশল ও কল্পনা-সমৃদ্ধির দিক্ হইতে প্রায় অনবদ্য হইয়াছে, তথাপি একটী ক্ষুদ্র চ্যুতি বঙ্কিমের সূক্ষ্ম দৃষ্টিকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—যথা হীরালাল সম্বন্ধে রজনীর উক্তি—"হীরালাল তৎকালে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ সেদিক্ দেখিতে লাগিল"—এ তথ্য আবিষ্কার যে অন্ধের ক্ষমতাতীত, সে বিষয়ে চক্ষুষ্মান্ গ্রন্থকারের মুহূর্ত্তজন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল।

অমরনাথের উক্তির প্রারম্ভেই তাহার অতীত জীবনের যে একমাত্র গুরুতর পদস্খলন তাহার উল্লেখ আছে, এবং এই পদস্খলনের পরে তাহার মানসিক পরিবর্ত্তনের জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে নূতন ধারণার বিস্তৃত বিবরণ আছে; তাহার প্রকৃতির বিশেষত্বটুকু নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই আখ্যায়িকাবহির্ভূত অতীত ঘটনার উল্লেখের প্রয়োজন। কিন্তু তাহার উক্তির সময় অমরনাথ সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমানেই

বদ্ধলক্ষ্য; ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সে প্রতিদিনকার ঘটনা, দৈনন্দিন আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাত বর্ণনা করিয়া গিয়াছে; রজনীকে পত্নীরূপে পাইবার সম্ভাবনায় তাহার মনে যে অভাবনীয় পুলক-সঞ্চার হইয়াছে; এবং ইহার পরেই যে অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্য আসিয়া তাহার হৃদয়কে গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে, এই উভয় দৃশ্যই খুব বিশদ ও জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শচীন্দ্রের উক্তি মধ্যে কেবলমাত্র এক স্থানে ভবিষ্যতের পূর্ব্বজ্ঞান সূচিত হইয়াছে—"দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিওনা, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে।" (তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) কিন্তু অন্য সর্ব্বত্রই কেবল বর্ত্তমানের ঘটনাস্রোতই বর্ণিত হইয়াছে; বিশেষতঃ রজনীর প্রতি তাহার প্রথম দয়া ও সহানুভূতি, তাহার প্রেমে ঔদাসীন্য ও এমন কি বিরক্তির ভাবও যথাযথ প্রকাশিত হইয়াছে; ভবিষ্যৎ প্রেমের ছায়া পড়িয়া ইহার তীব্রতাকে হ্রাস করিয়া দেয় নাই। তাহার পীড়িতাবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের মধ্যে রজনীর প্রতি প্রেম কিরূপে বদ্ধমূল হইল তাহার একটী সুন্দর, উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা বঙ্কিম শচীন্দ্রের মুখে দিয়াছেন: এবং এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের যতটুকু মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, তাহা দুই এক পরিচ্ছেদ পরেই সন্ন্যাসীর নিকট পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য ইহা ঠিক যে শচীন্দ্রের মনোভাব পরিবর্ত্তনের যাহা মূল কারণ, তাহা অতি-প্রাকৃতের রাজ্য হইতে আসিতেছে, বাস্তব জগতের বিশ্লেষণ প্রণালী তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। উপন্যাসের দিক হইতে ইহাকে গ্রন্থের একটী অপরিহার্য্য ত্রুটি বলিয়াই ধরিতে হইবে। বঙ্কিম রোমান্টিক যুগের লেখক, এবং তাঁহার সময় বাস্তব প্রণালী উপন্যাস ক্ষেত্রে তখনও নিজ আধিপত্য বিস্তার করে নাই; সুতরাং তিনি রোমান্সের সমস্ত conventions, সমস্ত সংস্কার ও ধারণাগুলি অবলীলাক্রমে, অসঙ্কুচিতভাবে উপন্যাসে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে একদিকে ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যদিকে যে লাভ হইয়াছে তাহাও সামান্য নহে। রোমান্সের আবেগ ও উচ্ছ্বাস, দীপ্তি ও গৌরব আমাদের সাহিত্যে এত সুপ্রচুর নহে, যে উপন্যাস ক্ষেত্র হইতে ইহাকে একবারে বর্জ্জন করিতে পারি। তবে গ্রন্থ শেষে রজনীর অন্ধত্ব আরোগকাহিনীটী রোমান্সের অভাবনীয় বৈচিত্র্যের নিকট ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের সম্পূর্ণ ও অনুচিত আত্ম-সমর্পন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আখ্যায়িকা-বর্ণনের ভার বাঁটিয়া দিলে, আর একটী অসুবিধা আছে—উপন্যাসের গতি পদে প্রতিহত ও মন্থর হইয়া থাকে। একই ঘটনা বিভিন্ন লোকের চক্ষু দিয়া আলোচিত হয়; একই ব্যাপার সম্বন্ধে অনেকের মত লিপিবদ্ধ করিতে হয়; সুতরাং পুনরুক্তি দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। বঙ্কিম তাঁহার ঘটনাবিন্যাসের কৌশলে এই দোষ অনেকটা খণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি এমনই সুকৌশলে বক্তাদিগের ক্রম-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যে গল্পের অগ্রগতি কোথায়ও নিশ্চল হয় নাই। যে যে অংশের প্রধান নায়ক, তাহারই মুখে সেই অংশ বিবৃত করার ভার অর্পিত হইয়াছে। রজনীর গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জনের পর ঠিক তাহার উদ্ধারকর্ত্তা

অমরনাথের উক্তি আরম্ভ; আবার অমরনাথের দ্বারা রজনীর বিষয় উদ্ধারের উপায় স্থিরীকৃত হইবার অব্যবহিত পরেই শচীন্দ্রকে বক্তা করা হইয়াছে। রজনীকে পুনর্ব্বার পাওয়ার পর শচীন্দ্রদের সহিত তাহার পিতা মাতার পরিবর্ত্তিত আচরণ ও তাহার সম্পত্তি উদ্ধারের কাহিনী শচীন্দ্রের দ্বারাই বর্ণিত হইয়াছে। তারপর শচীন্দ্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রজনীকে বধূ করিতে কৃতসংকল্পা লবঙ্গলতার উক্তি আরম্ভ ও রজনীকে লইয়া অমরনাথের সহিত তাহার চাতুর্য্যপরীক্ষা। এইখানে নাটকীয় ভাব খুব ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে. এবং সেই জন্য প্রায় প্রতি দৃশ্যেই বক্তার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। এই চাতুর্য্যযুদ্ধে অমরনাথের মহানুভবতার নিকট লবঙ্গলতার পরাজয় ঘটিয়াছে। এখানে আবার শচীন্দ্র রজনীর প্রতি বদ্ধমূল অনুরাগের নিদর্শন দেখাইয়া ব্যাপারটিকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন; রজনী এমন কেবল একটা যুদ্ধ-জয়ের উপভোগ্য ফল মাত্র নহে; শচীন্দ্রের জীবনরক্ষার জন্য সে এখন অবশ্য-প্রয়োজনীয়া, উপন্যাসে তাহার মূল্য এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইখানে রজনীও প্রেমাস্পদের অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহার সংযম ও আত্মদমন শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, ও অমরনাথের পূর্ব্ব ভ্রমস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে শচীন্দ্রের প্রতি নিজ প্রবল অনুরাগের কথা প্রকাশ করিয়াছে। রজনীর এই স্বীকারোক্তিই উপন্যাসের সমস্যার সমাধান করিয়াছে, লবঙ্গের অশ্রুজলে সিঞ্চিত হইয়া ইহা অমরনাথের মহানুভব হৃদয়ের উপর সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছে; লবঙ্গ চাতুরী ও ভয় প্রদর্শনে যাহা পারে নাই তাহা অশ্রুজলে ও কাতরতায় নায়িকার প্রেমাভিব্যক্তিতে সহজেই সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর উক্তি দিয়া উপন্যাসটী বেশ সহজ অপ্রতিহত গতিতে পরিণতির দিকে চলিয়াছে, এবং প্রত্যেক নূতন চরিত্রের আত্ম-বিশ্লেষণের জন্য দুই একটী পরিচ্ছেদ ঘটনাস্রোতে বাধা প্রদান করিলেও মোটের উপর উপন্যাসের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই। গঠন-কৌশলের দিক দিয়া রজনীতে বঙ্কিমের কৃতিত্ব সামান্য নহে।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুইখানিই বঙ্কিমের প্রকৃত পূর্ণাবয়ব সামাজিক উপন্যাস; এই দুইখানি উপন্যাসই গভীর-রসাত্মক, ও উভয়েই বিষাদময় পরিণতি। উভয় উপন্যাসেই বিপৎপাতের মূল কারণ অনিবার্য্য রূপতৃষ্ণা, রমণীরূপ-মুগ্ধ পুরুষের প্রবৃত্তিদমনে অক্ষমতা। উভয়ত্রই বঙ্কিম এই অন্তর্বিরোধের চিত্র খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত, একটা গম্ভীর অথচ সংযত ভাব-প্রাবল্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন; একটা ঘটনা-বহুল, রস-বৈচিত্র্য পূর্ণ নাটকের দৃশ্যের ন্যায় এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি বিবৃদ্ধি ও পরিণতির ক্রমপর্য্যায় আমরা রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অনুসরণ করি: যে সমস্ত দুর্নিবার শক্তি আমাদের এই আপাত-নিশ্চল জীবনকে চালিত করিতেছে, তাহার প্রচণ্ড গতিবেগ আমাদের হৃদয়-স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করি। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে যে একটী ক্রীড়াশীল পরিহাসময় চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাই, যাহা বসন্ত-পবনের মত মানবের উপরিভাগের বৈচিত্র্য স্পর্শ করিয়া যায়; হৃদয়মূলে যে অতল-গভীর জলাশয় আছে, তাহার উপরে একটা ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, এবং যাহা অনুকূল দৈবের ন্যায় হঠাৎ একমুহূর্ত্তে জীবনসূত্রের গ্রন্থিসঙ্কুলতাকে টানিয়া সরল করে। শেষমুহূর্ত্তে বিরোধশান্তি

করিয়া দুর্ভাগ্যের মেঘপুঞ্জকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া প্রেমিক প্রেমিকার মিলন ঘটায়, বা যেখানে বিষাদময় পরিণতি অপরিহার্য্য, সেখানেও একটা আদর্শ, কল্পনাসুলভ জ্যোতির্ময় গুলের মধ্যে মৃত্যুশয্যা বিছাইয়া দেয়,এই দুইখানি উপন্যাসে আমরা সেই ভাব-বিলাসের অনেকটা সঙ্কুচিত অবস্থাই দেখিতে পাই। এখানে বঙ্কিম মানব হৃদয়ের গভীর-স্তরে অবতরণ করিয়াছেন, সত্যের নগ্নমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, দুর্জ্জেয় ভাগ্যবিধাতা মানবের মর্ম্মের মধ্য দিয়া যে গভীর-কৃষ্ণ অথচ রক্ত-রঞ্জিত নিয়তির রেখাটী টানিয়া দেন, তাহার গতি-রহস্যটি খুব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য এখানেও বঙ্কিমের প্রকৃতিসুলভ হাস্য-পরিহাসের ও লঘুস্পর্শের অভাব নাই; বিষাদময় ট্রাজেডির মধ্যেও মানবমনের লঘু-তরল বিকাশগুলির, জীবনের অহেতুক বৈচিত্র্য ও বিসর্পিতগতির চিত্র দিতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই; তিনি জীবনকে একটা অবিচ্ছিন্ন ধূসর বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেন নাই, তাহার মধ্যে আলো-ছায়ার যথাযথ বিন্যাস করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইখানি উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রকৃতির লঘুতর উপাদানগুলি অনেকটা সংযত ও সঙ্কুচিত হইয়া এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে নিজ ন্যায্য-স্থানই অধিকার করিয়াছে।

'বিষবৃক্ষ'ও সম্পূর্ণরূপে অতি-প্রাকৃতের স্পর্শশূন্য নহে; কুন্দের দুইবার স্বপ্নদর্শন বাস্তব উপন্যাসের মধ্যে অতিপ্রাকৃতে অনুরাগের চিহ্ন-স্বরূপ বিদ্যমান। কিন্তু ইহা গ্রন্থের কেন্দ্রগত বিষয় নহে। গ্রন্থের কেন্দ্রগত বিষয় হইতেছে আত্মসংযমে অক্ষম নগেন্দ্রনাথের রূপমোহ, ও এই অসংযম-প্রবৃত্তির ফলে নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী তিনটী জীবনে একটা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি, তিনটী জীবন সমুদ্র-মন্থনে হলাহলোৎপত্তি। নগেন্দ্রনাথের পাপ প্রলোভনের ক্রমপরিণতির চিত্রটী বঙ্কিম খুব সুকৌশলে অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক বাস্তবতা-প্রধান ঔপন্যাসিকদের অতিরিক্ত তথ্যভারাক্রান্ত প্রণালী অনুসরণ করেন নাই। স্বল্প কয়েকটী রেখাপাতে, অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও আভাসের দ্বারা, আখ্যায়িকার মধ্য দিয়াই চিত্ত-বিক্ষোভের চিত্রটী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারের দীর্ঘ বিশ্লেষণের দ্বারা বর্ণনাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন নাই। কমলমণির প্রতি সূর্য্যমুখীর পত্রে এই চিত্ত-বিকারের প্রথম উল্লেখ নাই: তখনও নগেন্দ্র প্রাণপণে প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন, অন্তরের গভীর স্তরে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছেন, বাহ্য ব্যবহারে প্রস্ফুট হইতে দেন নাই; কেবল এক স্নেহময়ী পত্নীর অসাধারণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিই এই নূতন ভাব-পরিবর্ত্তনের ঈষৎ আভাস পাইয়াছে। সূর্য্যমুখীর পত্রে এই বিকারের প্রথম পরিচয় দিয়া বঙ্কিম তাঁহার চিত্রকে কলাকৌশলের দিক্ হইতে এক অপূর্ব্বসুসঙ্গতি ও শোভনত্ব দিয়াছেন। তৎপর-পরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটী ঘটনার দ্বারা নগেন্দ্রের চিত্তবিকারের প্রথম বাহ্য-বিকাশগুলি অতি সুন্দররূপে ও অদ্ভুত কলা-সংযমের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। এদিকে কমলমণির সহানুভূতি-মিশ্র সূক্ষ্মদর্শিতা কুন্দনন্দিনীর গোপন প্রেমের রহস্যটী আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পর ষোড়শ-পরিচ্ছেদে প্রেম-ক্লিষ্টা সরলা বালিকা-স্বভাবা কুন্দনন্দিনীর চিত্ত-ধারার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে; এবং নগেন্দ্র ও কুন্দ-নন্দিনীর প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ, ও নগেন্দ্রের অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই সাক্ষাতের ফলে, কুন্দনন্দিনীর সলজ্জ প্রত্যাখ্যানসত্ত্বেও উভয়েরই মনোভাব

যে আরও প্রবল ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা হীরা কর্ত্তৃক হরিদাসীবৈষ্ণবীর স্বরূপ আবিষ্কার; তাহার ফলে কুন্দের চরিত্রে সন্দেহ, সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক তাহার তিরস্কার ও অভিমানিনী কুন্দনন্দিনীর গৃহত্যাগ। এই গৃহত্যাগের ফলে উভয়েরই প্রণয় আরও উচ্ছ্বসিত ও অপ্রতিরোধনীয় হইয়া উঠিল; অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম উচ্ছ্বাসময়, কবিত্বপূর্ণ ভাষাতে কুন্দের অনিবার্য্য প্রেমপিপাসা বিশ্লেষণ করিয়াছেন; এদিকে নগেন্দ্র যখন হীরার মুখে সূর্য্যমুখীর তিরস্কারের জন্য কুন্দের গৃহত্যাগের সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার কষ্ট-সংযত প্রেম সকল বাধা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া একেবারে প্রকাশ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল; এই কঠোর আঘাতে সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্রের মধ্যে যে সম্ভ্রম-সঙ্কোচের একটা সূক্ষ্ম পর্দ্দার ব্যবধান ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া গেল। নগেন্দ্র অতি কঠোর-নীরস ভাবে, নিতান্ত হৃদয়হীনের ন্যায়, সূর্য্যমুখীর নিকট নিজ বহ্নিজ্বালাময় বাসনার কথা প্রকাশ করিলেন, এবং কুন্দনন্দিনী সম্বন্ধে তাঁহার শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। এই বিরহ-কালের অবসান হইল কুন্দের অনিবার্য্য প্রণয়-প্রণোদিত প্রত্যাবর্ত্তনে; সূর্য্যমুখী প্রত্যাগতা পলাতকাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও স্বামির সহিত তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। এইখানে বিষবৃক্ষের একপর্ব্ব শেষ হইল; উদ্দাম বাসনা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিল; এইবার ধীরে সুস্থে ফলভোগের পালা আরম্ভ হইল। প্রবল ক্রিয়ার স্বাভাবিক ফলই প্রবল প্রতিক্রিয়া।

এই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রথম আত্মবিসর্জ্জন দিল সূর্য্যমুখী; কমলমণির আগমনের পর সূর্য্যমুখী কমলমণির নিকট স্বামীর ব্যবহারে নিজ গভীর মনোবেদনার পরিচয় দিলেন, ও প্রত্যাখ্যানের অসহ্য দুঃখবশে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগেই নগেন্দ্রের ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বপ্ন ভগ্ন হইল; কুন্দনন্দিনীর প্রতি অগাধ অপরিমিত প্রেম এক মুহূর্ত্তেই তীব্র বিরক্তি ও বিতৃষ্ণাতে বিস্বাদ হইয়া গেল; কুন্দের মৌন ভাব, সরল বাক্‌পটুতার অভাব, নিরুদ্ধপ্রকাশ প্রেম নগেন্দ্রের উদ্বেল বুভুক্ষিত হৃদয়কে পরিতৃপ্ত দিতে পারিল না; কুন্দের নিজের আশাতীত আনন্দের মধ্যেও অনুশোচনার বৃশ্চিক দংশন অনুভূত হইতে লাগিল। বিষবৃক্ষের ফলাস্বাদনের পর প্রথম অনুভূতি হইল যে সকল সুখেরই সীমা আছে। তারপর নগেন্দ্র হরদেব ঘোষালের পত্রে কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের প্রেম বিশ্লেষিত হইয়া একটা বিরাট ভ্রান্তি, একটা অধম রূপজ মোহের পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আদর ও মিষ্ট কথার পরিবর্ত্তে ভর্ৎসনা, তিরস্কারই কুন্দের নিত্য ভোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; মুহূর্ত্তের জন্য মেঘাবৃত সূর্য্যমুখীর প্রতি প্রেম আবার দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মাত্র পনর দিনের মধ্যেই এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে—যে প্রেমসিন্ধু উদ্বেল ও কুলপ্লাবী হইয়া সমাজ, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যজ্ঞান সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা প্রবলতর বিরুদ্ধ শক্তির আকর্ষণে নিমেষে শুকাইয়া গেল; আবার সূর্য্যমুখীর প্রেমের শুষ্ক খাতে পুনরায় প্রথম জোয়ারের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আসিয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদের শেষভাগে কয়েকটী অসাধারণ সৌন্দর্য্যপূর্ণ মহাকাব্যোচিত তুলনার দ্বারা পাঠকের মনে এই শোকপূর্ণ পরিবর্ত্তনের চিত্রটী গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে ত্যাগ করিয়া বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; এদিকে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমনের পথে সঙ্কটাপন্ন রোগে পীড়িত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু সংবাদ নগেন্দ্রের নিকট পৌঁছিল। এই মৃত্যুসংবাদে নগেন্দ্রের মনে যে অনুতাপানল জ্বলিতে লাগিল, তাহাতেই তাঁহার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। বঙ্কিম অসাধারণ শক্তি ও কবিজনোচিত সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত নগেন্দ্রের এই অনুতাপ ও আত্মগ্লানি চিত্রিত করিয়াছেন। নগেন্দ্র তাঁহার বিষয় সম্পত্তির শেষ ব্যবস্থা করিবার ও গার্হস্থ্য জীবনের নিকট চির বিদায় লইবার জন্য নিজগ্রামে ফিরিবার ঠিক পূর্ব্বেই এক পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার আমাদিগকে অভাগিনী, স্বামি-পরিত্যক্তা কুন্দনন্দিনীর অন্তরের নীরব যন্ত্রণার নৈরাশ্যে পূর্ণ ব্যথার একটী ক্ষুদ্র চিত্র দিয়াছেন। বিষবৃক্ষের ফল কুন্দকেও যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। তারপর নগেন্দ্রের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের পর 'স্তিমিত প্রদীপে' নামক পরিচ্ছেদে লেখক নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর পূর্ব্ব প্রণয়ের যে উচ্ছ্বসিত, আবেগময় কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, যে দুই তিনটী সুনির্ব্বাচিত আখ্যানের দ্বারা তাহাদের প্রেমের গাঢ়তা ও সর্ব্বাঙ্গীন একাত্মতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা কলাকৌশল ও কবিত্ব শক্তির দিক্ হইতে সাহিত্য ক্ষেত্রে অতুলনীয়। এই করুণ পূর্ব্বস্মৃতি পর্য্যালোচনার মধ্যে, এই তীব্র আত্মগ্লানির বৃশ্চিক দংশনের মধ্যে বঙ্কিম পুনর্জ্জীবিত সূর্য্যমুখীকে আনিয়া দিয়া ও নগেন্দ্রের সহিত তাহার পুনর্ম্মিলন ঘটাইয়া একটী আনন্দপূর্ণ, অথচ সম্পূর্ণ কলাকৌশলসম্মত অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের (surprise) সংঘটন করিয়াছেন।

কিন্তু ট্রেজেডির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের সুরে আখ্যায়িকাটী শেষ হইতে দিলেন না ; এবং তাঁহার নির্ম্মম বিচারে একটী বলিদানের প্রয়োজন হইল, এবং চির-উপেক্ষিতা, অভাগিনী কুন্দনন্দিনীই এই কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইল। বিষবৃক্ষের ফল এতদিনে সত্যসত্যই গরল উদ্গীরণ করিল ; এবং নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানের ন্যায় গ্রন্থকারের কার্য্য-করণ শৃঙ্খলার অমোঘ সন্ধি-বন্ধনে এই গরল কুন্দনন্দিনীরই উদরস্থ হইল। কিন্তু যে তরঙ্গ আসিয়া কুন্দকে মৃত্যুর অতল গহ্বরে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহা তাহার কোমল লজ্জা-সঙ্কুচিত হৃদয়ের নিজ প্রেরণা হইতে আসে নাই ; তাহা নিকটবর্ত্তী একটী পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে ঈর্ষ্যাফেনিল প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের রূপেই তাহার উপরে আপতিত হইল। বাস্তবিকই বঙ্কিম সুনিপুণ মালাকারের ন্যায়, অসাধারণ কৌশলের সহিত কুন্দ-নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর অপেক্ষাকৃত উন্নত ও গভীর প্রেমের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে আর একটী কলঙ্কিত অথচ মনোবৃত্তির নিগূঢ়-লীলা-বিচিত্র প্রণয় কাহিনী একই সূত্রে গাঁথিয়াছেন, এবং এই দুইটী স্বতন্ত্র ব্যাপারের মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছেন। হীরা উপন্যাসের villain ; গ্রন্থের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে যেখানে হৃদয়ের অসংযত উদ্দাম প্রবৃত্তির জন্যই অগ্নি জ্বলিয়াছে, সেই স্থানেই হীরা বাহির হইতে সেই অগ্নি বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে, অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। সে-ই সূর্য্যমুখীনগেন্দ্রের মধ্যে শেষ বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে ; সে-ই মর্ম্মপীড়িতা কুন্দনন্দিনীর নিকট আত্মহত্যার মন্ত্রণা ও অস্ত্র পৌঁছাইয়া দিয়া, ট্রেজেডির শেষ দৃশ্যের জন্য আপনাকে দায়ী করিয়াছে। প্রকৃত

জগতেও এইরূপ অন্তর ও বাহ্য শক্তির সম্মিলনেই আমাদের মনোরাজ্যে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়; হৃদয়-কন্দরে যে বহ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, বাহিরের ফুৎকারেই তাহা প্রবল ও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু হীরা কেবল পরের অগ্নিতেই ইন্ধন যোগাইয়া আসে নাই, তাহা হইলে সে উপন্যাসের মধ্যে একট অপ্রয়োজনীয়, বাহিরের জীবমাত্র হইত। তাহার নিজের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা হইতেই একটা প্রজ্বলিত শলাকা লইয়া সে অন্যের ঘরে আগুন দিয়াছে; নিজের অন্তরস্থ বহ্নিপ্রাচুর্য্য হইতেই তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছে। ইহাই আর্টিষ্টের কৃতিত্ব; তিনি হীরাকে একটা secondary বা গৌণ চরিত্রের পর্য্যায়ে ফেলেন নাই, নগেন্দ্রসূর্য্যমুখীর সৌর জগতের দূরপ্রান্তস্থিত একটা ক্ষীণপ্রভ উপগ্রহ মাত্র করেন নাই; তাহার উপর ধূমকেতুর প্রচণ্ড গতিবেগ ও করাল দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন; নিজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জগতে তাহাকে নায়িকা করিয়াছেন; আর একটা ঘূর্ণায়মাণ, গতি বেগ-চঞ্চল জগতের কেন্দ্র-শক্তির পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। হীরাদেবেন্দ্রের কলঙ্কলাঞ্ছিত ইন্দ্রিয়সুখপ্রধান প্রণয়-কাহিনীটীও বঙ্কিম তাঁহার অভ্যস্ত সংযম ও মিতভাষিতার সহিত কয়েকটী অর্থপূর্ণ আভাস ও সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতের দ্বারাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; পাপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের একটা সহজ সঙ্কোচ, একটা স্বাভাবিক বিমুখতা ছিল; সুতরাং কোথাও তিনি ইহার সবিস্তার বর্ণনা করেন নাই, আধুনিক বাস্তব লেখকদের ন্যায় প্রতিদিনকার গ্লানি ও কলঙ্কচিহ্ন পুঞ্জীভূত করিয়া চিত্রকে মসীময় করিয়া তোলেন নাই, সর্ব্ববিধ detail সযত্নে বর্জ্জন করিয়াছেন। কেবল পদস্খলনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাগুলিকে, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রাণপণ প্রলোভন-দমনের চেষ্টাটীকে, সুরুচি ও রসজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে, ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন; পাপের পঙ্কিল প্রবাহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষেপ, প্রত্যেক ক্ষণস্থায়ী আবর্ত্ত সৃজন অনুসরণ করেন নাই; কেমন করিয়া এই নদী ধীরে ধীরে তাহার প্রথম দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ হারাইয়া, মন্থর-গামিনী হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ অবিমিশ্র পঙ্কিলতার মধ্যে তাহার সমস্ত জলকল্লোল ও অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লুকাইয়া ফেলিয়া একটা দুর্গন্ধময় কর্দ্দম ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, সেই ক্রমপরিণতির বিস্তারিত বিবরণ দিতে নিজেকে সম্মত করিতে পারেন নাই; কেবল স্বল্পকালব্যাপী চেষ্টার পর এই পাতাল প্রবাহিনীকে সূর্য্যালোকে তুলিয়া, তাহার পর এক অবিশ্রান্ত দ্রুতগতিতে তাহাকে মরণের উপকূলে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্তপর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে মৃত্যুর অতল শূন্যতার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতনের প্রতিধ্বনি আমাদের কাণে বাজিতে থাকে, একটা প্রাণবেগচঞ্চল বিপুল শক্তির অতর্কিত অন্তর্দ্ধানের বিরাট শূন্যতায় আমাদের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে; কিন্তু এই শক্তির প্রতিদিনকার ক্রিয়া লেখক আমাদিগকে দেখিতে দেন না। এই সমস্ত মন্তব্য হীরার ক্ষেত্র অপেক্ষা গোবিন্দলাল-রোহিণীর চিত্র সম্বন্ধে আরও অধিকতর প্রযোজ্য; তাহাদের পাপ-প্রণয়ের কোন বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই না; প্রসাদপুরের বিজন প্রাসাদে যে শেষ দিনের চিত্রটী আমরা পাই, তাহার উপর আগন্তুক বিপৎপাতের একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়িয়াছে; প্রথম স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইয়া, শীর্ণকায়া চিত্রার মতই একটা আগতপ্রায় দুর্দ্দৈবের ম্লান স্বপ্ন দেখিতে

দেখিতে অনিশ্চয়ের উদ্দেশ্যহীন পথ ধরিয়া চলিয়াছে। রোহিনীর প্রণয়ের অতৃপ্ত যৌবন-পিপাসা অবিমিশ্র ভোগধারায় শান্ত হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোকসুলভ কৌতূহল ও ধর্ম্মভয় বর্জ্জিতার মধুকরী বৃত্তি তাহাকে পাত্রান্তরান্বেষণের জন্য উন্মুখ করিয়াছে; গোবিন্দলালের প্রথম রূপমোহ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, এবং নভেল পাঠ ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা এই ক্ষীয়মান দীপশিখায় তৈলনিষেকের ন্যায়ই বিরক্তি বিমুখ মনকে সতেজ রাখিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে। সমস্ত দৃশ্যটী যেন একটি অনাগত বিপদের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছে; এবং ভ্রমরের নামোচ্চারণমাত্রেই এই বাহ্য-বিলাস-ভারাক্রান্ত, কিন্তু অন্তঃজীর্ণ জীবন-যাত্রা যেন যাদুমন্ত্রবলে ইন্দ্রজালনির্ম্মিত প্রাসাদের ন্যায়ই শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বায়ুস্তরমধ্যে নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া গেছে। বঙ্কিম রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়-লীলা সম্বন্ধে প্রায় মৌণ রহিয়াছেন, কিন্তু ভ্রমরের দীর্ঘ সপ্তবৎসরব্যাপী অভিমান-দুর্ব্বিষহ প্রতীক্ষা একটু বিস্তারিত ভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সুতরাং পাপের প্রতি বঙ্কিমের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার জন্যই হীরা ও দেবেন্দ্রের কলুষিত প্রণয়ের কোন detail আমরা পাই না; কিন্তু এই প্রণয়-কাহিনীর বিশেষত্বগুলি লেখক বেশ সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিতই আলোচনা করিয়াছেন। হীরাচরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব্ব সৃষ্টি; তাহার চরিত্রের প্রথম লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের যে একটা গূঢ় অভিমান ও অকারণ বিদ্বেষ থাকে, তাহাই; হীরা সূর্য্যমুখী অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশে হীন মনে করে না, সুতরাং ভগবানের যে ব্যবস্থায় সে দাসী ও সূর্য্যমুখী প্রভুপত্নী, তাহার বিরুদ্ধে তাহার একটা চিরস্থায়ী অভিযোগ আছে। দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে এই গূঢ় আত্মাভিমান ও কঠোর আত্মসংযম তাহাকে প্রেমের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ করিয়াছে; কিন্তু তাহার চরিত্রের মূলে একটা ধর্ম্মভীতিমূলক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল না; সুযোগ ও অবসরের অভাবই এ পর্য্যন্ত তাহাকে ধর্ম্মপথে স্থির রাখিয়াছিল। এমন সময় হরিদাসী বৈষ্ণবীর খোঁজে আসিয়া সে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করিল; এবং প্রথম দর্শন মাত্রেই যে প্রেমকে সে এতদিন অস্বীকার করিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রেম তাহার দেব-মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল। তাহার হৃদয়ে এই অতর্কিত প্রেমাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি জটিল আনুষঙ্গিক অবস্থাও তাহার চারিদিকে সৃষ্ট হইয়া উঠিল; প্রথম দেবেন্দ্র তাহাকে দাসী জ্ঞান করিয়াই কুন্দের প্রতি নিজ গোপন অনুরাগের কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিল, এবং কুন্দ-প্রাপ্তিবিষয়ে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিয়া তাহার মনোমধ্যে একটা বিষম ক্রোধ ও কুন্দের প্রতি বিজাতীয় হিংসা জাগাইয়া তুলিল। তারপর ঘটনাক্রমে পলাতকা কুন্দ তাহারই গৃহে আশ্রয় লওয়ায়, একদিকে তাহার কুন্দের প্রতি হিংসা প্রবলতর হইবার সুযোগ পাইল, অপরদিকে সে কুন্দকে সূর্য্যমুখীর উচ্ছেদের জন্য শাণিত অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প পোষণ করিতে লাগিল। অতঃপর সে সময় বুঝিয়া কুন্দ-অস্ত্র ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ সংঘটন করিল। এদিকে দেবেন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর ও জটিলতর হইয়া উঠিল; দেবেন্দ্র কুন্দের সন্ধানে তাহার গৃহে আসিয়া

একদিকে তাহার প্রণয়-স্বীকারের ও অপরদিকে তাহার আত্মসংযমে দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় লইয়া গেলেন : হীরা স্পষ্টই বলিল যে সে দেবেন্দ্রকে ভালবাসে, কিন্তু দেবেন্দ্রের নিকট প্রণয়ের প্রতিদান না পাইলে তাহাকে ধর্ম্মবিক্রয় করিবে না, দেবেন্দ্রও হীরার উপর তাঁহার অসীম প্রভাব আছে ও তাহাকে করধৃতপুত্তলিকার ন্যায় চালাইতে পারিবেন এই ধারণা লইয়া বাটী ফিরিয়া গেলেন ; কিন্তু তিনি হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই। এই ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আবার দত্তবাড়ী গেলেন ও হীরার নিকট আবার কুন্দ সম্বন্ধীয় দুঃসাহসিক প্রস্তাব করিয়া দ্বারবানহস্তে অপমানিত হইয়া ফিরিলেন। এই অপমানভোগের পর দেবেন্দ্র হীরার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, ও কপট-প্রণয়জালে শীঘ্রই লুব্ধচিত্তা ধর্ম্মভয়-হীনা হীরা-মক্ষিকাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন ; হীরার আত্মসংযম ক্ষমতা ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি রহিল না। তারপর হীরার বিষবৃক্ষের ফল ফলিল—ধর্ম্মভ্রষ্টা হীরা দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও পদাঘাতে বিতাড়িত হইল—চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদে কয়েকটী বাক্যেই বঙ্কিম অসাধারণ দক্ষতার সহিত হীরার এই কলুষিত প্রণয়ের শেষ পরিণামটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অপমানিতা হীরা পদাহতা সর্পীর ন্যায়ই ফণা ধরিয়া উঠিল ; তাহার আত্মহত্যার ইচ্ছা দেবেন্দ্র বা কুন্দকে বিষপ্রয়োগের দ্বারা হত্যার সঙ্কল্পে পরিণত হইল। একদিকে প্রবল নৈরাশ্যের আঘাত তাহাকে উন্মাদ-গ্রস্ত করিয়া তুলিল ; অপর দিকে প্রকৃত সয়তানোচিত দুষ্টবুদ্ধি তাহাকে কুন্দের চরম দুঃখের মুহূর্ত্তে তাহাকে আত্মহত্যার মন্ত্রণা দিতে ও তাহার হাতের নিকট আত্মহত্যার অস্ত্র প্রস্তুত রাখিতে প্রণোদিত করিল। হীরার হৃদয়মন্থনজাত ঈর্ষা-ফেনিল বিদ্বেষ-হলাহলই সে কুন্দের মুখের নিকট আনিয়া ধরিল, এবং কুন্দ সেই বিষ পান করিয়াই মরিল। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই যে হীরার উন্মাদরোগ আরও ভয়ঙ্কর ও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে ; পূর্ব্বসুখস্মৃতি, অপমানের বৃশ্চিকদংশন, দেবেন্দ্র ও কুন্দের বিরুদ্ধে একটা অনির্ব্বাণ ক্রোধানল—সমস্ত তাহার বিকার-গ্রস্ত মনে একটা তুমুল কোলাহল তুলিয়াছে ; এবং এই তুমুল কোলাহলকে ছাপাইয়া তাহার অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা পূর্ব্বসুখস্মৃতির শিরায় রক্তপথে ফুৎকার দিয়া এক বিষাদ-করুণ সুর তুলিয়াছে :—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

এই সুরেই হীরার শেষ এবং সত্য পরিচয়—এই অতৃপ্ত বুভুক্ষার হাহাকারই তাহার ঈর্ষা-দিগ্ধ, অভিমান-বিকৃত, বিদ্বেষক্রূর হৃদয়ের অন্তরতম বাণী।

অবশ্য উপন্যাসের মধ্যে প্রধান সমস্যা হইতেছে অনিন্দিত-চরিত্র, পত্নীবৎসল নগেন্দ্রের পদস্খলন ; ইহার জন্য লেখক সন্তোষ-জনক কারণ দিয়াছেন কি না, ইহার উপযুক্ত ও পর্য্যাপ্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন কি না, তাহাই গ্রন্থসম্বন্ধে আমাদের প্রধান প্রশ্ন। কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের যে প্রথম পরিচয় বা সম্পর্ক তাহা সম্পূর্ণ দয়ার ভিত্তির উপর স্থাপিত ; কিন্তু এখানেও বোধ হয় একটা অস্বীকৃত প্রেমের ঘোর তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ও দৃষ্টিকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল ; গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র হরদেব ঘোষালকে রহস্যময়, সারল্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতেই মোহের প্রথম ও সূক্ষ্মতম কুহেলিকা-

জালের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; পরবর্ত্তী ঘটনার আলোকে আমাদের সন্দেহ হয় যে এই সৌন্দর্য্য-বিচার ঠিক দার্শনিকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা নহে ; ইহার মধ্যেও বোধ হয় কোন ভবিষ্যৎ মোহের বীজ নিহিত আছে। সেই পরিচ্ছেদেই যখন নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর অনুরোধে কুন্দকে গোবিন্দপুর লইয়া গেলেন, তখন বঙ্কিম এই আপাত-সহজ ও স্বাভাবিক কার্য্যটাতেই বিষবৃক্ষের প্রথম বীজ রোপণের গুরুতর দায়িত্ব আরোপ করিয়াছেন। অনাথা বালিকার প্রতি দয়াপ্রকাশমাত্রই যদি বিষবৃক্ষের বীজ-রোপণ হয় তবে দয়াধর্ম্মকে মনুষ্যের কর্ত্তব্যতালিকা হইতে বিসর্জ্জন দিতে হয় ; আর এই অমঙ্গলাশঙ্কা সত্য হইলে ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই ; ইহা চাণক্যপণ্ডিতের সেই সনাতন সন্দেহনীতি—যাহাতে নারী ঘৃতকুম্ভ ও পুরুষ তপ্তাঙ্গারের সহিত উপমিত হয়—তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। নগেন্দ্রের চরিত্রমধ্যে দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত না থাকিলে এই দয়াপ্রকাশের ফল এত বিষম হইত না। সুতরাং উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সন্দেহাতীত করিতে হইলে লেখককে নগেন্দ্রের এই প্রাথমিক দুর্ব্বলতার উপরই জোর দিতে হইবে, তাঁহার পদস্খলনের কেবল ঘটনামূলক নহে, মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিতে হইবে। বঙ্কিম প্রথমতঃ কেবল ঘটনামূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, অর্থাৎ প্রেম-প্রকাশের পূর্ব্বলক্ষণগুলিই বিবৃত করিয়াছেন ; সেগুলি কেন ঘটিয়াছিল তাহা বলেন নাই, বা নগেন্দ্রের চরিত্রগত কোন বিশেষ দুর্ব্বলতার সহিত সম্পর্কান্বিত করেন নাই। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে একটী মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—নগেন্দ্রের পূর্ব্বজীবনে কোন বিষয়ের অভাব হয় নাই বলিয়া তাঁহার চিত্তসংযমশিক্ষা হয় নাই ; "অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল ; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।" এই ব্যাখ্যাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না, ইহা নীতিবিদের ব্যাখ্যা হইতে পারে, মনস্তত্ত্ববিদের নহে। আমরা আরও একটু ঘনিষ্ঠ ও নিকট সম্পর্কের নির্দ্দেশ চাহি ; যেমন আকাশ হইতে জল হয় বলিলেই বারিপতনের উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করা হয় না, সেইরূপ নগেন্দ্রের চিত্তসংযম অভ্যাস হয় নাই বলিয়াই তাঁহার পদস্খলন হইল, এই অস্পষ্ট ও সাধারণ উক্তিতে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে না। কেবল নগেন্দ্রের চিত্তসংযম অভ্যাস হয় নাই এই উক্তি যথেষ্ট নহে ; তাঁহার পূর্ব্বজীবনের প্রকৃত কার্য্যকলাপের মধ্যে এই অসংযমের অঙ্কুরের আভাস দিতে হইত। অবশ্য ইহা সত্য যে বাস্তব জীবনে এরূপ অনেক অতর্কিত বিকাশ ও অপ্রত্যাশিত পরিণতির উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্র বলে যে অনেক সুস্থ ব্যক্তির দেহেও রোগের বীজাণু লুকায়িত থাকে, এবং উপযুক্ত অবসর পাইলে ফুটিয়া বাহির হয়, সেইরূপ আমাদের অন্তঃকরণেও অনেক গোপন দুর্ব্বলতার বীজ প্রোথিত আছে, বিশেষ প্রলোভনের সম্মুখীন না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা নিজেই তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকি। সুতরাং কেবল ঘটনা হিসাবে নগেন্দ্রের এই অতর্কিত পদস্খলনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ; তাঁহার অন্তঃকরণের রূপমোহ সম্বন্ধে তিনি নিজেও হয়ত অজ্ঞ ছিলেন, এবং এ তথ্য আবিষ্কার করিলেন তখনই, যখন তাঁহার অন্তরমধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। হয়ত কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার এই রূপমোহ সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইত, তিনি মৃত্যুপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনিন্দনীয় জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। আমাদের অধিকাংশের জীবনেই আমরা কারণ হইতে

কার্য্যের দিকে যাই না; আমাদের সাধারণ গতি প্রায়ই বিপরীতমুখী—কার্য্যের প্রকাশ হইতে কারণের অন্ধকার গুহার দিকে। আমরা সকল সময় গাছ দেখিয়া ফল চিনি না; পরন্তু ফল হইতে গাছের অস্তিত্বের প্রথম নিদর্শন পাইয়া থাকি। কিন্তু এই যুক্তি, বাস্তব জীবনের অনুগামী হইলেও, ঔপন্যাসিকের পক্ষে খাটে না। নগেন্দ্র নিজের রূপমোহ সম্বন্ধে নিজে অজ্ঞ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার সেরূপ অজ্ঞতার কোন কৈফিয়ৎ নাই। আমরা স্বভাবতঃই আশা করিতে পারি যে ঔপন্যাসিক জীবনের যে খণ্ডাংশ তাঁহার বিষয়ের জন্য নির্ব্বাচন করিবেন, তাহার কোন রহস্যই তাঁহার নিকট গোপন থাকিবে না; তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রদের মনের প্রত্যেক অলি-গলির, প্রত্যেক অন্ধকার গুহার উপরই তিনি আলোক পাত করিতে পারিবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ এখানে আশানুরূপ গভীর হয় নাই। যখন আমরা নগেন্দ্রের অনিন্দনীয় চরিত্রের ও উচ্ছ্বসিত পত্নী-প্রেমের কথা আলোচনা করি, যখন সূর্য্যমুখীর অবিমিশ্র শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত প্রশংসাবাক্যগুলি আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি না যে তাঁহার কোন দুর্ব্বলতার রন্ধ্র পথ দিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে শনির প্রবেশ হইয়াছে। নগেন্দ্রের আদর্শ চরিত্রই তাঁহার পদস্খলনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের মনকে অবিশ্বাসী করিয়া তোলে।

এই বিষয়ে আর একটী ক্ষুদ্র প্রশ্নও আমাদের মনে স্বতঃই মাথা তুলিয়া উঠে। তাহা এই যে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর মধ্যে এই বিচ্ছেদ-সংঘটনে সূর্য্যমুখীর কোন দোষ ছিল কি না। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের অভিমানপ্রবণতা ও অন্যায় সন্দেহ গোবিন্দলালের পতনের দায়িত্বভার উভয়ের মধ্যেই ভাগ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' লেখক সূর্য্যমুখীকে একেবারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ রাখিয়াছেন, এবং অধঃপতনের সমস্ত অবিভক্ত দায়িত্ব নগেন্দ্রের স্কন্ধেই ফেলিয়াছেন। এরূপ একপক্ষের দোষ বাস্তব জগতে যে বিরল ঘটনা তাহা নহে। তবে উপন্যাসে ইহা সূর্য্যমুখীর চরিত্র হিসাবে মুখ্যত্ব কতকটা হ্রাস করিয়া দিয়াছে; সে কেবল অনুকৃত অত্যাচারে উৎপীড়িতা বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য সূর্য্যমুখী যেরূপ উচ্ছ্বসিত, অপরিবর্ত্তিত পতিভক্তি, যেরূপ প্রতিবাদহীন মৌন গৌরবের সহিত এই বিপৎপাত স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রের মাহাত্ম্য ও নিঃস্বার্থ প্রেম বেশ ভাল করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে সূর্য্যমুখীরও চরিত্রের মধ্যেই স্বামিপ্রেম হইতে বঞ্চিত হইবার কতকটা কারণ পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিম একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে সূর্য্যমুখী কিছু গর্ব্বিতস্বভাবা ছিলেন। স্বামীর সহিত ব্যবহারেও তাঁহার এই বিশেষত্বের, এই মৌন অহঙ্কারের, ধর্ম্মশীলা পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর একটা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত গর্ব্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। সূর্য্যমুখী প্রথম হইতেই বুঝিয়াছে যে স্বামীর মন তাহার নিকট হইতে অপসৃত ও অন্যাসক্ত হইতেছে, কিন্তু সে কোথাও একমুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর অনুরাগ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য নগেন্দ্রের নিকটে অধীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখায় নাই; কোন অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা, কোন ভাব-বিলাস-মূলক নিবেদনের দ্বারা (sentimental appeal), পূর্ব্ব-প্রেমের দোহাই দিয়া স্বামীর পলাতক প্রেমকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই; কেবল কমলমণির নিকট রোদনের দ্বারা নিজ হৃদয়-ভার লঘু করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু নগেন্দ্রের নিকট

কর্ত্তব্যপরায়ণা স্ত্রীর স্থির মুখকান্তির রেখামাত্র বিচলিত হইতে দেয় নাই। মনের পাষাণভার চাপিয়া রাখিয়া অকম্পিত হস্তে নিজের বধদণ্ডাজ্ঞায় নিজেই স্বাক্ষর করিয়াছে। পরস্ত্রীলোলুপ স্বামীকে নিবৃত্ত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া নীরবে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। নিজেই তাহাকে সপত্নীর হস্তে তুলিয়া দিয়াছে। বালিকা ভ্রমর যেমন বিপথগামী স্বামীর পায়ে ধরিয়া প্রেম ভিক্ষা চাহিয়াছিল, আমরা গর্ব্বিতা সূর্য্যমুখীকে কখনও সে অবস্থায় কল্পনা করিতে পারি না। যে বস্তু তাহার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য তাহাকে সে কখনও ভিক্ষার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। অথবা এই যে গর্ব্ব, ইহার মধ্যে পরুষতা কিছুই নাই, ইহা স্বামীর প্রতি একটা তিরস্কার বাক্যে আত্ম-প্রকাশ করে নাই, ইহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত একটা অকৃত্রিম ভক্তি ও স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত; একটা কঠোর অবিচলিত আত্মসংযমেই ইহার একমাত্র পরিচয়। সূর্য্যমুখী ভ্রমরের ন্যায় উচ্ছ্বাসপ্রবণা হইলে বোধ হয় নগেন্দ্রনাথকে ধরিয়া রাখা যাইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সূর্য্যমুখীর ব্যবহারও, তাহা একদিক দিয়া যতই অনিন্দনীয় হউক না কেন, ট্রাজেডির পরিণতির জন্য অন্ততঃ কতকাংশে দায়ী। অবশ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় নগেন্দ্রের সূর্য্যমুখীর প্রতি ব্যবহার এত পরুষ ও কোমলতা-লেশ-শূন্য ছিল, যে সূর্য্যমুখীর অশ্রুজলসিক্ত আবেদনও কতদূর ফলপ্রদ হইত বলা যায় না; কিন্তু সূর্য্যমুখীর বিশেষত্ব এই যে সে কখনও সেরূপ আবেদনের কল্পনাও করে নাই। 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইহাদের বিষয়-বস্তু ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটি প্রায় একরূপ; কিন্তু বঙ্কিম যেরূপ নিপুণতার সহিত ইহাদিগকে বিভিন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাদের পাত্র পাত্রী ও আনুসঙ্গিক ঘটনাবলীর মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহা উচ্চাঙ্গের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও অসাধারণ কলাকৌশলের পরিচায়ক।

এই দুই প্রেম-চিত্রের বিপরীত একটী তৃতীয় চিত্র কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের অনাবিল একাত্ম, হাস্য-পরিহাস মধুর, কপট-মান অভিমান-তীব্র প্রেম-কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে শিশু সতীশ চন্দ্র তাহার মনোহর শৈশব চাপল্যের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটী সুবর্ণময় সংযোগ-সেতু রচনা করিয়াছে। নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী নিঃসন্তান; ভ্রমরের শিশু সূতিকাগারেই মৃত; বোধ হয় এই সন্তানের অভাবই এই দুইটী ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদকে এরূপ সম্পূর্ণ ও গভীর করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের নিঃসঙ্গ বিরহকে এরূপ অসহনীয়রূপে তীব্র করিয়াছিল; বোধ হয় উভয়ের স্নেহের একটা সাধারণ অবলম্বন থাকিলে তাহাদের মনোমালিন্য এরূপ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিত না; তাহা হইলে সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ অসম্ভব হইত, ও গোবিন্দলালের প্রত্যাগমনের একটি পথ খোলা থাকিত। সে যাহা হউক, বঙ্কিম একই উপন্যাসে প্রেমের যে বিবিধ ও বিচিত্র বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির নিদর্শন।

চরিত্রাঙ্কণ ও ঘটনাবিন্যাস ছাড়াও অন্যান্য দিক দিয়াও 'বিষবৃক্ষ' খুব উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। সরস ও জীবন্ত বাস্তববর্ণনায় বঙ্কিম বঙ্গ-উপন্যাস ক্ষেত্রে অতুলনীয়। প্রথম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের নৌকায় যাত্রা, গঙ্গাতীরস্থিত স্নানের ঘাটগুলি ও নৈদাঘের টিকা-

বৃষ্টির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বাস্তবরসটী বিশেষভাবে উপভোগ্য, সেইরূপ সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রের প্রাসাদ ও অন্তঃপুরের সাধারণ জীবনযাত্রার বর্ণনাও তুল্যরূপে প্রশংসার্হ। আধুনিক উপন্যাসে সমস্যাবিশ্লেষণ আমাদিগকে এরূপ ভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে বাস্তব বর্ণনাতেও আমাদের উৎসাহ ও শক্তি অনেক ম্লান হইয়া আসিতেছে; হয় তাহা আদর্শের উচ্চ গ্রামের সহিত সমান সুরে বাঁধা হইয়াছে, নিরুদ্দেশ যাত্রার গোধূলিরাগরঞ্জিত (idealised), নয় তাহার উপর সমস্যার ছায়া, একটা পাণ্ডুর রক্তহীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্রবস্তুবর্ণনার যে একটা সজীব সতেজ আনন্দ তাহা আমাদের লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়, এখন বাস্তব বর্ণনাতেও সজীব, সতেজ আনন্দ তাহা আমাদের লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন বাস্তব বর্ণনাতেও আমরা হয় কবি না হয় দার্শনিক; জীবন-রসে অহেতুক আনন্দ আর আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে খুঁজিয়া পাই না। মুকুন্দরাম, ঈশ্বরগুপ্ত হইতে প্রবাহিত যে ধারা বঙ্কিমচন্দ্রে চরম গভীরতা ও বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সাহিত্যে প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্যের মধ্য দিয়া স্বর্গের অলকনন্দা ও পাতালের ভোগবতী বহিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মর্ত্ত্যের সেই চির পরিচিত বহুপুরাতন প্রবাহিনীর জলকল্লোল আর শুনিতে পাই না।

গভীরভাবাত্মক, অথচ সংযত বর্ণনাতেও বঙ্কিম তুল্যরূপ সিদ্ধহস্ত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই রোদনপ্রবণ বাঙ্গালীজাতির মধ্যে জন্মিয়াও বঙ্কিম তাঁহার বর্ণনা বা জীবন-সমালোচনায় কোথাও ভাবাতিরেকের (sentimentality) পরিচয় দেন নাই—যেখানে মর্ম্মভেদী দুঃখের কথা বর্ণনা করেন, সেখানেও অশ্রুপ্রাচুর্য্যের পরিবর্ত্তে একটা সংযত গম্ভীর বিষাদই তাঁহার প্রকাশের স্বাভাবিক ভাষা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বাক্-সংযমই কুন্দনন্দিনীর পিতার দুর্দ্দশার চিত্রটীকে একটী অসাধারণ অর্থগৌরবে ও করুণ-রস-প্রাচুর্য্যে ভরিয়া দিয়াছে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনীর মেঘান্ধকার নিশীথে দত্তগৃহত্যাগ, অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদে সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদে নগেন্দ্রের শোকোচ্ছ্বাস, ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদে মৃত্যুশয্যাশায়িনী কুন্দের অতর্কিত বাক্‌পটুতার বর্ণনাগুলি বঙ্কিমের এই শক্তির উদাহরণ। অবশ্য স্থানে স্থানে কথোপকথনের ভাষা ঈষৎ শব্দাড়ম্বরদুষ্ট ও সেইজন্য গভীর ভাব প্রকাশের পক্ষে কতকটা অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহা বঙ্কিমের শক্তির অভাবের পরিচয় নহে, ভ্রান্তিমূলক সাহিত্যাদর্শঅনুসরণেরই ফল। বঙ্গসাহিত্যে সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বিষবৃক্ষের' স্থান খুব উচ্চ; বোধ হয় এক কৃষ্ণকান্তের উইলই ইহাকে অতিক্রম করিয়া যায়; কেননা সেখানে বিরোধের চিত্রটী আরও সম্পূর্ণতর ও কার্য্যকারণ-সন্নিবেশে অধিকতর সুসংবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষের' পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। চিত্রের পূর্ণতায় ও বিশ্লেষণের গভীরতায় ইহা 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আরও পরিপক্ক, অনিন্দনীয় কলা-কৌশলের নিদর্শন। বিষবৃক্ষে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক যে গুরুতর অভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' পূর্ণ হইয়াছে, কার্য্য-কারণ-পরম্পরার কোন শৃঙ্খলই বাদ যায় নাই। সূর্য্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমর অধিকতর জীবন্ত

হইয়াছে, তাহার অনুচিত অভিমান ও সন্দেহপ্রবণতা ট্র্যাজেডিকে আসন্নতর করিয়াছে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগ-সঞ্চারের প্রথম অঙ্কুরটী সেরূপ বিশদভাবে প্রস্ফুট করিয়া দেখান হয় নাই; সূর্য্যমুখীর প্রতি বিতৃষ্ণার কোন পর্য্যাপ্ত কারণ দেওয়া হয় নাই; সূর্য্যমুখীর নিজের কোন অপরাধ এই বিচ্ছেদ সংঘটনে সহায়তা করে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান উপন্যাসে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের ভাবের রূপান্তর, দয়া ও সমবেদনা হইতে প্রেমে পরিণতি যথেষ্ট পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তার পর বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর জীবন প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বাহ্যসম্পর্কশূন্য—বাহিরের জগৎ হইতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক আসিয়া আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তোলে, সেগুলিকে যেন সযত্নে বর্জ্জন করিয়াই উহার বিরোধের ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে—বাহিরের শক্তির মধ্যে এক হীরাই নায়ক-নায়িকার দুর্ভেদ্য অন্তঃপুরদুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। কমলমণিও, অন্তরের যে গভীরস্তরে এই সমস্যার জাল পাকাইয়া আসিতেছিল নিয়তির সেই গোপন কক্ষে, প্রবেশ লাভে অধিকারিণী হয় নাই, কেবল বাহির হইতে সান্ত্বনা সমবেদনার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল। কিন্তু একান্নবর্ত্তী বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারে বাহিরের সঙ্গে এরূপ সম্পর্কলোপ প্রায়ই সম্ভব হয় না; আমাদের অন্তরে যে গুরুতর বিপ্লববহ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, তাহা আমাদের পরিজন ও প্রতিবাসীদের ফুৎকারেই শিখা বিস্তার করে; শতবন্ধনজালজটিল সামাজিক জীবন আমাদের অন্তরের সমস্যাকে আত্মসীমা-নিবদ্ধ (self-contained) থাকিতে দেয় না, তাহার উপর সূক্ষ্ম, দুরতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদের ভাগ্য-সূত্রকে আরও গ্রন্থি-সঙ্কুল করিয়া তোলে। আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রার উপরে এই প্রতিবাসী-শ্রেণীর জীবের প্রভাব বড় অল্প নহে। অবশ্য অনেক সময় উপন্যাসকার আমাদের অন্তরের ভাবগুলির ঘাত-প্রতিঘাত স্পষ্টতররূপে দেখাইবার জন্য আমাদের অন্তর্জীবনকে প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া ইহাকে অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের তলে সমর্পণ করেন—কিন্তু বাঙ্গালী জীবনের উপন্যাসে এইরূপ প্রক্রিয়া যেন একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই আমাদের চক্ষে ঠেকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই বাহ্য জগতের শক্তিকে অযথা ক্ষীণ করিয়া দেখান হয় নাই; ইহা অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর ইহার সমুচিত ও ন্যায্য প্রভাবই বিস্তার করিয়াছে। এই বাহ্যশক্তিগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান কৃষ্ণকান্তের উইল। প্রত্যেক বার উইল-পরিবর্ত্তন কেবল যে সম্পত্তির বিভাগ-বণ্টনের অংশ বদ্‌লাইয়াছে তাহা নহে, ইহা একটী অলঙ্ঘ্য বিধিলিপির ন্যায়ই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভাগ্যপরিবর্ত্তনও করিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের তৃতীয় উইল, যাহাতে হরলালের ভাগে শূন্য পড়িল, তাহা হরলালকে রোহিণীর সাহায্য-প্রার্থী করিয়া রোহিণীর জীবনে একটী অভাবনীয় নূতন পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল। রোহিণীর তীব্র মনোবৃত্তি শীতাগমনিস্তেজ কুণ্ডলীকৃত সর্পের ন্যায় তাহার হৃদয়-বিবরে সুপ্ত ছিল তাহাকে খোঁচা দিয়া জাগাইয়া তুলিল; দংশনলোলুপ বিষধরবৎ সে ফণা উন্নত করিয়া উঠিল। এই নব-জাগ্রত-প্রেম-ক্লিষ্টার চক্ষে গোবিন্দলালের সাধারণ সমবেদনা ও তৎপ্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের জন্য অনুতাপ তাহার তৎ-কালীন মনোবিকারের মধ্য দিয়া

পরিণতিই প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল। অতঃপর দ্বিতীয়বার উইল পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়া রোহিণী ধরা পড়িল; এবং এই বন্ধন অবস্থাতেই গোবিন্দলালের সহানুভূতির নিবিড়তর সম্পর্কে আসিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তনের এক নূতন সোপানে পা দিল; গোবিন্দ লালের নিকট নিজ অনিবার্য্য প্রণয়াবেগের কথা স্বীকার করিয়া ফেলিল; গোবিন্দ লাল আবার এই কথা ভ্রমরের নিকট প্রকাশ করিল; ভ্রমর তাহাকে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিল; প্রেমজর্জ্জরা, নিরাশা দগ্ধ-হৃদয়া রোহিণী সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। তারপর গোবিন্দলাল কর্ত্তৃক জলমগ্না রোহিণীর উদ্ধার ও পুনর্জ্জীবন দান; এবং তাহার রোহিণী কর্ত্তৃক আকর্ষণের প্রথম অনুভব— এই সমস্তই এক অলঙ্ঘ্য-নিয়তি-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উইল-চুরির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে আসিয়া পড়িল। আবার কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে উইলের শেষবার পরিবর্ত্তন ও ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দ লালের বিরাগের মাত্রা পূর্ণ করিয়া নিয়তি হস্ত প্রেরিত ছুরিকার ন্যায় দম্পতির মধ্যে ছিন্নপ্রায় বন্ধনসূত্রের শেষ গ্রন্থিটী ছেদন করিয়াছে। পুনশ্চ, এই উপন্যাসের মধ্যে যেটী প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় ভ্রান্তি, যাহা নায়ক-নায়িকার ভাগ্য-স্রোতকে নূতন পথে ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহা ভ্রমরের গোবিন্দ লালের প্রতি অবিশ্বাস ও অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া পিতৃগৃহ-যাত্রা; এই কাজটীই গোবিন্দ লালের দোলাচল চিত্তবৃত্তিকে একবারে নিঃসংশয়িত ভাবে রোহিণীর দিকে হেলাইয়াছে; অথচ এই গুরুতর পরিবর্ত্তনটী বাহিরের লোকের ঈর্ষা, বিদ্বেষ, সহানুভূতির অভাব ও পরচর্চা-প্রিয়তার দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে (২০-২৩ পরিচ্ছেদ)। ঠিক যে মুহূর্ত্তে গোবিন্দ লাল ভ্রমরের একত্রাবস্থান তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেই সময়ই ভ্রমরের শাশুড়ী আসিয়া তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন; এমন কি কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুও এমন অসময়ে ঘটিল, যে ইহাও এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দম্পতির মনোমালিন্য-লোপের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, বিরোধের যে বাষ্প প্রথম অবস্থাতে একটা ফুৎকারেই উড়িয়া যাইতে পারিত, তাহাকে ঘনীভূত করিয়া আলোক রেখার দ্বারা সম্পূর্ণ অভেদ্য করিয়া তুলিল। এইরূপ সর্ব্বত্রই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে; নিয়তি যেখানে দুর্ভাগ্য মানবের জন্য জাল পাতিয়া রাখিয়াছে সেখানে বাহ্যজগতের একটা ঈর্ষা-ক্রূর শক্তি তাহাকে অনিবার্য্যবেগে সেই আসন্ন বিপদের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে; বাহিরের প্রতিবন্ধক আসিয়া অন্তরের বিরোধটিকে জটিলতর ও অধিকতর দুরতিক্রমনীয় করিয়া তুলিয়াছে বাহ্যজগতের এই ঈর্ষা-ক্রূর প্রতিকূলতা, তাহার মুখে এই বক্র-উপহাসপূর্ণ হাসিটী আমাদিগকে বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির Ironic treatment of nature এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই বিষয়ে বিষবৃক্ষের অপেক্ষা কৃষ্ণকান্তের উইলের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব।

আরও একটী বিষয়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষের' অপেক্ষা বাস্তবতার অধিকতর অনুগামী——উপন্যাসের পরিণাম-সংঘটনে। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর পুনর্ম্মিলন

অনেকটা রোমান্স-সুলভ-আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিপদ্-ঝটিকার পূর্ণবেগ কুন্দনন্দিনীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে ; সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্র যেন একটা স্বল্পকালব্যাপী দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া আবার তাহাদের চিরাভ্যস্ত প্রেমের জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে ; আগুণের আঁচ সকলকেই অল্প বিস্তর লাগিলেও এক কুন্দনন্দিনীই ইহাতে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে, অগ্নি প্রান্তদেশ দাহ করিয়াই চলিয়া গিয়াছে, উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলকে স্পর্শ করে নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নায়ক-নায়িকারা এত সহজে অব্যাহতি পায় নাই, লেখক পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া, বাধার উপর বাধা স্তূপীকৃত করিয়া ভ্রমর-গোবিন্দলালের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃজন করিয়াছেন, তাহা শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে, তাহাদের গভীর মনোব্যথার কোন সুলভ সমাধান সম্ভব হয় নাই ; ভ্রমর, গোবিন্দলাল, রোহিণী ইহাদের প্রত্যেকের উপর দিয়াই নিয়তি তাহার নিষ্করুণ রথচক্র চালাইয়া গিয়াছে, কোন সদয় হস্ত তাহাদিগকে চক্রগতির সীমার বাহিরে পথিপার্শ্বে সরাইয়া রাখে নাই। লেখক এখানে রোমান্সের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মায়ায় ভুলেন নাই, নিয়তির অমোঘ পথরেখারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষা গোবিন্দলালের নিষ্ঠুরতা আরও হৃদয়হীন ও প্রায়শ্চিত্ত আরও কঠোর ; সূর্য্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমরের দুঃখ আরও মর্ম্মস্পর্শী, সূর্য্যমুখীর একান্ত ক্ষমা হইতে ভ্রমরের অনির্ব্বাণ অভিমান ও হত্যাকারী স্বামীর বিরুদ্ধে নিবৃত্তিহীন বিরাগ অধিকতর বাস্তবানুগামী। গোবিন্দলালের শেষ বয়সে সন্ন্যাসে শান্তিলাভ—প্রকৃত পক্ষে উপন্যাসের সীমাবহির্ভূত ; ইহা আর্ট অপেক্ষা রুচি ও বিশ্বাসেরই কথা ; আর উপন্যাসের বাস্তবতার যে অসাধারণ তীব্রতা, তাহা ইহার দ্বারা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম বাস্তব প্রণালীর অনুসরণ করিয়াও তাঁহার চিরপ্রিয় রোমান্সের প্রভাব হইতে নিজেকে একেবারে মুক্ত করেন নাই : তাঁহার দৃষ্টি ও নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে রোমান্সের একটী অতিসূক্ষ্ম রঙ্গীন যবনিকা ব্যবধান রাখিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই সূক্ষ্ম যবনিকাও পরিত্যক্ত হইয়াছে ; বঙ্কিম অকম্পিত চক্ষুতে, সমস্ত বাধা-ব্যবধান সরাইয়া ফেলিয়া, অবিমিশ্র বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের মধ্যে একটী অসাধারণ রসপূর্ণ ও দুঃখ-গৌরব-মণ্ডিত সংঘাতের চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই খানে আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন মনে করি। আধুনিক ঔপন্যাসিক-দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, বঙ্কিমের আর্টে অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতার উদাহরণস্বরূপ রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে রোহিণীকে ঐরূপ অকস্মাৎ মারিয়া ফেলিয়া বঙ্কিম সামাজিক ধর্ম্মনীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কলাবিদের কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন, রোহিণীকে বলি দিয়া সমাজ-ধর্ম্মের ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়াছেন। আমার আর একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুও আমার সহিত কথোপ-কথনকালে অস্পষ্ট একপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—রোহিণীর অকস্মাৎ মৃত্যু যেন একটা খুব জটিল সমস্যার অন্যায়রূপ সুলভ সমাধান। সুতরাং আমি এই প্রশ্নটী যথাসাধ্য অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিয়া বঙ্কিমের অনুসৃত পন্থার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি ; এবং এই আলোচনার ফলস্বরূপ আমার যে ধারণা হইয়াছে তাহাই এখানে

সসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেছি। আমার মত এই যে মোটের উপর বঙ্কিম এখানে ঠিক পথই অনুসরণ করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধেয় সমালোচকেরা হয়ত তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করেন নাই। শরৎচন্দ্রের সমালোচনার অর্থ যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে তিনি এই বলিতে চাহেন—বঙ্কিম রোহিণীর প্রণয়-কাহিনীটী বেশ সহানুভূতির সহিত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যেন আজন্ম-প্রণয়-বঞ্চিতা বিধবা যুবতীর পক্ষে এরূপ প্রেম-প্রবণতা একটা স্বাভাবিক ইচ্ছার বিকাশ, ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী মাত্র; তারপর যখন দেখিলেন যে রোহিণীর চিত্রটী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল, ও তাহার প্রেমাকাঙ্খা পাঠকের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, তখন হঠাৎ এই চিত্রের নৈতিক ফলাফলের কথা তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল, এবং তিনি কলাবিদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া রোহিণীকে বন্দুকের গুলিতে মারিয়া ফেলিয়া, অবৈধ প্রণয়ের নৈতিক বিষময় ফল প্রদর্শন করিলেন, ও তাঁহার নিজের নীতিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ আছে তাহাই সপ্রমাণ করিলেন। শরৎচন্দ্রের উক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে তাহার মধ্যে বিশেষ জোর থাকে না; কেন না পাপের দণ্ডমাত্রই কলাকৌশলের দিক্ হইতে নিন্দনীয় নহে; যদি পাপের শাস্তি, আর্টিষ্টের নিজ অভিরুচি বা সহানুভূতির বিরুদ্ধে, আর্টের অননুমোদিত কোন উপায়ে, একটা অতর্কিত আকস্মিকতার সহিত, দেওয়া হয়, তবেই তাহাতে অনুচিত নীতিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং যদি দেখান যায়, যে বঙ্কিম প্রথম হইতেই রোহিণীর প্রেম সঞ্চারকে idealise করিতে তাহার উপর আদর্শবাদের মায়ালোক নিক্ষেপ করিতে চাহেন নাই, প্রথম হইতেই ইহার মধ্যে একটা বিসদৃশতা, একটা ইতর মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার রোহিণীর চরিত্রাঙ্কণ বিষয়ে কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ 'আত্যন্তিক নীতিজ্ঞানবিমূঢ়তার অভিযোগ হইতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য ইহা সত্ত্বেও বল' চলিবে যে রোহিণীর অতর্কিত হত্যা bad art or কলাকৌশলের দিক হইতে নিন্দনীয়, এ আপত্তি তখনও প্রবল থাকিবে। আমরা প্রথম শরৎচন্দ্রের আপত্তি খণ্ডন করিয়া, পরে এই দ্বিতীয় আপত্তির সমাধান করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা রোহিণীর চরিত্রের ক্রম-বিকাশ ও তৎসঙ্গে বঙ্কিমের মন্তব্যগুলি যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব যে যদিও রোহিণীর দুরবস্থার প্রতি লেখকের দয়া বা সহানুভূতির অভাব ছিল না, তথাপি এই অবৈধ প্রেমের পথে তাহার প্রত্যেক নূতন পদক্ষেপই তাহার চরিত্রের একএকটী অপ্রীতিকর অংশই বিকাশ করিয়াছে, ও লেখকের সহানুভূতির ভাণ্ডার ক্ষয় করিয়া আনিয়া ক্রমশঃ কঠোরতর সমালোচনাই উদ্রিক্ত করিয়াছে। রোহিণীর ঐ প্রেম-বিকাশের মধ্যে তাহার চরিত্রের যে অংশ বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই—যে এই অনিবার্য্য নূতন উন্মেষকে কুন্দনন্দিনীর ন্যায় সলজ্জ সঙ্কোচ ও কঠোর আত্মগ্লানির সহিত গ্রহণ করে নাই, সে ইহাকে দুই হাত মেলিয়া লজ্জা শালীনতার সীমারেখা ছাড়াইয়া, একটা উৎকট বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াছে। আমরা প্রথমেই দেখি যে হরলালের একটা সামান্য প্রলোভনের ইঙ্গিতমাত্রেই সে চুরি পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই—ইহাই কি তাহার চরিত্রগত ইতরতার একটা অবিসংবাদিত নিদর্শন নহে? তারপর

হরলাল কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াও গোবিন্দলালের নিকট অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি লাভ করিয়া তাহার মনে অনুতাপ, ও অন্যায়প্রতিকার-সঙ্কল্প প্রভৃতি দুই একটী সদ্‌গুণের ক্ষণিক বিকাশ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রেমের বিক্ষুব্ধ বাত্যাতাড়িত সরোবরেই এই পদ্মফুল ফুটিয়াছিল, এবং অল্পকালের মধ্যেই ইহারাও প্রেম-লালসাতেই রূপান্তরিত হইয়াছে। অতঃপর চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া রোহিণী নিতান্ত লজ্জাহীনার ন্যায়ই গোবিন্দলালের নিকট নিজ প্রণয়াসক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছে, ও লালসা-তাড়িত হইয়া গোবিন্দলালের প্রস্তাবিত স্থানত্যাগে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে; রোহিণীর এই অসম্মতির সহিত কুন্দনন্দিনীর কলিকাতা যাইতে সম্মতি তুলনা করিলেই উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য পরিষ্কার হইবে। ইহার পরবর্ত্তী ব্যাপার হইতেছে রোহিণীর বারুণী-নিমজ্জন; অবশ্য ইহাই তাহার প্রণয় জ্বালার অসহনীয়তার একটী অভ্রান্ত প্রমাণ, এবং এই প্রণয়ের জন্য আত্মহত্যাই আমাদের বিচার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া তাহার উপর একটা আদর্শলোকের দীপ্তি ও রমণীয়তার স্পর্শ আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম এখানেও দেখাইতে ভুলেন নাই যে একটা অবিমিশ্র উৎকট লালসাই তাহার আত্মঘাতের মূল কারণ, ইহার মধ্যে উচ্চতর বৃত্তি কিছুই নাই। অতঃপর তাহার কলঙ্করটনার পর সে যে কাজ করিয়া বসিল, তাহাই তাহার দুঃসাহসিক, দুরন্ত, ও একান্ত লজ্জাহীন প্রকৃতিটী উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—সে যে গোবিন্দলালের অনুগৃহীত, তাহাই মিথ্যা-প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা সাব্যস্ত করিতে ভ্রমরের বাড়ী চড়াও হইয়াছে। এইখানে (৩২শ পরিচ্ছেদ) বঙ্কিমের মন্তব্য হইতেছে:—"রোহিণী না পারে, এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব্ব পরিচয়ে জানা গিয়াছে" ও "স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি; কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, একথা তত মানি না।" ইহার পর রোহিণীর মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, সে বিনা বাক্যব্যয়ে, অনুতাপের বিন্দুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া, সুখের পরিবারে যে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়াছে, তাহার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া অবৈধ-প্রণয়-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। এই পর্য্যন্ত বিশ্লেষণে আমরা যাহা পাইলাম তাহাতে নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ হয় যে বঙ্কিম রোহিণীর প্রণয়-লীলাকে বিশেষ সহানুভূতির চক্ষে দেখেন নাই, ও ইহার অন্তর্নিহিত ইতরতার উপর কোন বিশেষপ্রকারের মাধুর্য্যসঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন নাই; সুতরাং সজোজাগ্রত নীতিজ্ঞান যে তাঁহার আর্টের নৌকার মুখ সবলে ফিরাইয়া স্বাভাবিক তরঙ্গ-প্রবাহের বিপরীত দিকে লইয়া গিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। রোহিণীর চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছার প্রথম অঙ্কুর হইতে শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত অতর্কিত পথ-পরিবর্ত্তনের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।

এইবার দ্বিতীয় আপত্তির আলোচনা করিব; রোহিণীর অতর্কিত মৃত্যু, লেখকের প্রথমাবধি উদ্দেশ্যানুযায়ী হইলেও, bad art; কেন না এই পরিণতির জন্য লেখক পাঠকের মনকে যথেষ্টভাবে প্রস্তুত করেন নাই। রোহিণীর চতুর্দ্দিকে যে জটিল সমস্যা গড়িয়া উঠিতেছিল, লেখক তাহার আকস্মিক মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া, সেই সমস্যার সুলভ সমাধান সাধন করিয়াছেন। এই আপত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন নহে; কিন্তু বঙ্কিমের সপক্ষে যে যুক্তি আছে, তাহা [illegible] করিলে এই আপত্তির প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না। বঙ্কিমের

পাপ-চিত্রের বিস্তৃত বর্ণনায় যে একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ; সুতরাং রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়-চিত্র যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলে তাহার মধ্যে এই আকস্মিক পরিণতির ইঙ্গিত ও পূর্ব্বলক্ষণ পাওয়া যাইতে পারিত, উপন্যাসে আমরা সেরূপ কিছু পাই না ; সেই জন্য রোহিণীর মৃত্যু বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। পাঠকের মনে এই ধারণার জন্য বঙ্কিমের রচনা-প্রণালী ও পাপ-বর্ণনায় প্রতি আত্যন্তিক বিমুখতা যে কতকাংশে দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বঙ্কিম মন্তব্য ও বিশ্লেষণের দ্বারা বর্ণনার অভাব কতকটা সারিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই মন্তব্যগুলি মনোযোগের সহিত অনুসরণ করিলে রোহিণীর পরিণামের আকস্মিকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইবে। এই বিষয়ে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মধ্যে একটু উল্লেখ-যোগ্য প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম প্রলোভনের চিত্রটী সংক্ষেপে সারিয়াছেন, ও ইহার পরবর্ত্তী অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্যটীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন ; 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন ; এখানে প্রলোভনের চিত্রটী বিস্তারিত ও প্রায়শ্চিত্তের চিত্রটী সঙ্কুচিত ও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। শেষোক্ত উপন্যাসে ভ্রমরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, রোহিণীর মৃত্যু, গোবিন্দলালের অন্তর্দ্দাহ ও প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে, কেবল মাত্র বিশ্লেষণের দ্বারাই, বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য বঙ্কিমের একই প্রকার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে অনিচ্ছার জন্যই এই দুইখানি উপন্যাসে এরূপ বিরুদ্ধ প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' প্রায়শ্চিত্তের খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াতে এই দোষ হইয়াছে যে উহার সমস্ত স্তরগুলির পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা হয় নাই, ও উহার কার্য্যকারণশৃঙ্খলের মধ্যে অনেক দুর্ব্বল গ্রন্থি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া পাঠকের ধারণা হইয়াছে। এই ধারণা অনেকটা ন্যায্য ইহা স্বীকার করিয়া আমরা বঙ্কিমের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ হইতে তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যটী পুনর্গঠন করিয়া লইতে চেষ্টা করিব।

গোবিন্দলালের উপর রোহিণীর আকর্ষণের তীব্রতা যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল, এবং রোহিণীকে গুলি করিয়া মারা যে কেবল তাহার দৈহিক মরণ নহে, পরন্তু গোবিন্দলালের উপর তাহার প্রভাবের অবসান—এইটী ফুটাইয়া তোলা নিশ্চয়ই বঙ্কিমের মনোগত উদ্দেশ্য ছিল। প্রণয়-তরঙ্গে ভাঁটা না ধরিলে, অবিশ্বাসিতার প্রথম চেষ্টাতেই যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিবেন, ইহা একটু অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় ; গোবিন্দলাল একটা বর্দ্ধমান বিতৃষ্ণার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে যুদ্ধ করিতেছিলেন, এবং এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বই তাঁহাকে তাঁহার অজ্ঞাতসারে এরূপ একটা সাংঘাতিক পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে' অচলার সহিত একটা দীর্ঘ অন্তর্ব্বিরোধ, অতৃপ্ত প্রেমের একটা রুদ্ধ ক্ষোভই সুরেশকে প্লেগের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শক্তি ও বেগ দিয়াছিল ; এই পূর্ব্বগামী বিক্ষোভের বিস্তৃত বর্ণনা ব্যতীত তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক করিয়া তোলা সম্ভব হইত না। বঙ্কিম এই শেষমুহূর্ত্তের ঝম্পপ্রদানটী বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে বিপুল শক্তি ঠেলা দিতেছিল, সুরুচি ও সংযমের খাতিরে তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। ইহা আর্টের দিক্ হইতে দোষ হইতে পারে, কিন্তু এরূপ কল্পনায় অপরিস্ফুট অঙ্কুর

যে তাঁহার মনোমধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইবে।

"রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে এ রোহিণী, ভ্রমর নহেন—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকি-নিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়-সাগর-মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে, সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে; কিন্তু তখন সেই পূর্ব্ব-পরিজ্ঞাত-স্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়সুধা—স্বর্গীয়গন্ধযুক্ত চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধ-স্বরূপ, দিবা রাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল, যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীত স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী, ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা, তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অতশীঘ্রই মরিল! যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথাই এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বিশেষ বর্ণনা-বাহুল্য নাই; লেখক নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা-গুলিতেই আপনাকে সীমা-বদ্ধ করিয়াছেন, যেন গ্রন্থের বিষাদময় পরিণতি তাঁহার কল্পনাবিলাসের পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই একটা সংযত ভাব-প্রকাশ, একটা পরিমিত সামঞ্জস্য-বোধ, একটা নির্দ্দোষ ঘটনা-বিন্যাসশক্তি, ও একটা বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় ক্ষিপ্রগতি ও উজ্জ্বল বুদ্ধির নিদর্শন দেদীপ্যমান। গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ যেন নিয়তির অদৃশ্য রজ্জুর এক একটা পাক; উপন্যাসটা যেমন সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তেমনি এই বন্ধন যেন কাটিয়া কাটিয়া আমাদের হৃদয়ে গভীরতরভাবে বসিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের রহস্যময় সাঙ্কেতিকতার দিকে যে প্রবণতা, তাহা এই কঠোর বাস্তব উপন্যাসেও দুই একটী ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গোবিন্দলাল যে মুহূর্ত্তে রোহিণীর অধরে অধর স্থাপন করিয়া ফুৎকার দিলেন, ভ্রমর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিড়ালকে লাঠি মারিতে গিয়া নিজের কপালে লাঠি মারিয়া বসিল। জগতের এই রহস্যময় ইঙ্গিতগুলির প্রতি সূক্ষ্মদর্শিতা আমাদিগকে ক্ষণেকের জন্য E. A. Poe বা Nathaniel Hawthorneএর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও উচ্ছ্বসিত কল্পনা-লীলা প্রথম খণ্ডের সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে ভ্রমর-গোবিন্দলালের পরস্পরের প্রতি পরিবর্ত্তিত ব্যবহারের বর্ণনায় একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। অতি অল্পস্থানের মধ্যে এরূপ গভীর ভাবপ্রকাশ, বিশ্লেষণ ও কবিত্ব শক্তির এরূপ অসাধারণ সম্মিলন আর কোন উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস; ইহা বঙ্কিমপ্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; রোমান্সের বিশাল জগৎ হইতে সামাজিক

জীবনের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া বঙ্কিমের প্রতিভা এই নূতন সংযম বন্ধনের মধ্যে একটা অসাধারণ দৃঢ় ও পেশীবহুল শক্তি লাভ করিয়াছে, স্বচ্ছন্দবিহার বিসর্জন দিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী নূতন বিশ্লেষণগভীরতা অর্জ্জন করিয়াছে। যখনই আমাদের বঙ্কিমের ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতি ও অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতিভাজ্যোতি ম্লান করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তখনই বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের স্মৃতিমাত্রই আমাদের সকল তুচ্ছ সন্দেহ নিরসন করিয়া বঙ্কিম-প্রতিভায় আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া দিবে সন্দেহ নাই এবং অন্তরমধ্যে এই অক্ষুণ্ন বিশ্বাসের পুনঃসংস্থাপনই বঙ্গসাহিত্য পাঠকের পক্ষে বঙ্কিমের নিকট বিদায় লইবার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈদিক জাতি বা বর্ণতত্ত্ব

বেদের মতে মানবজাতি এক পিতার সন্তান

কোরাণ বলে সমস্ত মানবজাতি "বনী আদামা"—এক আদমের সন্তান। কি আশ্চর্য্য ঋগ্বেদও বলিতেছে—সমস্ত মানবজাতি এক নহুষের সন্তান—অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্যা অগ্নিং মনুষো নহুষো বিজাতাঃ" (১০-৮০-৬)। "মানুষ প্রজা (বিশঃ) যত আছে, সকলে অগ্নির স্তব করে, নহুষ হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন জাতীয় মানুষ অগ্নির স্তব করে।" এই মন্ত্রে আমরা দেখিতেছি সকল মানুষই "বিশ্" বা বৈশ্য, এবং বিভিন্ন জাতীয় মানুষ এক "নহুষ" হইতে উৎপন্ন। এমন কি ঋগ্বেদে মানুষের নামান্তর নাহুষ। (১) ঋগ্বেদের এই 'নহুষ' নামটীর সহিত কোরাণের 'নুহ্' বা 'নু' এবং বাইবেলের 'নো-আ' (Noah) নামটীর তুলনা করিলে কে না বলিবে 'নহুষ্', 'নুহ্', 'নু' এবং 'নো-আ' তিনটীই একজনের নাম? 'নুহ্', 'নু', এবং 'নো-আ', বৈদিক নহুষ নামেরই ভগ্নাবশেষ? কে না বলিবে যে বেদ কোরাণ এবং বাইবেলের মতে সমস্ত মানবজাতি এক পিতার সন্তান? ঋগ্বেদে আবার মানুষকে মনুর সন্তান, (২) মনুকে মানুষের পিতা

(১) "সরস্বতী ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায়" (৭-৯৫-২)
"নাহুষা যুগা" (৫-৭৩-৩) "নাহুষা মনুষ্যাঃ তেষাং যুগাঃ" (সায়ণ)।
(২) "প্রজা অজনয়ন্ মনূনাং" (১-৯৬-২);
"মনুষ্পিতা" (১-৮০-১৬);
"যৎ শং চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা" (১-১১৪-২);
"যানি মনুরাবৃণীত পিতা নঃ" (২-৩৩-১৩);
"মনুষ্পিতা দেবেষু ধিয় আনজে" (৮-৬৩-১, বালখিল্য); "মনুঃ প্রমতি র্নঃ পিতা" (১০-১০০-৫)

বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আবার বলা হইয়াছে, (৩) মনুর প্রভৃতি প্রীতিমান্ (দেবগণ) যাহারা বিবস্বতের অর্থাৎ বিবস্বৎ-পুত্র মনুর সন্তান মনুষ্যগণকে ধারণ করেন। এই বিবস্বৎ কে? (৪) এই বিবস্বৎ যিনি মনুর পিতা, তিনি আবার যমেরও পিতা। আরও শুধু তাহাই নয়। ত্বষ্টাদেব কন্যার (সরন্যূর) বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। সেই উপলক্ষে সকল লোক তথায় উপস্থিত। যমের মাতা মহান্ বিবস্বতের স্ত্রী বিবাহ হইতেছে এমন সময়ে অদৃশ্যা হইলেন। দেবগণ অমর সরন্যূকে মরলোক হইতে লুকাইলেন। তাহারই সদৃশ (সবর্ণাং) আর একটী কন্যা করিয়া বিবস্বৎকে দান করিলেন। যখন এরূপ হইয়াছিল তখন সরন্যূ অশ্বিনীদ্বয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। সরন্যূ দুই মিথুন (যম-যমী) ও প্রসব করিয়াছিলেন। ইহার ভিতরে ইতিহাস ও উপকথা (myth) উভয়ই জড়িত। বিবস্বৎ অর্থ বিশেষ দীপ্তিশালী সূর্য্য। সরন্যূ অর্থ ঊষা। সূর্য্যোদয়ে ঊষা অন্তর্হিত হয় এই এক অর্থ। আবার বৈদিক বিবস্বৎ, জেন্দাবেস্তার বিবঙ্ঘৎ, মানব-জাতির একজন আদিপুরুষ—একজন আদিম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঋষি বা রসুল। বেদ বলে তাহার পুত্র 'যম' এবং জেন্দাবেস্তা বলে তাহার পুত্র "যিম।" বেদের যম যে একজন আদিম ঋষি বা রসুল, কঠোপনিষদ তাহার সাক্ষী। যিম যে একজন প্রধান ঋষি (বা রসুল) জেন্দাবেস্তা তাহার সাক্ষী।—"the holy Yima, the son of Vivanghat, the preacher of my law।" মনু নামে বিবঙ্ঘতের অন্য পুত্র ছিল, এরূপ কথা জেন্দাবেস্তাতে নাই। আবার মনু যে যমের ভাই, এরূপ কথাও কোন বেদে অথবা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নাই।

আদিম জল-প্লাবন। (৫)

যদিও ঋগ্বেদে,—বাইবেল ও কোরাণ নো-আ সম্বন্ধে যেরূপ বলিতেছে,—সেরূপ কোন লোকক্ষয়কারী ভীষণ জল-প্লাবনের উল্লেখ নাই, নহুষ সম্বন্ধেও নাই, মনু সম্বন্ধেও নাই, তথাপি শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে মনুর সময়ের যে জলপ্লাবনের বর্ণনা আছে, যদিও তাহাতে নহুষের নাম নাই, তথাপি বোধ হয় যেন তাহা 'নোওয়ার' সময়ের জল-প্লাবনেরই বৈদিক আকার। নোওয়ার জলপ্লাবনে যেমন এক মাত্র 'নোওয়াই' জীবিত ছিলেন ("Noah only remained alive"), মনুর জলপ্লাবনেও দেখা যায় একমাত্র মনুই জীবিত ছিলেন—"মনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে।"

বাইবেল মতে যেমন সাদা, কালো, লাল, পীত সমস্ত মানবজাতি একজাতি, এক পিতার, এক নো-আর সন্তান, শতপথ ব্রাহ্মণ মতেও সাদা, কালো, লাল, পীত সমস্ত মানবজাতি এক পিতার, এক মনুর সন্তান।—আর্য্য, অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান সকলে একজাতি। আমরা সংক্ষেপে শতপথ ব্রাহ্মণের (৬) বর্ণনা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

---

(৩) যে দিধিষন্তে আপাং মনু-প্রীতাসো জনিমা বিবস্বতঃ (১০ ৬৩-১)

(৪) "যম বিবস্বন্তং হবে যঃ পিতা তে" (১০-১৪-৫); "ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি। যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ॥ অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণাম দদুর্বিবস্বতে। উতাশ্বিনাবভরৎ যৎ তদাসীদ জহাদুদ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ॥ ১০-১৭-১, ২॥

(৫) "I bring a flood to destroy all flesh ... ... Noah only remained alive."

'একদিবস প্রাতঃকালে মনু হাতমুখ ধুইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার হাতে একটী মৎস্য পড়িল। মৎস্য তাঁহাকে বলিল—"আমাকে পালন কর, তোমাকে আমি পার করিব।"

মনু। কি হইতে আমাকে পার করিবে?

মৎস্য। জলপ্লাবনে সমস্ত প্রজা ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। তখন আমি তাহা হইতে তোমাকে পার করিব। সেই জলপ্লাবন যখন আসিবে, নৌকা ঠিক্ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইবে। সেই সময় নৌকার আশ্রয় লইও। আমি তোমাকে পার করিব।

মৎস্য যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিল সেই সময় মনু নৌকা ঠিক্ করিয়া মৎস্যকে স্মরণ করিলেন। জলপ্লাবন আসিলে, তিনি নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মৎস্য তাহাকে লইয়া ধাবিত হইল। নৌকার দড়ি মাছের শুঁড়ের সহিত বাঁধা হইল। নৌকা লইয়া মৎস্য উত্তর গিরি অতিক্রম করিয়া দৌড়িল। মৎস্য বলিল, নৌকা বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখ; জল যেমন ধীরে ধীরে নামিয়া যাইবে, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।"

মনু সেইরূপেই জলের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এই কারণে ইহাকেই বলে উত্তর গিরি হইতে মনুর প্রত্যাগমন। জলপ্লাবন সমস্ত প্রজা ভাসাইয়া লইয়া গেল। পৃথিবীতে এক মাত্র মনু শুধু অবশিষ্ট রহিলেন।"

নো-আর জলপ্লাবনের বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার তুলনা করিলে দেখা যায়—উভয়ত্র নৌকার কথা, পর্ব্বতের কথা, সমস্ত প্রজার নাশের কথা, একমাত্র 'নো-আ' অথবা মনুর জীবন ধারণের কথা। নহুষ মনুরই নামান্তর কি না, অথবা নামের কোন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে কি না পাঠক সে সম্বন্ধে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত করিবেন। সে যাহাই হউক—(ম)নুর সন্তানই হউক অথবা নহুষের সন্তানই হউক, (ম)নু এবং নহুষ দুই ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও বেদের মতে, সমস্ত মানবজাতি যে একপিতার সন্তান, সাদা কাল লাল পীত আর্য্য অনার্য্য সকলে একজাতি, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

---

(৬) মনবে হবৈ প্রাতঃ অবনেনিজ্যানায় মৎস্যঃ পানী আপেদে। স হাস্মৈ বাচমুবাদ। বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি। কথাস্মা পারয়িষ্যাসি। ঊঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নির্বোঢ়া তত স্ত্বা পারয়িতাস্মি। তদৌঘ আগন্তা তন্মা নাবমুপকল্প্যোপাসাসৈ। স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপদ্যা সৈ তত স্ত্বা পারয়িতাস্মি। যতিথীং তৎ সমাং পরিদিদেশ ততিথীং সমাং নাবমুপ কল্প্যোপাসাং চক্রে। স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপেদে। তং স মৎস্য উপন্যা পুপ্লুবে। তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমুচে তেনৈতমুত্তরং গিরিং অতি দুদ্রাব। বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নিষ। যাবতুদকং সমবায়াৎ তাবৎ তাবৎ অন্ববসর্পাসি। স হ তাবত্তাবদেব অন্ববসসর্প। তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরের্মনোরব সর্পণং। ঔঘঃ হ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নিরুবাহাথেহ মনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে॥"
শতপথ ব্রাহ্মণ ১-৮-১॥

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] ফাল্গুন, ১৩৩১ [১১শ সংখ্যা

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চর্চের শাসনতন্ত্রের আর একটা সাধারণ লক্ষণ আছে, সেটা এখানে আলোচনা করা আবশ্যক।

বর্ত্তমানকালে যখন আমরা কোন শাসনতন্ত্রের কথা ভাবি, তখন এটা আমরা নিশ্চয় জানি যে মানুষের বাহ্যআচরণ, মানুষে মানুষে যে ব্যাবহারিক সম্বন্ধ, সেই ক্ষেত্রেই ইহার অধিকারের সীমা; এতদতিরিক্ত কোন বিষয়ে শাসনাধিকারের কোন প্রয়োগ নাই। মানুষের চিন্তা, মানুষের বিবেক, মানুষের চরিত্রনীতি, মানুষের ব্যক্তিগত মত ও ব্যক্তিগত আচার আচরণের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র কোন হস্তক্ষেপ করে না; এ সমস্ত ব্যাপারে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

খৃষ্টীয় চর্চের উদ্দেশ্য ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। সে মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের ব্যক্তিগত আচার আচরণ, মানুষের চিন্তা প্রভৃতি শাসন করিতে চাহিয়াছিল। যে সমস্ত কার্য্য এককালে নীতিবিগর্হিত ও সমাজের অকল্যাণকর কেবলমাত্র সেই সকল আচরণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য এবং কেবলমাত্র এই দ্বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত আচরণের দণ্ডবিধানের জন্য আমরা যেমন একটা ব্যবহার সংহিতা গড়িয়া তুলিয়াছি, চর্চ তাহা করে নাই। সে নীতিবিগর্হিত সমস্ত আচরণের একটা তালিকা প্রস্তুত করিল, এবং সকল গুলিকেই 'পাপ' আখ্যান দিয়া তাহাদের দমনের জন্য দণ্ডবিধান করিল। এক কথায়, চর্চের শাসনতন্ত্র আধুনিক শাসনতন্ত্র সমূহের ন্যায় কেবল বাহ্যমানবকে, মানুষের ব্যাবহারিক সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিল না; সে শাসন করিতে চাহিল মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি, মানুষের বুদ্ধিবিবেক, অর্থাৎ যাহা কিছু মানুষের অন্তরের সামগ্রী, যাহা অবলম্বন করিয়া সে নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে, শাসন বন্ধন মানিতে চাহে না। অতএব চর্চের উদ্দেশ্যের মধ্যেই, এবং তাহার

শাসনতন্ত্রের কতকগুলি মূলনীতির মধ্যেই এমন একটা সম্ভাবনা রহিল যে সে অত্যাচারী হইবে, অবৈধভাবে শক্তি পরিচালন করিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা বিরুদ্ধশক্তি উঠিয়া চর্চের শক্তিকে প্রতিরোধ করিল, যে চর্চ তাহাকে পরাজয় করিতে পারিল না। মানুষের চিন্তা ও স্বাধীনতার গতি যতই সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ থাকুক না কেন, সে সমস্ত শাসন চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া করিতে থাকে, অত্যাচারী শক্তিকে প্রতি মুহূর্ত্তেই অধিকারচ্যুত করিতে থাকে। খৃষ্টীয় চর্চের ক্রোড়ে এইরূপ ব্যাপারই সংঘটিত হইয়াছিল। আপনারা দেখিয়াছেন চর্চ পাষণ্ড-মত দলন করিতে চাহিয়াছে, স্বাধীন চিন্তা অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছে, ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে এবং কর্ত্তৃত্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া মত প্রচার করিতে চাহিয়াছে। উত্তম কথা! কিন্তু চর্চের মধ্যে ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি যেমন সতেজে ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন আর কোন্ সমাজে ঘটিয়াছে বলুন দেখি! বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়, বিভিন্ন পাষণ্ড মত, এগুলি যদি ব্যক্তিগত মতের বিকাশ নহে, তবে কি? চর্চের মধ্যে যে মানুষের বুদ্ধি বিবেকের একটা স্বাধীন লীলা চলিতেছিল, এইগুলি তাহার অকাট্য প্রমাণ। এ লীলার ইতিহাস ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ, বিপদ সঙ্কুল, ভ্রমবিড়ম্বিত, পাপকলঙ্কিত কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে একটা মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য আছে, এবং ইহা হইতে মানব মনের নানা বিচিত্র সুন্দর বিকাশ ঘটিয়াছে এই সকল বিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া চর্চের মূল শাসন তন্ত্রের দিকেই দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন ইহার গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত ইহার কোন কোন নীতির সেরূপ মিল নাই। সে স্বাধীন সত্যানুসন্ধানের অধিকার স্বীকার করে নাই, ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির স্বাধীনতা সে কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছে; অথচ এই বিচার বুদ্ধির নিকটই সে অনবরত জবাব দিহি করিয়াছে, স্বাধীনতার মর্য্যাদা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। সে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে, কোন্ কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছে দেখুন। প্রাদেশিক সংসদ্, জাতীয় সংসদ্, সাধারণ সংসদ্, ক্রমাগত পত্র ব্যবহার, পত্রাদিদ্বারা উপদেশ-অনুযোগ প্রচার, রচনা প্রকাশ—এই সমস্তই ইহার অবলম্বিত উপায়। আর কোন শাসনতন্ত্র কখনও এত অধিক পরিমাণে স্বাধীন বিচার ও সম্মিলিত পরামর্শ দ্বারা শাসন কার্য্য চালায় নাই। এ যেন প্রাচীন গ্রীসের একটা দার্শনিক চতুষ্পাঠী; অথচ এখানে শুধু আলোচনার জন্য আলোচনা নহে, সত্যানুসন্ধানই এ আলোচনার চরম লক্ষ্য নহে; এ আলোচনার ফলে শাসনাধিকার নির্দ্দিষ্ট হইল, বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল, মীমাংসা প্রচারিত হইল—এক কথায় শাসন কার্য্য পরিচালিত হইল। কিন্তু শাসনতন্ত্রের মর্ম্মস্থলেই মানুষের বিচার বুদ্ধির এমন একটা প্রবল ক্রিয়া চলিতেছিল, যে কালক্রমে তাহারই প্রাধান্য ও ব্যাপ্তি ঘটিল, তাহার নিকট আর সকল শক্তিই পথ ছাড়িয়া দিল; এবং চারিদিকে বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীনতার আলোকই প্রভাবিত হইয়া উঠিল।

আমি একথা বলিতে চাই না যে চর্চ-অবলম্বিত কুনীতিদ্বয়ের কোন কফল

ফলে নাই। আমাদের আলোচ্য যুগেই উহারা যথেষ্ট কুফল প্রসব করিয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী যুগে উহারা আরও কুফল প্রসব করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের পক্ষে যতটা অকল্যাণ সাধন করা সম্ভব, ততটা অনিষ্ট তাহারা করিতে পারে নাই; তাহাদের চারিপার্শ্বে একই মৃত্তিকায় যে সমস্ত কল্যাণের অঙ্কুর ছিল সে সবগুলিকে তাহারা চাপিয়া মারিতে পারে নাই।

এই হইল চর্চের স্বরূপ, এই তাহার আভ্যন্তরীণ গঠন, তাহার প্রকৃতি। এখন রাষ্ট্রপতিদের সহিত, ঐহিকশাসকবৃন্দের সহিত চর্চের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল দেখা যাউক।

রোমীয় সাম্রাজ্যের ক্রোড়েই খৃষ্টীয় চর্চের উদ্ভব; রোমীয় শাসনতন্ত্রের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল, উভয়ের রীতিপদ্ধতি, উভয়ের অভ্যাস সংস্কারে অনেক সাদৃশ্য ছিল। সেই রোমীয় সাম্রাজ্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার পরিবর্ত্তে যখন চারিদিকে বর্ব্বরদলপতি ও রাষ্ট্রপতিগণ কখনও যাযাবর ভাবে, কখনও বা স্ব স্ব দুর্গ মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ শাসন করিতে লাগিল, চর্চ তখন বিপন্ন ও শঙ্কাগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

তখন চর্চের মধ্যে একটিমাত্র প্রবল আকাঙ্খা জাগ্রত হইয়া উঠিল—এই সকল নবাগত-বৃন্দকে নিজের অধিকারে আনিতে হইবে, তাহাদিগকে চর্চের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইতে হইবে। চর্চের সহিত বর্ব্বরদিগের প্রথম সম্পর্কের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলিলেই হয়। বর্ব্বরদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে, তাহাদের ইন্দ্রিয় ও কল্পনা আকর্ষণ করিতে হইবে। সুতরাং এই যুগে উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে জাঁকজমক সম্পন্ন নানা বিচিত্র অনুষ্ঠান প্রবেশ করিল দেখিতে পাই। ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে চর্চ প্রধানতঃ এই উপায়েই বর্ব্বর সমাজকে বশ করিয়াছিল। তাহারা যখন নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিল, চর্চের সঙ্গে যখন তাহাদের একটা সম্বন্ধবন্ধন ঘটিল, তখনও কিন্তু চর্চ তাহাদের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারে নাই। বর্ব্বরদিগের পাশবতা ও প্রবৃত্তি-প্রবণতা এরূপ প্রবল ছিল যে নূতন ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব তাহাদের উপর সামান্যমাত্র প্রভাব স্থাপন করিতে পারিল। বর্ব্বরসুলভ অত্যাচার উপদ্রব শীঘ্রই আবার মাথা তুলিয়া উঠিল, এবং সমাজের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় চর্চও এই উপদ্রবের ফলভাগী হইল। পূর্ব্বে রোমীয় সাম্রাজ্যের শাসনকালেই চর্চ অস্পষ্টভাবে একটি নীতি প্রচার করিয়াছিল যে ঐহিক শাসনশক্তি ও পারত্রিক শাসনশক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও পরস্পরনিরপেক্ষ। এখন আত্মরক্ষার জন্য চর্চ এই পুরাতন নীতিটি পুনরায় ঘোষণা করিয়া দিল। এই নীতির বলেই চর্চ বর্ব্বরসংসর্গে স্বচ্ছন্দভাবে বাস করিতে পারিয়াছিল; সে প্রচার করিল যে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মমতের উপর শাসন শক্তির কোন অধিকার নাই; ব্যবহারিক জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। এ নীতি যে সমাজের পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর হইবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। চর্চের ত ইহাতে সাংসারিক সম্পর্কে উপকার হইলই, তাহাছাড়া ইহাদ্বারা একটা বড় কাজ এই হইল যে একই সমাজে বিভিন্ন শাসনশক্তি কিরূপে পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরস্পরের ন্যায্য অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে ও পরস্পরকে সংযত করিয়া সমাজকে অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারে

তাহা এই নীতিপ্রবর্ত্তনের ফলেই প্রথম দেখা গেল। পরন্তু, সাধারণভাবে সমগ্র চিন্তাজগতের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া ইহা ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। চর্চ বলিল, ধর্ম্মবিশ্বাসপদ্ধতির উপর বাহুশক্তির জোর খাটে না; ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধে চর্চ-কথিত নীতি প্রয়োগ করিতে লাগিল। বাস্তবিক পক্ষে চর্চের স্বাতন্ত্র্যনীতি ও ব্যক্তিবিবেকের স্বাতন্ত্র্যনীতি উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

দুঃখের বিষয় যে স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা অতি সহজেই প্রভুত্বলিপ্সায় পরিণত হয়। চর্চের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। মানবস্বভাবসুলভ দুরাকাঙ্খা ও অহঙ্কারের প্রভাবে চর্চ শুধু ধর্ম্মতন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সে ঐহিক শাসনতন্ত্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু একথা মনে করিবেন না যে মানবচরিত্রসুলভ দৌর্ব্বল্যই ইহার একমাত্র কারণ; ইহার আরও কতকগুলি গভীরতর কারণ আছে, সেগুলি জানা আবশ্যক।

যখন চিন্তাজগতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছে; যখন মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক এমন কোন শক্তির অধীন নহে যে তাহার বিতর্ক মীমাংসার অধিকার অস্বীকার করে, বা তাহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে; যখন সমাজের মধ্যে এমন একটা সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ গঠন-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাসনতন্ত্র নাই যে লোকের মতামত নির্দ্দেশ করিয়া দিবার অধিকার প্রয়োগ করে; তখন ধর্ম্মব্যবস্থা কর্ত্তৃক ঐহিক ব্যবস্থার উপর আধিপত্যস্থাপন সম্ভবপর নহে। জগতের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা এইরূপ। কিন্তু যখন দশম শতাব্দীতে যেমন ছিল সেইরূপ একটা ধর্ম্মশাসনতন্ত্র থাকে, যখন মানুষের চিন্তা ও বিবেক একটা শাসনাধিকার-সম্পন্ন কর্ত্তৃত্বশক্তির বিধিব্যবস্থা দ্বারা আবদ্ধ; তখন এটা স্বাভাবিক যে এই ধর্ম্মশাসনতন্ত্র ক্রমশঃ ঐহিক ব্যাপারেও আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইবে। সে বলিবে—"একি কথা? মানুষের মধ্যে যাহা সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন তাহার উপর আমি অধিকার ও প্রভাব প্রয়োগ করিতেছি, আমি মানুষের চিন্তা, মানুষের আকাঙ্খা, মানুষের বিবেক শাসন করিতেছি, আর মানুষের বাহ্য আচরণ, মানুষের ঐহিক ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না? আমি সত্য ও ন্যায় ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা, অথচ সত্য ও ন্যায় ধর্ম্ম অনুসারে মানুষের সাংসারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে আমার কোন অধিকার নাই?" এই যুক্তির বলে ধর্ম্মশাসনতন্ত্র যে ঐহিক ব্যাপারে অধিকার বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে ইহা ত অবশ্যম্ভাবী। তখন আবার মানবচিন্তার সমস্ত গতি চর্চের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল; তখন ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যাই একমাত্র বিদ্যা ছিল; ধর্ম্মতত্ত্বপদ্ধতিই একমাত্র চিন্তাপদ্ধতি ছিল; অলঙ্কার বলুন, গণিত বলুন, সঙ্গীত বলুন, অন্য সমস্ত বিদ্যাই ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যার অন্তর্গত ছিল। (ক্রমশঃ)

(শ্রীযুক্ত বিনয়কুমারসরকার এম্, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা

বিশেষজ্ঞেরা এই বিষয়ে অনেক কথাই বলেছেন ও লিখেছেন। আমি রাস্তার লোক—সব কথা বুঝিনি। তাই রাস্তার লোকের সন্দেহসংশয়কেই একটু ফুটিয়ে তুলতে চাই।

প্রথমেই গোলযোগ বাধে এই নিয়ে যে হিন্দুমুসলমানের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ কতটা বৃটীশ শাসনের ফল। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই বিদ্বেষ, তার পূর্ব্বে ছিল কি না এবং বৃটীশ শাসনের ব্যাপ্তির সঙ্গে এই বিদ্বেষ বেড়ে উঠছে কিনা।

বিদ্বেষ যে ছিল না একথা ঐতিহাসিকেরা আজ পর্য্যন্ত প্রমাণ করতে পারেন নি এবং যতদিন তা না পারছেন ততদিন এর অস্তিত্ব মেনে নিতে আমরা বাধ্য। বাধ্য এই জন্য যে দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি সৌহৃদ্য থাকত তা হলে বৃটীশ শাসন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছি, সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে মানতে পারা যায় না যে এর দ্বারাই ওই সৌহৃদ্য বাঁধন ছিন্ন হয়েছে। মানতে গেলে বুদ্ধিকে নিয়ে বড় বেশী টানাহেঁচড়া করতে হয়। বৃটীশ শাসনই যে অনিষ্টের মূল কারণ এই যুক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ হয়, যখন এই যুক্তির মতলবটা আমাদের চোখে পড়ে। জাতীয়তার দুর্গ বজায় রাখতে হলে শত্রুর ঘাড়েই দোষ চাপান উচিত নয় কি? হাঁ উচিত এবং কাজ চালানোর পক্ষে দরকারও। কিন্তু সত্যটাকে বুঝে রাখতে দোষ কি? তারপর কথা এই যে যদি বৃটীশশাসনই করে থাকে তা হলে কি কি উপায়ে করেছে। উপায় প্রধানতঃ দুটী (১) রাজনৈতিক ব্যাপারে দুই সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহার ভেদ এবং (২) বিদ্বেষের বীজ ছড়ানোর জন্য খুব বড় রকমের প্রচারসংঘের সৃষ্টি। কিন্তু ব্যবহার ভেদ ত খুব অল্প দিনের। বখরা করে চাকরী দেওয়া এবং কাউনসিলে আলাদা প্রতিনিধির বন্দোবস্ত করা—সে ত বিংশশতাব্দীর ব্যাপার, প্রায় স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক। আর প্রচার সংঘের কোন প্রমাণ পেয়েছি কি? শয়তানকেও তার প্রাপ্য দাও—এই নীতি খুব সমীচীন: বিশেষতঃ সত্যানুসন্ধানের সময়।

যাক্, এসম্বন্ধে কোন চরম সিদ্ধান্তে না হয় নাই আসলাম। না হয় মেনেই নিলাম যে বৃটীশ শাসনকেও অব্যাহতি দেওয়া যায় না। নাই গেল কিন্তু এই খানেই কি শেষ? যদি অন্য কারণ বিদ্যমান থাকে তবে দেখতে হবে কোনটা প্রবলতর, কোনটা মৌলিক। এই দেখার উপরই সমস্ত নির্ভর করছে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে বৃটীশ শাসনের সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বাড়ছে কি না। হাঁ, বাড়ছে বলেই মনে হয়, তবু এই দুটোকে কার্য্যকারণভাবে যুক্ত করে ফেলা অন্যায় হবে—কতকটা কাকতালীয়ের মত। মূল কারণ কি? এই বিদ্বেষের শিকড় কোথায়? এটা বুঝলে তবে এই শিকড় উপড়াতে আমরা সক্ষম হব।

যদি বিশেষজ্ঞদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, আমরা বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবনের দিকে দেখি তা হলে সব চেয়ে চোখে পড়ে, জীবনের ক্ষেত্রে এই দুই সম্প্রদায়ের কোথাও এতটুকুও মিল নেই। কলেজে যাও দেখবে মুসলমান ছাত্রেরা আলাদা বসে জটলা করছে,

তাদের জল খাওয়ার জায়গা পর্য্যন্ত আলাদা। যে কোন হিন্দু ছাত্রকে জিজ্ঞাসা কর, তার মুসলমান বন্ধু কয়জন আছে, কয়জনের বাড়ীতে সে যায় ; কেহই নেই। হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে কখনও কোন অবকাশেই মুসলমান বন্ধুর, মুসলমান অতিথির, মুসলমান নিমন্ত্রিতের সমাগম হয় না। এমন কোন সামাজিক উৎসব বা অবসর নেই যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের একত্র সমাবেশ হতে পারে। হাওড়া ষ্টেশনে যাও দেখবে হিন্দুর চায়ের দোকান আলাদা, মুসলমানের চায়ের দোকান আলাদা। হিন্দুর লেখা প্রবন্ধ পড়, গল্প পড়, উপন্যাস পড়, দেখবে মুসলমান চরিত্র আদৌ নাই ; যেখানে আছে তাও বিদ্রূপমাত্র। হিন্দুকে জিজ্ঞাসা কর, রমজান কি বলতে পারবে না ; শুধু এই রমজান না কি একটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় নিয়ে গোলমাল উপস্থিত হয়, এরই একটা তিক্ত স্মৃতি অনেক হিন্দু ছাত্রের মনে জাগরূক রয়েছে। ক্লাবে যাও, দেখবে হিন্দু ক্লাবে মুসলমান সভ্য আদৌ নাই। যেখানে পাঁচজন হিন্দু একত্র হয়েছে, সেখানে মুসলমান সম্বন্ধে কথা উঠলেই এমন অশ্লীল ভাষা ও ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় যে আমরা আশ্চর্য্য হই না শুধু তা নিতান্ত গা সওয়া হয়ে গেছে বলে। আমি হিন্দুর দিকে একটু ঠেস দিয়ে বলেছি, কেন না নিজে হিন্দু ; কিন্তু মুসলমান সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। অথচ এই বাংলাদেশেই অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। আশ্চর্য্য !

এই কথাগুলো খুব পচা, পুরাণো ও কদাকার, তবু এর মধ্যে একটু ভাববার আছে —এই আমার বিনীত নিবেদন। আমি বিশেষজ্ঞদের কিছু বলছি না। কিন্তু যাঁরা আমার মত রাস্তার লোক, তাঁদের অনুরোধ করছি যে তাঁরা কংগ্রেসের ও ইউনিটি কন্‌ফারেন্সের রিপোর্টের বা প্রাগব্রিটীশ যুগের ইতিহাসের পাতা না উল্টে যদি এই দিকে একটু চোখ দেন তা হ'লে হয়ত একটু আলো দেখতে পাবেন। কেন না এই অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসগুলা খুব সুবৃহৎ সত্যের ইঙ্গিত মাত্র। সেই সত্যটি এই যে হিন্দুর ও মুসলমানের সামাজিক শ্রেণীচেতনার বৃত্ত কোথাও পরস্পরকে ছেদন করে না। এরা সম্পূর্ণ আলাদা হয়েই অবস্থান করছে। এদের প্রকাশ্য লড়াইগুলো শুধু এক অপ্রকাশ্য ও সদাস্থায়ী যুদ্ধ ঘোষণার লক্ষণ মাত্র। হিন্দু মুসলমান সমস্যার এইটেই সব চেয়ে বড় কথা। আমি এইটেকেই আর একটু পরিষ্কার করে তোলবার চেষ্টা করব।

এই শ্রেণীচেতনা ইউরোপে দেখা গিয়েছে, Nationalismএর রূপ ধারণ করে, এবং Nationএর গণ্ডীর ভিতর, Proletariat এবং Bourgeoisieএর অন্তর্ব্বিরোধের মধ্য দিয়ে। সেখানে দেখি প্রত্যেক Nationই তার নিজের নিজের বৃত্তের ভিতর নৈতিক মূল্যগুলি পূর্ণমাত্রায় মেনে চলে, কিন্তু তার বাইরে সেগুলো কাজে লাগাতে চায় না। Germany এ কথা ভেবে দেখে না যে তার cartel চালানোর ফলে ইংলণ্ডের কয়েকটি দরিদ্র মজুর ও তাদের অসহায় স্ত্রীপুত্র অনাহারে কষ্ট পাবে কিনা। এই ভেবে দেখাটা কেউ আশাও করে না। কেন না নেশনের লক্ষ্যই হল অপর নেশনের সহিত টক্কর দিয়ে জেতা ; সুতরাং টক্করের বাজীতে কোনরূপ প্রেমের ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া, আত্মহত্যার পরিচায়ক। Probtariat ও Bourgeoisie মধ্যেও কতকটা এই মরিয়া ভাব এসে দাঁড়িয়েছে ; কিন্তু

গত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে যে, নেশনের সীমারেখার বাইরে, এদের বিরোধ নিভে যায়। তাই যাঁরা আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী, তাঁরা অনেকে আন্তর্জাতিক Bourgeoisieর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক Proletariatকে খাড়া করতে চান, এবং মনে করেন ন্যাশনালিজমকে টিপে মেরে ফেলার এইটেই প্রকৃষ্ট পন্থা। একটু আদর্শবাদী যাঁরা তাঁরা cultureএর ভিতর দিয়ে হৃদয়ের প্রসার বাড়িয়ে ন্যাশনাল চেতনার উগ্রতাকে একটু শীতল করতে চান।

সে যাই হোক্ আমার বক্তব্য এই যে শ্রেণীচেতনা সমূহ-বোধ যখনই বেশ বেড়ে ওঠে তখনই তা মারমুখী হয়ে দাঁড়ায়, কেন না তার স্বভাবই এই, তার ধর্ম্মই এই। অবশ্য এই সমূহ-বোধের তীব্রতার অনেক ধাপ আছে। একটা পরিবারের মধ্যেও বেশ সমূহবোধ দেখা যায়, কিন্তু এই সমূহবোধ সেই পরিবারের সমস্ত জীবনকে আবেষ্টন করে থাকে না। তবু যতদূর তার প্রভাব পৌঁছয়, ততদূর পর্য্যন্ত অন্য পরিবারের মঙ্গল অমঙ্গল হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না। একটা সহরের মধ্যেও এইরূপ বোধ জন্মাতে পারে। কিন্তু যখনই এই শ্রেণীবোধ কোন মানবসমষ্টির সমস্ত জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলে, তখনই অন্যান্য সমষ্টির সহিত সমস্ত নৈতিক সম্পর্ক আল্গা হয়ে পড়ে। প্রশ্ন এই যে হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রে কি ওইরূপ হয়েছে।

হাঁ হয়েছে এবং এই দিক থেকেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমস্ত তথ্যগুলির একমাত্র মীমাংসা হতে পারে, এইটেই আমার স্থির বিশ্বাস। বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ। এই অঙ্কের মর্য্যাদা রাখার জন্য মুসলমানেরা সরকারী চাকরীর শতকরা পঞ্চান্ন-ভাগের কড়ায় গণ্ডায় হিসাব চায়। কেন চায়? বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে অব্রাহ্মণ ও অকায়স্থের সংখ্যা খুব সম্ভব আশীভাগ। কই তারা ত শতকরা আশীভাগ চাকরীর হিসাব চায় না। যদি সমস্ত বাংলাদেশকে একটা সমষ্টি মনে করে কাজ চালাতে হয়, তবে চাকরীর বিতরণ নির্ণীত হবে কতকটা যোগ্যতার দ্বারা এবং কতকটা আকস্মিকতার দ্বারা। যদি তাও না হয়, যদি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বখরা করেই দিতে হয় তবে দিতে হবে—সরকারী চাকরীই যাদের একমাত্র আশ্রয় তাদের সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যেই বা কত এবং মুসলমানের মধ্যেই বা কত—এই অনুপাতে। এই হল প্রকৃত মাপকাঠি। এর স্বপক্ষে আমি কিছুই বলতে চাই নে। চাকরী দাও, পঞ্চান্নভাগ কেন পচানব্বই ভাগ দাও; যদি এতেই বিদ্বেষ মেটে তবে সমস্ত দাও, তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু দাবীর পিছনে এই উগ্রতা কেন? এই কড়ায় গণ্ডায় হিসাব চাওয়া কেন? এটা কি লক্ষ্য করবার জিনিস নয়? এটা লক্ষ্য করি বলেই প্যাক্টচুক্তির স্বপক্ষে খুব চোখা চোখা যুক্তিগুলিও আমার কাছে অত্যন্ত ভোঁতা ঠেকে। কেন না বেশ দেখতে পাই রক্তচক্ষুই এখানে দুই পক্ষেরই প্রধান যুক্তি। অন্য যা কিছু তা এই রক্তচক্ষুকেই একটু ভদ্রতার আবরণ দেওয়ার জন্য।

কাউনসিলে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারেও ঐ একই কথা খাটে। একজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা কর, তার কি কি স্বার্থ রক্ষার জন্য সে আলাদা প্রতিনিধি চায়; হয়ত একটা ফর্দ্দ দেবে, কিন্তু তাতে কিছুই পরিষ্কার বোঝা যাবে না। উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থা ত একই; যা কিছু প্রভেদ তা ধর্ম্ম নিয়ে। কিন্তু ধর্ম্ম ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে আইন-পরিষদের বাইরে। তা হলে কি হয়। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ, দেখবে বাঁকা

রয়েছে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার ছাপ না, হিন্দুর হাতে আমাদের স্বার্থ—তা সে যাই হোক্ না কেন—কখনই নিরাপদ নয়। তার মুখে দেখবে নিজের অধিকার বজায় রাখার একটা সূক্ষ্ম জিদ। এতেই ওই ফন্দিটা বেশ জলের মত বোঝা যাবে। জিদ! হিসাব! আত্মপ্রতিষ্ঠা! তবে আর প্রশ্ন করে লাভ কি?

এখন গরুতে এসে পৌছান যাক্। এই নিরীহ জীবটি যে কোটি কোটি লোককে এমন করে ক্ষেপিয়ে তোলে এতে হাসবার বিষয় অনেক আছে। কিন্তু হাসি আসে না, কেননা মাথার উপর একটু দরদ আছে; থাকা খুবই স্বাভাবিক। গরুর উপর হিন্দুদের এই অশ্লীল অনুরাগের কারণ কি? উত্তর, মহাত্মাজী পর্য্যন্ত বলেছেন, গরু ও হিন্দুধর্ম্ম একই জিনিষের বিভিন্ন নাম মাত্র—"Hinduism is nothing if not cow-protection." এরূপ দুর্ভেদ্য জায়গায় আশ্রয় নিলে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। এটাকে ক্ষমা করা যেত যদি বুঝতাম এটা শুধুই ভুল, শুধু অযৌক্তিকতারই একটা নিদর্শন মাত্র, কিন্তু তা নয়। রক্তপতাকা উড়িয়ে গোরক্ষিণী সভার সভ্যরা যখন গান করতে করতে যায়, তখন তারা যে শুধু ভুল করে তা নয়, তারা একটা জেদের পরিচয় দেয়, মুসলমানের গো-হিংসার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই আমরা গরুরই চার পা ধরে তাকে আকাশের উপর তুলে ধরব। মুসলমানও ছেড়ে কথা কয় না, সেও হিন্দুদের ভুল ভাঙবার জন্য কৃতসংকল্প। জেদের বিরুদ্ধে জেদ! শ্রেণীচেতনা! সমূহবোধ! তবু একতরফ থেকে ছেলেদের জন্য দুধ জোগাড় করার এবং অন্যতরফ থেকে গরীবের জন্য সস্তায় খাদ্য সংস্থান করার অনন্ত তর্ক! অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

ব্যাপার এই, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। দুজনে দেখা হলেই একজনের অন্তরাত্মা বলে "কাফের", আর একজনের অন্তরাত্মা বলে "নেড়ে কোথাকার!" তারপর যুক্তিবিচার আরম্ভ হয়। এইখানেই সমস্ত গোল। ইউরোপে যেমন জর্ম্মাণি ও ফ্রান্স, এখানেও তেমনই হিন্দু ও মুসলমান। অন্ততঃ পঞ্জাবে তাই। বাংলা দেশেও তার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কারুর মুখের দিকে তাকায় না। উভয়পক্ষই নিজের জেদ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। prestigeএর জন্য তারা সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাই ছোটখাট খোঁচাখুঁচি অবিরাম চলেছে—জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই; শুধু মাঝে মাঝে একটা বড় রকমের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তখন তাড়াতাড়ি আমরা সভাসমিতির আয়োজন করি।

আমি একটু রঙ ফলিয়ে বলেছি একথা জানি, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সত্যকে, কোনমতে অস্বীকার করা চলে না। আমি স্থিরনিশ্চিত যে হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষের মূলে কোন নির্দ্দিষ্ট কারণ নেই। এদের grievances অভিযোগগুলো নিতান্ত বাজে জিনিষ—অবিমিশ্র ছলনা। এই অভিযোগ মেটানের চেষ্টা করে যদি বিদ্বেষ দূর হবে বলে বিশ্বাস করি—যা আমরা করে আসছি—তা হলে ঠকতে হবে, ভয়ঙ্কর ঠকতে হবে, আর ঠকছিও। শোনা গেছে যে ইউনিটি কনফারেন্সে একজন হিন্দু প্রতিনিধি চিৎকার করে উঠেছিলেন "Lay your cards on the table." এতে কয়েকটি মুসলমান

প্রতিনিধি ভয়ঙ্কর চটে গিয়েছিলেন। চটবার কথা; বাস্তবিকই। There are absolutely no cards to lay out, on either side! এই ত এই খেলাটার মজা! তা না হলে আর জমবে কেন।

কথা এই যে এই দুই সম্প্রদায় সামাজিক লুটপাটের চুলচেরা বখরা চায়। তাদের হৃদয় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তাই সদাই ক্ষোভ, সদাই সংশয়, সদাই আশঙ্কা। তাইত, আমি যদি একটু জমি ছেড়ে দিই তা হলে ও হয়ত তৎক্ষণাৎ দখল করবে। এইখানেই গোলযোগ। এই Nervousnessকে দূর করতে হবে। দূর করার জন্য আমার কতকগুলা অদ্ভুত অদ্ভুত প্ল্যান আছে। এই প্ল্যানগুলির একটু ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করব।

সমূহবোধ জিনিসটার একটা দাম আছে। জীবনসংঘর্ষে যারাই দল বাঁধতে পারবে তারাই জিতবে—এটা সহজ সত্য। কিন্তু এই দল বাঁধা প্রয়োজনমূলক হওয়া চাই। অর্থাৎ জীবনের সত্যকাবের দ্বন্দ্ব যেগুলি, সেইগুলিই হবে দল বাঁধবাব রশি। যদি তা না হয়, তবে দল বাঁধলেও তা কাজে আসবে না। ন্যাশনালিজমের সার্থকতা এই যে তা আমাদের কাজে আসে। রাষ্ট্র হল যৌথভাবে কাজ করবার সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র। সুতরাং কোন এক মানবসমষ্টি যদি ঐক্যভাবের বলে একটা রাষ্ট্রের সৃষ্টি করতে পারে, ত সংসারে তারা জয়ী হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু এই ঐক্যভাব সৃষ্টি হয় কিসে? ইতিহাসের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, জয়পরাজয়ের স্মৃতির ঐক্য এইগুলির দ্বারা। এর মধ্যে Volitional factor—ইচ্ছাগত কারণ খুবই কম। ন্যাশনালিজমের আইডিয়াল হল, একই আইন, একই প্রথা, একই আকারের অধীনস্থ থাকা; যাদের সঙ্গে হৃদয়ের বাঁধন গজিয়ে উঠেছে, সমস্ত সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে তাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকা। কিন্তু প্রয়োজনের দিক দিয়ে ন্যাশনালিজমের বাঁধনই যে চূড়ান্ত একথা মানা যায় না। ধরা যাক্ ধনবিভাগ। এই দিক থেকে, এক নেশ্যনের শ্রমিকের সহিত অপর নেশ্যনের শ্রমিকের যে স্বার্থৈক্য, সেই নেশ্যনেরই ধনীব সঙ্গে ততটা নয়। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সমূহবোধ গড়ে ওঠে নি। তাতে বাধা দেয় যে সমস্ত social emotion—সামাজিক আবেগ আমরা পরম্পরাসূত্রে পেয়েছি, সেইগুলি। এই আবেগগুলি বুদ্ধির খাতির রাখে না; স্বার্থৈক্য না থাকলেও ইংরাজ ধনী ও ইংরাজ শ্রমিকের মধ্যে দেখা হলেই "Hallo man! আপনি এসে পড়ে। কিন্তু নবযুগের শিক্ষা এই যে স্বার্থৈক্য ও প্রয়োজনৈক্যের বিচার করে আমরা চেষ্টার দ্বারা একটা নূতন সামাজিক আবেগের সৃষ্টি করতে পারি। এইরূপে একটা নূতন সমূহবোধ গড়ে উঠ্‌তে পারে।

একটা নূতন সামাজিক আবেগের সৃষ্টি করে একটা নূতন শ্রেণীচেতনা গড়তে পারি—এ একটা যুগান্তকারী শিক্ষা। এই ভারতবর্ষে দেখি একটা Fideral রাষ্ট্রের মালমশলা বেশ মজুত রয়েছে। বাঙ্গালী হিন্দুদের পরস্পরের প্রতি টান, তাদের সহিত পঞ্জাবী হিন্দুর টানের চেয়ে বলবত্তর। আবার বাঙ্গালী হিন্দুর ও পঞ্জাবী হিন্দুর যে কালচারের ঐক্য রয়েছে সেটা অভারতীয়ের সহিত কারবারে তাদের হৃদয়কে মিলিয়ে রাখে। এই পর্য্যন্ত বেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে প্রাদেশিকতাবোধ খুবই কম। সমস্ত

মুসলমানই নিজেদের এক ভাবে। আবার তারা অভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় হিন্দুদের চেয়ে বেশী আপনার ভাবে। সুতরাং প্রশ্ন হল দুটি (১) কি করে সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা সমূহবোধ আনা যায় এবং (২) কি করে প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আর একটা সমূহবোধ আনা যায়। এই হল অঙ্ক। গরু কাটা, চাকরী দেওয়া এগুলো আনুসঙ্গিক ব্যাপার। এখন এর সমাধান কি ?

মুসলমান যে মুসলমানকে আপনার ভাবে, তাহার প্রধান কারণ উভয়ের আচার ব্যবহার একই। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও তাই। এই আচরণ-নিষ্ঠার আইডিয়ালকে উভয় সম্প্রদায়ই খুব বড় করে দেখেছে এবং সেইজন্য আচরণ-বৈষম্যের প্রতি উভয়ের মনেই একটা নির্ব্বিচার ঘৃণা জন্মায়। ভাষার প্রভেদ নাই বললেও চলে, পঞ্জাবে ও বাংলায় ভাষা একই। সম্প্রদায় হিসাবে যা কিছু বৈষম্য তা একমাত্র আচার ব্যবহার নিয়েই।

কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিতগণের intellectualsদের মধ্যে বিরোধ আর একটু গভীরতর। ইতিহাস চর্চ্চা করার ফলে হিন্দু কালচার ও মুসলমান কালচারের প্রভেদ এঁদের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে এবং বিভিন্ন কালচারের উপাসনা করে, এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা খুব জমাট হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চতর আবেগের প্রভাব থাকে বলে তাঁদের বিরোধ আরও তীব্র হয়ে পড়ে। হিন্দুরা পৌত্তলিক বলে নিরক্ষর ও সাধারণ মুসলমানের মনে কোন ঘৃণা আসে না, কিন্তু শিক্ষিতগণের অনেকেরই মনে আসে।

আমি ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রভেদ না বলে, আচরণ বৈষম্যই বলেছি। কেননা শুধু বিশ্বাস জিনিষটা চোখে ঠেকে না; ঠেকে ঐ বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্যগুলি। ঐগুলিকেই আমি আচার নাম দিয়েছি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে হিন্দুমুসলমান সমস্যার পিছনে রয়েছে :—

প্রথমতঃ—হিন্দুরা পৌত্তলিক। যারা গোঁড়া মুসলমান তারা পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করে।

দ্বিতীয়তঃ—ধর্ম্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করে, যে সমস্ত আচার ব্যবহার রয়েছে সেগুলি হিন্দুদের মধ্যে আলাদা মুসলমানদের মধ্যে আলাদা, এবং সেগুলি উভয় সম্প্রদায়ই খুব নিষ্ঠার সহিত পালন করে।

তৃতীয়তঃ—জীবনের যে সমস্ত কাজে হৃদয়ের টান আছে সেখানে হিন্দু ও মুসলমান একত্র মেলার একটুও অবকাশ পায় না। সেইজন্য পরস্পরকে অপরিচিত ঠেকে এবং পরস্পরের মতলবের ও গতিবিধির প্রতি একটা অস্পষ্ট সন্দেহ ও আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

চতুর্থতঃ—শিক্ষাবিস্তারের ফলে শিক্ষিতগণ কালচারের বিশেষত্ব ও বিভিন্নতাগুলি খুব তীব্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। সম্প্রদায়ের সমস্ত যৌথ কার্য্যের এঁরাই হলেন প্রতিনিধি। শ্রেণীচেতনাকে এঁরাই নানাভাবে প্রস্ফুট করে তোলেন এবং suggestionএর দ্বারা অশিক্ষিতগণের মধ্যেও ছড়িয়ে দেন। বৃটীশ শাসন যে হিন্দুমুসলমানে বিদ্বেষ এনেছে তা এই দিক দিয়েই।

পঞ্চমতঃ—হিন্দুরা, দুর্ব্বল ও নির্ব্বিরোধ বলেই মুসলমানদের মনে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে যে তাদের সমস্ত দাবী তারা সহজেই কাজে পরিণত করতে পারবে।

এইবার আমার Utopiaগুলি কি তার আভাস দিচ্ছি।

(১) আচারনিষ্ঠতার ideal কে দূর করবার জন্য একটা নূতন idealএর প্রচার করা। আমি একটা economic idealএর সন্ধান দিচ্ছি। হিন্দু শ্রমিক ও কৃষকদের এবং মুসলমান শ্রমিকও কৃষকদের একত্র করে উভয় সম্প্রদায়েরই ধনীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে, একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করা যেতে পারে। এতে নূতন সমূহবোধ উদয় হয়ে সাম্প্রদায়িক সমূহবোধকে ক্ষুণ্ণ করে ফেলবে।

(২) ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান যে অবস্থাবিশেষের ও আকস্মিকতার ফল, এদের দাম ততটুকুই, যতটুকু এরা আমাদের সত্যিকারের দরকার আসে—এইরকম একটা pragmatic philosophyও প্রচার করা। কোরাণ শরিয়ৎ ও স্মৃতিশাস্ত্রের আদেশগুলো তখন আর তেমন অলঙ্ঘনীয় মনে হবে না।

(৩) ধর্ম্ম নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে—Hindu first, Bengali next, Mahammadan first, Indian next—এদের বিরুদ্ধে একটা Campaign of ridicule সৃষ্টি করা যেতে পারে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করাই যে indecent এরকম একটা idea ছড়াতে পারলে অনেক উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

(৪) হিন্দু ও মুসলমানদের ভালবাসার বাড়াবাড়িকে খুব militant ভাবে কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে এবং গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রচার করা।

(৫) আমার সব চেয়ে Practical plan হল—হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিতদের নিয়ে একটা সমিতি স্থাপন করা। এই সমিতির উদ্দেশ্য হবে, বাঙ্গলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা সমূহবোধের সৃষ্টিকরা। সভ্যদের কাজ হবে, বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমান শুধু বাঙ্গালী বলেই অন্যান্য দেশের ও প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান থেকে কিসে কিসে বিভিন্ন তা ফুটিয়ে তোলা এবং খুব ভাবের রঙ ফলিয়ে তা প্রচার করা। স্বার্থের ঐক্যে আমরা কতদূর আবদ্ধ তা শুধু পুনরুক্তির জোরে লোকদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং ক্রমে তা থেকে হৃদয়ের ঐক্যও জন্মাতে পারে। সমিতির সব চেয়ে বড় কাজ হবে, শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান যুবকদের মধ্যে এমন একটা mentality ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে তারা সমস্ত জিনিষই সমগ্র বাংলার দিক থেকেই দেখে। Intellectualদের দলে টানতে পারলেই massও দলে আসবে। আমি intelletualদের Convert করে কার্য্য সিদ্ধি করার সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। আমার স্বপক্ষে Maxim Gorkyর নজির দেখাতে পারি। তারপর একটা কাগজও বের করা যেতে পারে; এই কাগজে young Turkey যারা খিলাফৎ দূর করে দিয়েছে তাদের আদর্শ ও কাজ নিয়ে আলোচনা করা হবে; পৌত্তলিকতা ও গবানুরাগের বিরুদ্ধেও একটু আধটু লড়াই করা চলতে পারে। প্রথমে দরকার এমন কয়েকটি যুবক যাঁরা বাঙ্গলা দেশকে একটা unit করে পৃথিবীর ধূলামাটির লড়াইয়ে জিতবার idealএ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

আসল কথা মাড়োয়ারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেই হোক্ বা ইংরাজকে গালাগাল দিয়েই হোক্ বা নেশ্যালিজম প্রচার করেই হোক্ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা common social emotion তৈরী করা। আর একটা বিরুদ্ধ emotionএর সাহায্য না নিলে বর্ত্তমান আচার নিষ্ঠার emotionকে দমন করতে পারব না। যুক্তির জের এই emotion এর উপরই আমি বেশী জোর দিতে চাই। এইরূপ একটা emotion এর সাহায্যে যেদিন পরস্পরের সম্বন্ধে আর কোন nervousness থাকবে না সেই দিনই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রকৃত দূর হবে।

আর যদি কোন উপায়েই হৃদয়ের ঐক্য আনা অসম্ভব হয়, যদি অপর সম্প্রদায়ের কাউকে দেখলেই মনের আপনা হতেই সঙ্কুচিত হওয়ার ভাব না কাটে তবে শ্রেষ্ঠ পন্থা হল হিন্দুদের সবল করে তোলা।—সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভিতর, একটা বড় রকমের লড়াই হয়ে যাওয়ার পর অনেক সময় খুব বন্ধুত্ব জন্মায়। কিন্তু শত্রুদের একজন যদি দুর্ব্বল বলে যুদ্ধবিমুখ হয় তবে প্রকাশ পায় শুধু মানঅভিমান ও নিস্ফল গর্জ্জন, শান্তির ভাণ ও গোপন ঘৃণা, প্যাক্ট চুক্তি ও ইউনিটি কন্‌ফারেন্স। অন্ততঃ এই অবস্থাটার প্রতিকার করা দরকার। নয় কি?

শ্রী—

স্বামী রামতীর্থ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী রামতীর্থের জীবনের এই যে সর্ব্বব্রহ্মময়তার উপলব্ধি, আপনাকে দেহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে ছড়াইয়া দেওয়ার এই যে ভাব ইহা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত: সুতরাং জ্ঞানেই তাঁহার জীবন পরম পরিণতিলাভ করিয়াছিল একথাও যেমন বলা চলে তেমনি সেই সঙ্গে এই কথা বলিতে হয়—এ জ্ঞান সেই জ্ঞান যাহা লাভ করিলে মানুষ প্রেমিক হয় 'দিবানা' হয়; সেই পরমজ্ঞান লাভ করিয়া স্বামী রামতীর্থ "মস্ত্", প্রেমিক, 'দিবানা' হইয়াছিলেন।

তাই তাঁহার জ্ঞান ও শিশুর সারল্যে উদ্ভাসিত, হাস্যমুখর, তাঁহার বক্তৃতা পাণ্ডিত্যের পরিচয়প্রদর্শনক্ষেত্র নহে, সহজ সরল উপলব্ধির প্রাণবান্, অনাড়ম্বর সরস প্রকাশ মাত্র।

তাঁহার জীবনের মূলকথাটী তিনিও এই ভাবে বলিয়া গিয়াছেন; "At-one-ness with the universe" বিশ্বের সহিত অভেদাত্ম হওয়াই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিলে সকল দ্বন্দ্ব, ভাবনা দূর হইয়া যায়; সকল বৈষম্যের সকল দুঃখের ক্ষয় হইয়া মন পরমপ্রসাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকের রামতীর্থের রচনাবলীর সহিত

পরিচয় হইবার পূর্ব্বে তাঁহার একটী ছবি তাহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। মনের পট হইতে সেই ছবির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছায়া মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও মনে পড়ে সেই দীর্ঘদিন পূর্ব্বে ছবিতে যে প্রসন্ন সৌম্য মুখটী দেখিয়াছিলাম; আজও তাঁহার কোন ছবি হাতে আসিলে সেই প্রসন্ন হাস্যমণ্ডিত মুখশ্রীর কথাই মনে জাগে। এই প্রসাদই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়রূপে সেদিন আমার কাছে প্রতিভাত হইয়াছিল, আজও হয়।

মিঃ সি এফ অ্যান্ড্রুজ In woods of God realisation নামক রামতীর্থের রচনাবলী সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্যত্রয়ের মধ্যে এই প্রসাদগুণের উল্লেখ করিয়াছেন। Overflowing charity kindliness of Spirit ও abounding joy মিঃ অ্যান্ড্রুজের মতে তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। এগুলি সেই প্রসাদগুণের রূপান্তর মাত্র।

রামতীর্থের জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব তাঁহার সাংসারিক নির্লিপ্ততা, অবৈষয়িকতা; সংসার তাহার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার বিরাট মনকে কোন দিনই ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। এই ত্যাগের ভাব, তাঁহার জীবনের প্রতিদিনের প্রতিকর্ম্মের ইতিহাসে, রচনাবলীর প্রতিছত্রে, বক্তৃতার প্রতি কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল; এই ত্যাগের বাণী তিনি সারাজীবন প্রচার করিয়াছিলেন। "ত্যাগকর এই মিথ্যা অভিমান, এই ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, এই হীন প্রেম; পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ কর, নিজের জন্য কিছুই রাখিও না।" দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ খৃষ্ট যে ভাবে এই ত্যাগের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, আকাশের স্বচ্ছন্দচারী বিহঙ্গকে দেখাইয়া বনের স্বতঃবিকশিত পুলক দেখাইয়া, তেমনি ভাবে রামতীর্থ এই ত্যাগের কথা বলিয়াছিলেন। "How all desires can be fulfilled" নামক বক্তৃতায় তাঁহার এই কথাটী বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন "যাহা চাও তাহা যে পাও না এই অভিমানে ত্যাগ করিও না, সকল বাসনাকে জীবন হইতে নির্ব্বাসন দাও, যদি দিতে পার দেখিবে তোমার জীবন সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।" ইহাই ছিল তাঁহার বাণী।

তাঁহার এই নির্লিপ্ততা দেখিয়া আমেরিকার জনৈক বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন "যাহার মন সর্ব্বদাই এই দেহ হইতে এত উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত তাহার আত্মার এই দেহের সহিত যোগ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না।"

রামতীর্থের এই ত্যাগের বাণীর মধ্যে কর্ম্মত্যাগের কোন কথা নাই; এই ত্যাগের কথা মন সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; মন যেন নির্লিপ্ত থাকে; সে যেন কর্ম্মের বন্ধনে নিজেকে ধরা না দেয়। কাজ করিতেই হইবে। নিজের দেশের সমাজের জগতের প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে সেগুলিকে করিতে হইবে, শুধু করিলেই চলিবে না ভাল করিয়াই করিতে হইবে; এই কর্ত্তব্যগুলিকে সুচারুরূপে করিতে হইলে গীতায় যাহাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলা হইয়াছে তাহাই হইতে হইবে। 'স্থিতপ্রজ্ঞ' না হইলে একর্ম্মগুলি ঠিক করিয়া যে করা যায় না তাহা কর্ম্মবীরগণের জীবন আলোচনা করিলেই দেখা যায়।

দার্শনিক পরিভাষায় এই যে সমুচ্চয়বাদ ইহা ভারতের অতি প্রাচীন শিক্ষা ; বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্ভব, এই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির একটী সুন্দর সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায়।

সুতরাং রামতীর্থকে জ্ঞানী বা ভক্ত মনে করিয়া কর্ম্মত্যাগের উপদেষ্টা বলিয়া যেন আমরা ভুল না করি। বরং তিনি বারবার কর্ম্মকুশলতা শিক্ষার জন্য বলিয়াছেন। য়ুরোপ ও আমেরিকার উদাহরণ দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন এই যে ইহাদের সফলতা, কুশলতা, বিজয়লাভ ইহাই আমাদের অনুকরণীয় ; ইহারা আমাদের চেয়ে ধার্ম্মিক বলিয়াই ইহাদের এই জয়লাভ।

বেদান্তের উপদেশগুলি তাহাদের জীবনে ব্যাপকতর ভাবে কাজ করিতেছে। Practical Vedantaই, (কার্য্যকরী বেদান্ত) তাঁহার মতে প্রতীচ্যশ্রেষ্ঠতার মূল কারণ। তাহাদের কাছে এই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে ; গ্রহণ করিয়া বড় হইতে হইবে, শক্তিলাভ করিতে হইবে। এ জগৎ মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। জগৎ মায়া নহে, মায়া হইতেছে আসক্তি, কামনা, যাহা আমাদের জীবনের জয়যাত্রায় পদে পদে প্রতিহত করিতেছে। ভারতবর্ষ বেদান্তের এই ভ্রান্ত ব্যাখায় লুব্ধ হইয়াই জগতে এত হীন নিবীর্য্য হইয়াছে ; ইহার সে অবস্থা দূর করিতে হইবে। বিশ্বেশ্বর আমাদের যে শক্তি দিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে ; কোনটা রাজসিক বলিয়া ত্যাগ করিলে চলিবে না। একটী চমৎকার উদাহরণ দিয়া তিনি ভারতের এই বর্ত্তমান অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাল একটী বাগান রচনা করিতে হইলে একান্ত কুদৃশ্য, অনুপযোগী কাঁটা দিয়াই চারিপাশ ঘিরিয়া দিতে হয় নতুবা সব নষ্ট হইয়া যায়। তেমনি ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতা নিশ্চিন্তভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজসিক শক্তিগুলির যে চর্চ্চার প্রয়োজন-তাহা করি নাই বলিয়াই আমাদের আজ এই দুরবস্থা, আমাদের সভ্যতা নষ্টপ্রায়। সুতরাং বর্ত্তমান প্রতীচ্যের সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিলে চলিবে না, তাহার যাহা ভাল তাহাকে আনিয়া আমাদের প্রাচীন নষ্টগৌরব আধ্যাত্মিক সভ্যতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবীনভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে কর্ম্মবীর হইতে হইবে, শক্তির সাধনা করিতে হইবে।

ব্যবহারিক জ্ঞানের এই অভাব দূর করিতে রামতীর্থ বারবার বলিয়াছেন। এইখানে তাঁহার জীবনের আর দুইটী সত্য উপলব্ধির পরিচয় আমরা পাই ; একটী তাঁহার নির্ভীক পবিত্র স্বদেশপ্রেম, অপরটী তাঁহার প্রতিচ্য শক্তিবাদ কর্ম্মবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। এইখানে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত স্বামী রামতীর্থের অনেকখানি ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ বহুস্থলে এই শক্তির সাধনার কথা বলিয়াছেন ; ইহাই যে ভারতের একান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি বলিয়া গিয়াছেন ; প্রতীচ্যের সভ্যতার এই মূল তথ্যট আমাদের জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা আমাদের সভ্যতা নষ্ট হইবে, আমরা মরিব।

প্রাচীন কালে আধ্যাত্মিক সভ্যতার প্রতি অনুরাগে ও বর্ত্তমান ভারতের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে প্রজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে স্বদেশপ্রেম অন্তরে জাগ্রত হয়, উভয়ের চরিত্রে

সেই স্বদেশ প্রেমের পরিচয় আমরা পাই। ইহার মধ্যে হিংসা নাই, উগ্রতা নাই—ইহা প্রতীচ্যের জাতীয়তা বাদ, Aggresive Nationalism নহে। ভারতবর্ষের সভ্যতার জগতের প্রয়োজন আছে; ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রাণবান করিয়া রাখিতে হইবে সুতরাং ভারতবর্ষকে বাঁচিতে হইবে। ভারতবর্ষকে বাঁচিতে হইলে তাহার সকল অভাব, বাধা দূর করিতে হইবে; সুতরাং তাহাকে স্বাধীন, স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে; জগতকে কিছু দিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমে স্বরাট্ হইতে হইবে, স্বরাজ্য লাভ করিতে হইবে।

রামতীর্থ ও বিবেকানন্দের এই নিষ্কলুষ স্বদেশ প্রেম বর্ত্তমান ভারতে মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশ প্রেমেরই অনুরূপ।

রামতীর্থের কর্ম্মবাদের উল্লেখ পূর্ব্বে কিছু করা হইয়াছে; এই স্বদেশপ্রেম তাঁহার মনে যে কর্ম্মবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় এইখানে দেওয়া দরকার।

ভারতের দৈন্যের মোটামুটী কয়েকটা কারণ তিনি এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার ও ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব সমাজের অস্পৃশ্যতাদোষ ও কলুষিত বিবাহ বিধি। রামতীর্থ বর্ত্তমান ধরণের সংস্কারক ছিলেন না; তিনি একান্তই ভারতীয় ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন সুতরাং এই দৈন্যগুলি দূর করিবার যে পথ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহার রক্ষণশীল ক্রমোন্নতির পথ; কোন সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা এগুলি দূর করিবার কথা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। অভাব, আর্থিক দারিদ্র্য ও কলুষিত বিবাহ বিধির প্রতিকার কল্পে তিনি স্ত্রীশিক্ষা, জনসাধারণের শিক্ষা, বাল্যবিবাহ নিবারণ, অর্থকরী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন। দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাদের উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে, দেশের নারীদের জাগাইতে হইবে, অকালে বিবাহ দিয়া এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশের সন্তানসন্ততির বৃদ্ধি করিয়া দেশকে ভারাক্রান্ত করিলে চলিবে না। এই অন্যায়গুলি দূর করিতে পারিলেই তবে দেশ জাগিবে।

ধর্ম্মান্ধতা ও অস্পৃশ্যতাবোধ দেশকে অবনতির কোন সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছে, দেশকে কতখানি স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের প্রতি অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে তাহার উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, সু-উত্তরে জনৈক বৈষ্ণব দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবের জন্য প্রাণ দিতে পারিবে অথচ স্বগ্রামস্থ কোন শাক্তের বা পতিতের সেবা করিবে না। আমেরিকার উদাহরণ দিয়া তিনি বলিয়াছেন সেখানেও ত বহু ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন পন্থী লোক রহিয়াছেন, কৈ তাহারা ত' দেশসেবায় এই মতবিরোধ ও পার্থক্যকে বাধা হইতে দেয় না। রামতীর্থ বলিতেন এই অখণ্ড স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিতে হইবে যাহার টানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দুমুসলমান এক হইবে।

রামতীর্থ এই কর্ম্মবাদের প্রচার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবনে তিনি কোন কিছু গড়িয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিবন্ধাবলীর মধ্যেই বদ্ধ হইয়া আছে, বাহ্যজগতে তাহার কোন প্রকাশ হয় নাই।

হয়ত আরো কিছুদিন বাঁচিলে তিনি এসকল বিষয়ে কিছু করিয়া যাইতে পারিতেন;

সে সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। তবুও মনে হয় জগতে সকলেই কর্ম্মী হইয়া আসে না; কেহ আসে জ্ঞান দিতে, কেহ আসে নব নব আদর্শের সঙ্গীতে দেশকে জাগাইয়া তুলিতে, কেহ বা আসে প্রেমে দেশকে এক করিয়া দিতে। শ্রীচৈতন্য যে কর্ম্মবীর ছিলেন না বা কবির খৃষ্ট প্রভৃতি যে বিরাট একটা কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারেন নাই তাহার জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই। সকলেই নেপোলিয়ান, শঙ্করাচার্য্য বা বুদ্ধের মত বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া যায় নাই।

রামতীর্থ ছিলেন বিশেষ করিয়া কবি; যে হিসাবে খৃষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ছিলেন কবি; তাঁহারা ঋষি, দ্রষ্টা, swinburneএর ভাষায়, seers, trumpeteers; রামতীর্থ নব আদর্শ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই বাণী প্রচার করিয়াছিলেন; তাঁহার সে আদর্শকে মূর্ত্ত্য করিয়া তুলিবার ভার আমাদের উপর, আমরা যাহারা তাঁহার সে বাণী সে সঙ্গীত শুনিয়াছি। যদিও তিনি নিজে তাহাকে মূর্ত্ত্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ত কিছুই নাই।

রামতীর্থ কর্ম্মবীর ছিলেন না কবি ছিলেন; এইখানেই বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সব চেয়ে বড় পার্থক্য। উভয়েই ছিলেন পরমজ্ঞানী, কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন কর্ম্মবীর, রামতীর্থ ছিলেন প্রেমিক কবি। যে আদর্শ ভবিষ্যতের গর্ভের ভারতের নবীন জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইবার অপেক্ষায় ছিল তাঁহারা উভয়েই তাহার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; উভয়েই তাহার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন; বিবেকানন্দ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়া তাহা পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু রামতীর্থ কোন সম্প্রদায় গড়েন নাই বা গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ যখন তাঁহাকে একটী বিশেষ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া তৎলব্ধ এই নবীন জ্ঞান ও আদর্শ প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"হিন্দু, মুসলমান, ইশাই খৃষ্টান সকলই ত' আমার সম্প্রদায়; আমার কাজ সকলকেই সেবা করা, সকল সম্প্রদায়েরই মধ্যে আমার এই আদর্শ ফুটাইয়া তোলা; এখনি ত অনেক সম্প্রদায় আছে, নূতন একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া কি লাভ হইবে?" "স্বদেশের সুবৃহত্তর অস্তিত্বের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ, অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতে হইবে।"

স্বামী রামতীর্থের এই বিরাট প্রসন্ন অসাম্প্রদায়িক স্বদেশপ্রেম, তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ, তাঁহার পরম জ্ঞান ও প্রেম, আজ ভারতবর্ষের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার জীবনের বাণী আমাদের জীবনে মূর্ত্তিমান প্রাণবান্ হইয়া উঠুক্, তবেই তাঁহার জীবন সার্থক হইবে।

তীর্থসেবক।

———

হীরকের সৃষ্টিতত্ত্ব।

স্বচ্ছতায়, বর্ণোজ্জ্বল্যে, আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিবার ক্ষমতাবশতঃ, কাঠিন্যে এবং দুষ্প্রাপ্যতা হেতু অতি প্রাচীনকাল হইতেই হীরক জিনিষটি রত্নরাজ্যে সমুচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে, সম্রান্ত ও সৌখীন সমাজে চিরকালই ইহার বিশেষ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট ও নৃপতিগণের শিরোভূষণরূপে ইহা প্রায়ই বিরাজ করিয়া থাকে। অতিমূল্যবান রত্ন বলিয়া ইহার খনির অধিকার লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহের কথাও শুনা যায়, অনেকের ধারণা দক্ষিণ আফ্রিকার বিগত বুয়র যুদ্ধেরও মূলকারণ এই হীরক খনির অধিকার। ইহা ছাড়া আমাদের বাঙ্গলা দেশের অনেক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকগণও ইহাকে একটি মারাত্মক বিষের মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাদের গল্পের নায়িকার আত্মহত্যার অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা যে একটি বিষ এইরূপ ধারণা এখনও বিরল নহে। কোন বিশেষ বিশেষ হীরকখণ্ডের নাম তাহাদের বিচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনীর জন্য জগতে সুপরিচিত। ভারতবর্ষের কোহিনুরের নাম ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং হীরকের ইতিহাস অত্যন্ত রহস্যবিজড়িত। ইহার স্বরূপ, উৎপত্তি ও সৃষ্টি আরো রহস্যাত্মক। অনেকেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ইহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ ইহার জন্ম বা উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা আবশ্যক মনে করি। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম হীরকের আবিষ্কার হয়। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বের রচিত কাব্য, নাটক ও আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে ইহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। নদীতীরের বালুকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরখণ্ডের সহিত এবং অনেক স্থলে মাটীর উপরের স্তরে ইহাকে পাওয়া গিয়াছে ভারতবর্ষের "গোলকুণ্ডার" হীরকখনি একটি বিখ্যাত খনি। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর তীরে নিজামরাজ্যে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ইহা অবস্থিত। এই খনি হইতেই অনেক জগৎবিখ্যাত ঐতিহাসিক হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে; যথা কোহিনূর, রেজেন্ট, দি গ্রেট মোগল ইত্যাদি। মাদ্রাজের বেলারী জেলায়, মধ্যপ্রদেশে মহানদীর নিকটে সম্বলপুরে, বিহারে ছোটনাগপুরে, বুন্দেলখণ্ডে পান্না প্রভৃতি স্থানেও হীরকের খনি রহিয়াছে। ব্রাজিলে নদীতীরস্থিত বালির মধ্যে সোণার কণার সহিত উহাকে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর তীরের বালু ও পাথর কণার মধ্যেও অনেক হীরক পাওয়া গিয়াছে। ষ্টার অফ সাউথ আফ্রিকা নামক (Star of south Africa) প্রসিদ্ধ হীরকখণ্ডটির এখানেই আবিষ্কার হয়। Stewart নামে বৃহৎ হীরকখণ্ডটিও এইখানেই পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি এবং প্রিতোরিয়াও হীরকখনির জন্য প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরকখণ্ড "কুলিনান" ১৯০৫ খৃঃ অব্দে প্রিতোরিয়ার খনিতে আবিষ্কার হয়, ইহার ওজন ৩০২৫¾ কেরাট বা ৬২১·২ গ্রাম অর্থাৎ ১০⅙ ছটাক বা আধসেরের উপর। একপ্রকার নীলমাটির অভ্যন্তরে এখানে হীরক পাওয়া যায়। সম্প্রতি রোডেশিয়া ও জার্ম্মান দক্ষিণ আফ্রিকায়ও হীরক পাওয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বোর্ণিয়ো দ্বীপে নদীতীরস্থ মাটি ও বালির মধ্যে হীরক পাওয়া

যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক স্থানে হীরকের খনি আছে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অনেক প্রদেশে সোণার সহিত হীরক পাওয়া যায়; কেলিফোর্ণিয়া ইহার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইউরোপে কেবলমাত্র উরল পর্ব্বতের স্থানে স্থানে সোণার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকের দানা পাওয়া গিয়াছে।

হীরক দেখিতে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ; সাধারণতঃ ইহা জলের মত বর্ণহীন, কিন্তু অনেক সময় নানাবিধ বর্ণযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন হীরকখণ্ড নীলাভ, কোনটি হরিতাভ, কোনটি পীতাভ এবং এমন কি কৃষ্ণাভ বা একেবারেই কৃষ্ণবর্ণ। শেষোক্ত হীরকের ইংরাজী নাম "কার্বনেডো" Carbonado. কদাচিৎ লালবর্ণের হীরক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণের জন্য সূর্য্যরশ্মিতে স্থাপিত করিয়া পরে অন্ধকারে আনিলে হীরক নানা রংএর আলোক বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আলোকরশ্মি প্রতিফলিত ও বক্রী করণে হীরকের অদ্ভুত ক্ষমতা।

হীরকের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ নানাবিধ ভ্রান্তধারণা প্রচলিত ছিল। জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের মতে হীরক কঠিনীকৃত চর্ব্বি বিশেষ। কেহ কেহ ইহাকে বালি বিশেষের দানা বলিয়াও মনে করিতেন। কিন্তু যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে হীরক কয়লা ও গন্ধকের ন্যায় অনাবৃত পাত্রে উত্তাপের সাহায্যে উড়িয়া যায়, তখন পূর্ব্ব প্রচলিত ধারণাসমূহের ভ্রান্তি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত রাসায়নিক মহামতি লেভাইশিয়ার পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিলেন হীরক কয়লারই মতন একটি দাহ্য পদার্থ বিশেষ, এবং বায়ুর সাহায্যে উত্তাপের দ্বারা কয়লা পোড়াইলে যেমন অঙ্গারম্লের উৎপত্তি হয় সেইরূপ হীরক পুড়িয়াও অঙ্গারম্ল মারুতে পরিণত হয়। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা আরো দেখাইলেন যে সমান ওজনের হীরক ও কয়লা পুড়িয়া সমপরিমাণ অঙ্গারম্লের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে ও বিশেষতঃ ডেভি, ডুমা ষ্টাশ্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় যে হীরক একটি অঙ্গার বিশেষ

অঙ্গার বা কয়লা হইতে কি প্রাকৃতিক উপায়ে হীরকের জন্ম হইতেছে এই বিষয়েও নানাবিধ মত প্রচলিত ছিল। কিন্তু যখন বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক ময়ঁসা ১৮৯৩ খৃঃঅব্দে কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে অঙ্গার হইতে এই মহামূল্য রত্ন হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন, তখন আর ইহার গোপন সৃষ্টি রহস্য কাহারো অগোচর রহিল না। এইখানে এই অদ্ভুত পরীক্ষার বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

ইটালীর এরিঝোনা জেলায় প্রাপ্ত একটি উল্কাপাথর পরীক্ষা করিয়া ময়ঁসা দেখিলেন যে উল্কাপাথরের লৌহপিণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক কণা ঘন অঙ্গারের স্তরে আবৃত রহিয়াছে। ইহা হইতে তিনি মনে করিলেন যে সম্ভবতঃ যখন গলিত লৌহে দ্রবীভূত অঙ্গার উত্তাপের হ্রাসে ক্রমশঃ শীতল হইয়া উঠে তখনই ইহার কিয়দংশ হীরকের দানারূপে জমিয়া পৃথক হইয়া পড়ে। যেমন ফুটন্ত জলে যথেষ্ট পরিমাণ সোডা বা লবণ গুলিয়া যদি ঐ জলকে ঠাণ্ডা করা হয়, তখন অনেক পরিমাণ সোডা বা লবণ দানা বাঁধিয়া ঐ জল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে ও জলভাণ্ডের তলদেশে জমিতে থাকে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অঙ্গারকে নানাবিধ গলিত ধাতুর মধ্যে দ্রবনীয় করিয়া পুনরায় শীতল করিয়া

লইলেন। অঙ্গারকে গলিত ধাতুবিশেষের মধ্যে দ্রবণীয় করিতে অত্যধিক উত্তাপের আবশ্যক হয়। ইহার জন্য মঁইসা বৈদ্যুতিক চুল্লীর ব্যবহার করেন, ইহাতে তাপের মাত্রা প্রায় ৩০০০ হইতে ৩৫০০ হাজার ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই ভীষণ উত্তাপের সাহায্যে নানাবিধ ধাতুতে অঙ্গারের সহিত দ্রবীভূত করিয়া পুনরায় ঐ তরল পিণ্ডকে শীতল করা হয়। কিন্তু এই চেষ্টা ফলবতী হইল না, এই উপায়ে অঙ্গারকে হীরকে পরিণত করিতে তিনি সমর্থ হইলেন না। ইহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে হীরক যখন সাধারণতঃ খনির অভ্যন্তরেই পাওয়া যায়, তখন ইহার সৃষ্টি বা উৎপত্তি উপরিস্থিত মৃত্তিকাস্তরের চাপের প্রভাবেও নিয়মিত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী চেষ্টায় তিনি অধিক উত্তাপ ও চাপ এই উভয় শক্তির প্রভাব একই সময়ে প্রয়োগ করিয়া অঙ্গারযুক্ত তরল লৌহপিণ্ড হইতে হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে লৌহ গলাইয়া ঐ গলিত লৌহে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গার (চিনি পোড়াইয়া যে কয়লা হয় তাহাই তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন) দ্রবীভূত করিয়া লন। তৎপর ঐ অঙ্গার সমন্বিত তরল লৌহপিণ্ডকে শীতল জল বা অপেক্ষাকৃত শীতল তরল সীসকের মধ্যে প্রক্ষেপ করেন। ইহাতে এই লৌহপিণ্ডের বহিস্তর হঠাৎ শীতল হইয়া কঠিন হইয়া যায়; কিন্তু আভ্যন্তরীণ ধাতু তখনও তরল অবস্থায় থাকে; বাহিরের কঠিন আবরণের বেষ্টনীর ভিতর এই তরল ধাতুপিণ্ড তখন ধীরে ধীরে শীতল হইয়া জমিতে থাকে। কিন্তু জলের মতন তরল লৌহও জমিয়া কঠিন হইবার সময় আয়তনে বাড়িয়া যায়। এই বর্দ্ধনশীল তরল লৌহপিণ্ড যখন শীতল হইতে থাকে, তখন তাহার স্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধি বাহিরের কঠিন বেষ্টনীর দরুণ সহজে ঘটিতে পারে না, ফলে ঐ তরল ধাতুপিণ্ড বাহ্যিক কঠিন বেষ্টনীর ভীষণ চাপের অধীনে ক্রমশঃ শীতল হইয়া জমিতে থাকে, এই অবস্থায় দ্রবীভূত অঙ্গার ঐ ধাতুপিণ্ড হইতে হীরকাকারে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এবম্বিধ পরীক্ষার ফলে মঁইসা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি হীরক কণা প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, বাকী অধিকাংশ অঙ্গার গ্রেফাইট (Graphite) রূপে পরিণত হইয়াছিল। এইপ্রকার প্রস্তুত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক কণার ব্যাস মাত্র $\frac{1}{৮৫}$ বা '০২৪ ইঞ্চি সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে কৃত্রিম উপায়ে অঙ্গার হইতে হীরক প্রস্তুত করিয়া বিশেষ লাভবান হইবার এখনও কোন সম্ভাবনা নাই। এই প্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরককণা প্রস্তুত করিতে যাহা খরচ পড়িবে প্রাকৃতিক হীরক তাহা অপেক্ষা অনেক সস্তাদরে পাওয়া যায়। তবে আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরো এমন কোন সুবিধাজনক সহজ উপায় আবিষ্কার হইতে পারে যাহার দ্বারা অতি অল্পব্যয়ে রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে অঙ্গার হইতে রাশি রাশি হীরক প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে রপ্তানী হইবে। ইহা বিন্দুমাত্রও অসম্ভব কল্পনা নহে, কারণ কাল কুচকুচে মলিন অঙ্গারকে যে উজ্জ্বল স্বচ্ছ বহুমূল্য রত্ন হীরকে পরিণত করা যাইতে পারিবে ইহাও কিছুকাল পূর্ব্বে অনেকেই উদ্দাম কল্পনা বা স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতেন।

রাসায়নিক তাঁহার পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিলেন যে এই কাল অঙ্গারের সহিত উজ্জ্বল হীরকের কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। তাহারা উভয়েই একই উপাদানে গঠিত, একই

অঙ্গারাণুর বিভিন্ন প্রকার শৃঙ্খলার দরুণ তাহারা বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। তাহারা একই উপাদানের রূপান্তর মাত্র; এবং অবস্থাভেদে এককে অন্যে পরিণত করা যাইতে পারে। কথায় বলে বটে—"কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না", কিন্তু অবস্থাভেদে ইহার ময়লা বিনষ্ট হইলে হীরকরূপে ইহা সম্রাট্ ও নৃপতিগণের শিরোভূষণ রূপে বিরাজ করিতে থাকে। তাই জ্ঞানীগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—হেয় ও প্রেয়, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট, উচ্চ ও নীচ ইহাদের মধ্যে কোন প্রকৃত পার্থক্য নাই, অবস্থার তারতম্যই এই দৃশ্যমান ভেদের জনয়িতা। তাই—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

মহাভারত-মঞ্জরীর

সমালোচনার প্রতিবাদ।

গত ফাল্গুনের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি কৃত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত মহাভারত-মঞ্জরীর সমালোচনা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বৃহৎ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই। এই জন্যই তিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অবিচার করিয়াছেন। তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন, "এ সকল বিষয়, স্মৃতির বিষয়, শাস্ত্রের বিষয়, শাস্ত্রের বিষয় আলোচনার যোগ্যতাও আমার নাই।" অথচ সে সকলেরই তীব্র আলোচনা করিয়াছেন! সমালোচকের সকল ভুল দেখাইতে গেলে প্রবন্ধ অতি বৃহৎ হইবে বলিয়া অতি সংক্ষেপে কতিপয় ভুল দেখাইতেছি।

বিদ্যানিধি প্রথমেই লিখিয়াছেন, মহাভারতমঞ্জরীর ৩১৬ পৃষ্ঠা। আমরা পাইলাম ৩৩৬+২০=মোট ৩৫৬ পৃষ্ঠা।

তিনি পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, "ইহাতে (মহাভারতে) বিস্তর প্রক্ষিপ্ত আছে," পরে তাহা ভুলিয়া গিয়া লিখিয়াছেন, "আমরা কিন্তু প্রক্ষিপ্তের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।" এজন্য মঞ্জরীকার ও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বৃথা ভ্রূকুটি করিয়াছেন।

তিনি এই গ্রন্থের চারিটী উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়াছেন। আদ্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন যে এই বৃহৎ গ্রন্থ বহু মহৎ উদ্দেশ্যে পূর্ণ।

তিনি লিখিয়াছেন "অপ্রিয় সত্য বলিয়া বোধ হয় কাহাকেও নিজমতে আনিতে পারা যায় না," তবে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কিরূপে অপ্রিয় সত্য প্রচার করিয়া কত লোককে নিজমতে আনিয়াছিলেন ও আনিতেছেন? যে সত্য একদিন অপ্রিয় থাকে, শিক্ষার গুণে পরে তাহা প্রিয় হয়।

বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, "যে দৃষ্টিতে অতীত সমুজ্জল দেখায়, তাহা করিব।" অর্থাৎ অতীত বর্ত্তমান অপেক্ষা কল্পনাতেই সমুজ্জ্বল, প্রকৃত প্রস্তাবে নহে। মহাভারত-মঞ্জরী অতীতের গৌরবের বহু প্রমাণ দিয়াছেন। বর্ত্তমান ত আমাদের সম্মুখে। সে স্থলে অতীতের ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, সামাজিক অবস্থা, আদর্শ, অধ্যবসায় প্রভৃতি বহু বিষয়ের সহিত বর্ত্তমানকে কি তুলনা করা যায়?

সমালোচক আবার লিখিয়াছেন, "কবিই অতীতের গৌরবের ইতিহাস গাইয়া বর্ত্তমানকে সে গৌরবের অধিকারী করিতে পারেন।" তিনি ইহার পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন যে, অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমানই গৌরবান্বিত, তাহা এখানে ভুলিয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহার এই মতটী সত্য হইলে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অ-কবিরা ভারতের অতীত গৌরবের ইতিহাস বৃথাই গাইয়াছেন! আর, এখনও অ-কবির দল ভারতের অতীত গৌরবের বৃথাই অনুসন্ধান (research) করিতেছেন।

সমালোচক লিখিয়াছেন যে, যাহা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ তাহা উঠিয়া যায় না। তাহা হইলে বেদান্তের ধর্ম্ম, গীতার ধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া কি রূপে বামাচারবহুল তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া ছিল? শ্রেষ্ঠ উঠিয়া যায় বলিয়াই দেশ অবনত হইয়া পড়ে।

বিদ্যানিধি "অবরোধের" অর্থ বুঝেন নাই, লিখিয়াছেন। মঞ্জরী-কার লিখিয়াছেন, "মহাভারতের নানা স্থানে আছে যে, দ্রৌপদী বাহিরে বাহির হইতেন। ইহার কারণ কি? পূর্ব্বে ভারতে অবোধের প্রথা ছিল না।" ইহাকে মঞ্জরীকর্ত্তার অর্থ অপ্রকাশিত আছে কি? মঞ্জরীলেখক তাঁহার গ্রন্থের নানা স্থানে পূর্ব্বে অবরোধ না থাকার বহু প্রমাণ দিয়াছেন। পরে উক্ত "অবরোধ" শীর্ষক প্রস্তাবের অনেক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারত হইতেও রাজপরিবারে অবরোধ না থাকার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। বিদ্যানিধি তাহা খণ্ডন না করিয়া অযোধ্যায় অবরোধ না থাকার একটী প্রমাণ ও লঙ্কায় অবরোধ না থাকার আর একটী প্রমাণ রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামায়ণের উক্ত উভয় উক্তিই অতিশয়োক্তি বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাম জনাকীর্ণ রাজ পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন, কোন সৈন্য তাঁহার অনুগমন করে নাই (অযোধ্যাকাণ্ড ২৬—১।২)। অপর সে সময় অযোধ্যায় যদি অবরোধ প্রথা থাকিত, তাহা হইলে সীতা কখনই জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন না; তাঁহার কি রথের অভাব ছিল? তাহার অব্যবহিত পরেই ত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এক রথে চড়িয়া বনবাসে গিয়াছেন!

রামায়ণে আর কি পাই? অযোধ্যার সর্ব্বত্রই বধূগণের নাট্য-শালা ও ক্রীড়াভবন ছিল (আদিকাণ্ড ৫—১২।১২)। অযোধ্যার লোকে সুসজ্জিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র এবং পৌত্র সঙ্গে লইয়া উপবনে ক্রীড়া করিত (লঙ্কাকাণ্ড ১২৭—২৯)। কুমারীগণ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দলে দলে সন্ধ্যাকালে ক্রীড়ার্থ বিহারউদ্যানে যাইত (অযোধ্যাকাণ্ড ৬৭—১৭) (সে সময় বাল্যবিবাহ না থাকায় এই কুমারী অর্থে যুবতীও বুঝিতে হইবে)। রাম রাজা হইবার পর নৃত্যগীতপটু সুন্দরীরা তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়াছেন (উত্তর কাণ্ড ৫২—২২)

রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সংবাদ প্রচার হইবার পর রাম যখন রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, তখন গৃহস্থিত ও ভূতলস্থিত কত মহিলা রামের নিকট গিয়া বলিয়াছে, "হে জননীর হর্ষবর্দ্ধন, কৌশল্যাদেবী আপনার অভিষেকে নিশ্চয়েই আনন্দিত হইবেন" (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬—৩৭।৩৮।৩৯১ ।

রাম বনে যাইবার সময় রাজা দশরথ রামকে দেখিবার জন্য তাঁহার রাণীগণ ও ৭৫০ স্ত্রী লইয়া জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন। সে সময় বহু অমাত্যও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড ৪০ অধ্যায়)। বহু অপর পুরুষও ছিল (৪২ অ)। রাম বনে গেলে কৌশল্যা বিলাপ করিয়াছেন, "কবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতির কন্যারা রামের প্রত্যাগমন জনিত আনন্দে আনন্দিত হইয়া পুষ্প ও ফল ছড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিবেন?" (অযোধ্যা ৪৩—১৫)।

রাম বনে যাইবার সময় বহু ব্রাহ্মণ রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল বলিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথ হইতে নামিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেই জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন (অযোধ্যা ৪৫—১৭।১৮)। রামের বনবাস হইতে আগমন সময়ে দশরথের পত্নীগণ উপযুক্ত রথে নির্গত হইয়াছেন (লঙ্কাকাণ্ড ১২৯—১৫)। স্ত্রীলোক, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলেই "ঐ রাম" বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন ও যান হইতে ভূমিতলে (অর্থাৎ জনাকীর্ণ রাজপথে নামিয়া আকাশস্থিত চন্দ্রের ন্যায় পুষ্পকরথারূঢ় রামকে দেখিয়াছে (লঙ্কাকাণ্ড ১২৯—৩৩।৩৪)।

রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সংবাদ রামের বন্ধুগণ কৌশল্যার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছেন (অযোধ্যা ৩—৪৬।৪৭)। রাজা দশরথের অন্তঃপুরে বহু পরস্থ পুরুষ যাইত ও রাণীরা তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন (অযোধ্যা ১৪।১৬।৩২।৩৩।৩৫।৩৬।৩৭।৩৯।৪০।৪২।৫৭ অধ্যায়)।

নারীগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করিয়াছিল (আদিকাণ্ড ১৪—১৬)। রাম ও সীতা একত্রিত হইয়া বহু জনপূর্ণ সভায় অভিষিক্ত হইয়াছেন। কন্যাগণও সেই সভায় তাঁহাদের অভিষেক করিয়াছেন (লঙ্কাকাণ্ড ১৩০ অ)।

কিষ্কিন্ধ্যাতেও লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাজার অন্তঃপুরে গিয়াছেন ও রাণী তারার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন (কিষ্কিন্ধ্যা ৩৩ সর্গ)।

সমালোচক যে মন্দোদরীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সেই মন্দোদরীও যৌবনপ্রাপ্তির পর তাঁহার পিতার সহিত বনে বিচরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার সহিত রাবণের সাক্ষাৎ ও বিবাহ হয় (উত্তরকাণ্ড ১২ সর্গ)। ইহাও কি অবরোধ প্রথা না থাকার প্রমাণ নহে? অবরোধ প্রথা ছিল না বলিয়াই রাবণের সহোদরা ভগিনী শূর্পনখা দণ্ডকারণ্যে গিয়া অপরিচিত রাম ও লক্ষ্মণের সহিত কথা কহিয়াছিলেন (অরণ্য ১৭ সর্গ)। লঙ্কাতেও রাবণ তাঁহার বহু স্ত্রী ও বহু অমাত্যগণের সহিত একত্রিত হইয়া সীতাকে কাটিতে অশোকবনে গিয়াছিলেন (লঙ্কা ৯৩ অ)। নগরের বাহিরে রাবণের সৎকার সময়েও তথায় বহু

অন্তঃপুরচারিণীগণ গিয়াছিলেন (লঙ্কা ১১৩—১১১)। লঙ্কায় বহু নারী রামের নিকটেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে সময় রাম তাঁহার সৈন্যগণে পরিবৃত ছিলেন (লঙ্কা ১২৩ সর্গ)।

তবেই পাইলাম (১) অযোধ্যার সর্ব্বত্র বধূগণের নাট্যশালা ও ক্রীড়াভবন ছিল। (২) তথায় রমণীরা পুরুষের সহিত উপবনে যাইত। (৩) অযোধ্যার রাণীদের অন্তঃপুরে বহু পরপুরুষ গমনাগমন করিত। (৪) রাণীরা তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। (৫) রাজা দশরথের রাণীরা ও ৭৫০ স্ত্রী এবং সীতা জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন। (৬) সে সময় সেই রাজপথে অগণ্য অপরিচিত পুরুষ ছিল। (৭) অযোধ্যার অন্য নারীরাও রাজপথে ও প্রকাশ্যস্থলে বাহির হইতেন। (৮) তাঁহারা অপরিচিত যুবক ও রাজপুত্র রামের নিকট গিয়াছেন ও তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছেন। (৯) নৃত্যগীতপটু রমণীরা রাম রাজা হইবার পর তাঁহার নিকট নাচিয়াছেন।

মহাভারতের বহু প্রমাণ মহাভারত মঞ্জরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে তখন অবরোধ প্রথা ছিল না। বিদ্যানিধি স্বীকার করিয়াছেন যে মহাভারতের পর রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে মহাভারতের সময় অবরোধ না থাকিলে রামায়ণের সময় তাহা প্রচলিত হইবার কারণ কি? হস্তিনাপুর হইতে অযোধ্যাও বহু দূরে নয়।

আবার মহারাষ্ট্র দেশে অবরোধ ও অবগুণ্ঠন, উভয়ই নাই। সে দেশবাসীরা আর্য্যাবর্ত্ত হইতেই তথায় গিয়াছিল। যদি আর্য্যাবর্ত্তে তাহা থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও তাহা থাকিত।

সমালোচক লিখিয়াছেন, "যখন বিদেশী, বিধর্ম্মী দস্যু ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন উত্তর ভারতে অবরোধও প্রখর হইয়াছিল," অর্থাৎ তাহার পূর্ব্ব হইতেই তথায় অবরোধ প্রথা ছিল। মহাভারত মঞ্জরীতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা খণ্ডন না করিয়া বিদ্যানিধি বলিতে পারেন না যে উত্তর ভারতে অবরোধ প্রথা ছিল ও পরে প্রখর হইয়াছিল। আবার তিনি তাহার পরেই সে মত পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছে, "তাহার পূর্ব্বে (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দস্যুগণের ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে) সাধারণ প্রজার মধ্যে নারীর অবগুণ্ঠন 'হয়ত' ছিল, কিন্তু গৃহের অবরোধ ছিল না।" অসংখ্য সাধারণ প্রজার মধ্যে যে রীতি, তাহাই দেশের রীতি বলিয়া গণ্য। তাহা হইলে উত্তর ভারতে পূর্ব্বে নারীগণের গৃহের অবরোধ ছিল না, ইহা বিদ্যানিধি শেষে স্বীকার করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই। সুতরাং মঞ্জরীকার রাজপরিবারেও অবরোধ প্রথা না থাকার যে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে ভারতে অবরোধ প্রথা ছিল না," তাহা সত্য নয় কি?

বিদ্যানিধি কোন প্রমাণ দেন নাই যে পুরাকালে আর্য্যনারীরা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ ঐরূপ কোন প্রমাণ মহাভারত ও রামায়ণে নাই। বিদ্যানিধির 'হয়ত' দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না।

সমালোচক লিখিয়াছেন, "সীতার বিবাহ বাল্যকালে হইয়াছিল।" রামায়ণে আছে :— জনক বলিতেছেন, "অনেক রাজা এখানে আসিয়া 'বর্দ্ধমানা' সীতাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন" (আদিকাণ্ড ৬৬—১৫।১৬)। পঞ্চানন তর্করত্ন 'বর্দ্ধমানা'র অর্থ লিখিয়াছেন "যৌবনসম্পন্না।" অন্যত্র সীতা বলিয়াছেন, "আমার পিতা আমার পতিসংযোগ সুলভ বয়স' হইয়াছে বলিয়া চিন্তাকুল হইলেন" (অযোধ্যা ১১৮—৩৪)। এই সকল ঘটনার পর রামের সহিত সীতার বিবাহ হইয়াছিল। আর বিবাহের পরেই সীতা ও তাঁহার ভগিনীগণ সম্বন্ধে রামায়ণ আছে :—

রেমিরে মুদিতাঃ সর্ব্ব ভর্তৃভিঃ সহিতা রহঃ। (আদি ৭৭—১৪)।

পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ না থাকার বহু প্রমাণ মহাভারত-মঞ্জরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিদ্যানিধি তাহা খণ্ডন করেন নাই।

সমালোচকের সকলই অভিনব মত। আর একটি এই যে ঋগ্বেদের বহু বহু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতিছিল। ঋগ্বেদের বহু বহু পূর্ব্বে কি ছিল তাহার প্রমাণ নাই, তাহারই কল্পনা। পণ্ডিত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বেদের বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে ঋগ্বেদের বহু বহু পূর্ব্বে কেন, ঋগ্বেদের সময়েও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি ছিল না (প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২০, পৃঃ ১)।

বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, "মঞ্জরীকার স্ত্রী-রত্ন শব্দে বুঝিয়াছেন, সুন্দরী স্ত্রী। কিন্তু স্বজাতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, রত্ন শব্দের এই অর্থ প্রসিদ্ধ," মঞ্জরীকার কেন 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'সুন্দরী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট কারণ দিয়াছেন। বিদ্যানিধি তাহার উল্লেখ ও খণ্ডণ করেন নাই। সৌন্দর্য্য না থাকিলে কোন নারীই নারীশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আবার যে নারী দুষ্কুলজাত, সে নারী রূপবতী ও গুণবতী হইলেও স্ত্রীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহে। 'নারীশ্রেষ্ঠ' বলিলে নারীজাতির মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে। তাহার পর, মঞ্জরীকার যত দুষ্কুলজাত স্ত্রীরত্ন গ্রহণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সকলেরই স্বামী তাঁহাদের শুধু রূপের জন্য বিবাহ করিয়াছেন, "স্ত্রীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ" বলিয়া নহে। পণ্ডিত অবিনাশ চন্দ্র বিদ্যাবিনোদও স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপির অর্থ করিয়াছেন, "নীচবংশ হইতেও 'সুন্দরী কন্যা' গ্রহণ করা যাইতে পারে" (চাণক্য শ্লোক পৃঃ ৮)।

সমালোচক মঞ্জরীকারের সহিত একমত হইয়া প্রথমে লিখিয়াছেন, "অনুলোম বিবাহ যে বহুকাল পর্য্যন্ত চলিতেছিল, তাহারও বহু প্রমাণ আছে।" তাহার পরে সে মত পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, অসবর্ণ বিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত, উহার বহু শাস্ত্র মঞ্জরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা যে প্রচলিত ছিল, উহার বহু দৃষ্টান্তও মঞ্জরীতে আছে। সমালোচক সে সকল খণ্ডণ করেন নাই। সে স্থলে ঐ জন মত পরিবর্ত্তন সঙ্গত কি ?

তিনি আবার লিখিয়াছেন, "বিবাহ কন্যাদান নহে, চিরস্থায়ী নহে, সাময়িক চুক্তি মাত্র—এই রূপ মত তিনি (মঞ্জরীকার) যত সহজে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, আমার নিকট ততই অ-সঙ্গত বোধ হইয়াছে।" গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ না করার

এই সকল ফল! মঞ্জরীকার ঐ সকল বিষয় 'স্বীকার' করিয়া লন নাই। তিনি শাস্ত্রের বহু বচন ও বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা সে সকল প্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের এক অংশের সহিত অন্য অংশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সমালোচক ঐ সকল বিষয়ের সহিত "সধবাস্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ" ও "বিধবা-বিবাহ" এক সঙ্গে পড়িলে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিয়া ঐ সকল বিষয় হয়ত তাঁহার নিকটেও সহজ হইত।

সমালোচক আর একটী দোষ ধরিয়াছেন যে পূর্ব্ব প্রথা কেন উঠিয়া গিয়াছে, মঞ্জরীকার তাহার কারণ দেন নাই। তিনি অনেক স্থলে দিয়াছেন। যাহা সহজ, তাহারই কারণ দেন নাই।

বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, "মঞ্জরী একাই মূল্যবান্ তথ্যের আকর। * * * যা নাই মঞ্জরীতে, তা নাই ভারতে। * গ্রন্থকারের ভাষা ভাল, রচনারীতিও ভাল।" তথাপি তিনি লিখিয়াছেন, "এই অংশ (গল্পাংশ) যুবকগণের শিক্ষাপ্রদ হইবে।" সমালোচক মনোযোগ দিয়া গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পড়িলে বুঝিতে পারিতেন যে, শুধু গল্পাংশ নহে, সমুদয় গ্রন্থই, শুধু যুবকগণের নহে, বৃদ্ধগণেরও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। নতুবা কি পক্ষপাতশূন্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিতেন—"ইহা পাইবামাত্র পড়িবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইহার প্রতি পত্রে গভীর গবেষণা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত প্রামাণিক বচন সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যে মন্তব্য ও সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অশেষ কল্যাণ হইবে। হিন্দুজাতি বাস্তবিকই ধ্বংসোন্মুখ। এখনও যে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হইতেছে না ইহাই আক্ষেপের বিষয়!" এমন কি, বর্ত্তমান সময়ের একজন প্রধান সাহিত্যিক নাটোরের মহারাজা বাহাদুরও এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমি সাধারণ ভাবে পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, আপনি বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়া ভারত মহাসমুদ্র এবং ভারতীয় অপরাপর শাস্ত্র বারিধি মন্থন করিয়াছেন ও রত্নরাজি, 'সূত্রে মণিগণের ন্যায়', গ্রথিত করিয়া বঙ্গ বাণীর কণ্ঠহার প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারে একটী মূল্যবান্ রত্ন হইয়া রহিল মনে করিতেছি।"

শ্রীঅক্ষয় কুমার পাল।

আঁধারের যাত্রী

মেঘাচ্ছন্ন স্তব্ধ মূক রাত্রি—
চলিয়াছি অন্তহীন নিরানন্দ আঁধারের যাত্রী ;
নিশ্ছিদ্র গগন
সুগভীর বেদনায় আজি নিমগন
অবিচ্ছিন্ন অন্ধশোক অন্ধকার মাঝে ;
ক্ষুব্ধ লাজে,
ধরণী সে আপনারে ঢাকিবারে চাহে এক কোণে
ঘন তমিস্রার সিক্ত বসন অঞ্চল আবরণে ;
আজি সারা রাতি
শূন্যে শূন্যে দিকে দিকে রুদ্ধ রোদনের আমি সাথী ;

মনে হয় এরই সাথে সাথে
কবে কোন সমুজ্জ্বল প্রাতে
দীপ্ত মুখরিত মুগ্ধ আনন্দের মহাযজ্ঞ হ'তে
ভেসেছিনু অনুকূল স্রোতে
প্রদোষের স্নিগ্ধ-তপ্ত নির্ম্মল আলোতে।
তরীতে ছিল না স্থান, আকাশে ছিল না মেঘকণা,
সংশয় ছিল না চিত্তে, ছিল না ভাবনা,
যাত্রী দল
আনন্দচঞ্চল,
আমারে ঘেরিয়া কত নব উৎসবের আয়োজন
গানে গানে পূর্ণ করি নিখিল গগন,
দিকে দিকে পড়েছিল টুটিয়া লুটিয়া—
আবেগে হিল্লোলে রঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে আবর্ত্তিয়া
হানিয়া তরণীতটে, মৃদুমন্দ মৃদঙ্গের ধ্বনি—
উচ্ছ্বসিত তটিনীর স্পন্দমান হৃদয়ের যেন প্রতিধ্বনি।
নবারুণরাগদীপ্ত শুভ্র সে প্রদোষে
চঞ্চল এ চিত্তভৃঙ্গ পান করেছিল মধুকোষে
আলোর অমৃতধারা,—
বিদ্যুৎ সঞ্চারি' দেহে করেছিল মোরে আত্মহারা।

নয়নে কি মোহ ছিল ।　এ বিশ্বের প্রতি অণুটিরে
চেয়েছিল পেয়েছিল বুকে ফিরে ফিরে,
আমারি চিত্তের মাঝে এ নিখিল পেয়েছিল পরম আশ্রয়
অনন্ত বিভূতি লয়ে—একি এ বিস্ময় ।
সারা বিশ্ব আপনার আনন্দ সম্ভারে
সম্ভাষিয়া মোরে বারে বারে
বলেছিল "প্রিয় তুমি, প্রিয় ওগো, তুমি প্রিয়তম
সেদিনো এ রুদ্ধ বক্ষে মম
এমনি নিবিড় ব্যথা, আনন্দের আঘাতে সংঘাতে
রুদ্ধ করি কণ্ঠ মোর সিক্ত করি আঁখি অশ্রুপাতে,
উঠেছিল হৃদয়ে ঘনায়ে—
পড়িল ঝরিয়া বুঝি হাসিভরা অশ্রুরূপে পত্রপুষ্পে শিশির কণায় ।
মনে হয় এ জীবন যেন এক অপরূপ রক্ত শতদল
অশ্রুসায়রের পরে করে টলমল,
অরুণ কিরণ লভি আনন্দে হাসিয়া উঠে তারি অশ্রুজল ।

আজি নিশি ঘনঘটা ঘোর
আচ্ছন্ন বিভোর—
আজিও তেমনি ব্যথা অন্তরে অন্তরে
বন হতে বনে বনান্তরে
সমস্ত বিশ্বের চিত্তে উঠিছে গুঞ্জরি,
গগনে গগনে তার প্রতিধ্বনি কেঁদে মরে গুমরি গুমরি ।
ওগো এই তিমির যামিনী
হবে না কি অবসান ?　দৃপ্ত সৌদামিনী
ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত দাপটিয়া রোষে
আকাশ প্রাঙ্গন জুড়ি গভীর নির্ঘোষে
ত্রাসিয়া দংশিয়া এই নিবিড় আঁধারে বারম্বার
ফিরিবে কি শূন্যে শূন্যে তীব্র বিষে জর্জ্জরিয়া মূর্চ্ছিত আঁধার ?
চলিয়াছি একা
গভীর তিমিরে লুপ্ত কোথা পথ নাহি যায় দেখা,
একটি তারার ক্ষীণ আলো
একটি প্রদীপ নাহি, চারিদিকে অন্ধকার ঘেরিয়া দাঁড়ালো,
ঝর ঝর ঝরিছে কেবল
তিমির অন্তর ভেদি অশ্রুজলধারা অবিরল ।

ভুবনে গগনে মনে আজি একাকার,
জলধারাতন্ত্রে বাঁধা পান্থবীণা ডাকে বারবার
"এস বাহিরিয়া এস, এস এস ওগো পথহীন
এস নিরুদ্দেশ যাত্রী"—চরাচর তিমিরবিলীন
সীমাশূন্য অম্বর অঙ্গনে,
চকিত চপলদীপ্তি চমকিছে শুধু ক্ষণে ক্ষণে
আজি শুনা যায় কোথা আঁধারের পারে
অস্পষ্টের সুদূর কিনারে
ধ্বনির উচ্ছ্বাস গীতি, চিত্তে মোর তুলিছে হিন্দোল
ধরণীর চিরন্তন মহাঅশ্রুসিন্ধুকলরোল।

শ্রীজীবনময় রায়।

আমেরিকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অভ্যুদয়

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংরক্ষণের জন্য দুইবার আইন প্রণয়ন করিলেন। বিদেশাগত দ্রব্যের উপর আমদানিকর (Import duty) স্থাপন এবং আর্থিক সাহায্য (bounty) প্রদানের ফলে যদি ভারতীয় লৌহশিল্প উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করে, তাহা সুখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংরক্ষণ নীতিই (protection) যে শিল্পের উন্নতির একমাত্র বা প্রধান উপায় নহে ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমেরিকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি আলোচনা করিলে এই ধারণা স্পষ্ট হইবে। ১৮৭০ হইতে ১৯১০ সাল, এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার লৌহশিল্পের বিস্ময়জনক উন্নতি হইয়াছে ; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত করিত এবং যুক্তরাজ্যের উৎপাদন অতি নগণ্য ছিল। ১৮৯০ সালে যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের উৎপাদনকে পশ্চাতে রাখিয়া এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তুলনায় প্রায় তিনগুণ সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া লৌহজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

সাল	ইংলণ্ড	যুক্তরাজ্য
১৮৭০	৫,৯৬৩	১,৬৬৫ হাজার টন
১৮৭৫	৬,৩৬৫	২,০২৪
১৮৮০	৭,৭৪৯	৩,৮৩৫

সাল	ইংলণ্ড	যুক্তরাজ্য
১৮৮৫	৭,৪১৫	৪,০৪৪
১৮৯০	৭,৯০৪	৯,০২৩
১৮৯৫	৭,৭০৩	৯,৪৪৬
১৯০০	৮,৯৬০	১৩,৭৮৯
১৯০৫	৯,৬০৮	২২,৯৯২
১৯১০	১০,০১২	২৭,৩০৪

এই চল্লিশ বৎসর বিদেশজাত লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের আমদানির উপরে উচ্চহারে কর বসাইয়া যুক্তরাজ্য স্বদেশী শিল্পের উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগ ও উন্নতির আয়তন দেখিলে পরস্পরের মধ্যে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তথাপি বিশেষজ্ঞেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন আমেরিকার লৌহশিল্পের অভ্যুত্থানের মূল কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমেরিকার অধিকাংশ স্থলে এ্যান্থ্রাকাইট কয়লা দ্বারা লৌহ গলান হইত। এই কয়লার প্রচুর সরবরাহ ছিল না এবং মূল্যও অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল। প্রায় ১৮৭০ সাল হইতে বিটুমিনাস্ জাতীয় কয়লার প্রচলন হইতে থাকে। বিটুমিনাস্ কয়লা অজস্র পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ইহা পুড়াইয়া কোকরূপে লৌহ গলানর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া লৌহোৎপাদনের খরচ অনেক কমিয়া আসে। ঠিক এই সময়ে সার হেনরী বেসমার ইস্পাত প্রস্তুত করিবার এক অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করেন। বেসমার প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত ও গৃহীত হয়। যে লৌহে ফস্ফোরাসের ভাগ অধিক তাহাতে বেসমার প্রণালী প্রয়োগ করা চলে না। আমেরিকার সৌভাগ্যক্রমে সুপিরিয়ার হ্রদের সন্নিকটে বেসমার প্রণালীর উপযোগী লৌহের অসংখ্য খনি আবিষ্কৃত হয়। আশানুরূপ কয়লা ও লৌহ হস্তগত হইলেও তাহা একত্র করা এক ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু ১৮৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে যুক্তরাজ্যের রেল লাইন এত বিস্তৃত ও উন্নত হইয়াছিল এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে এত সস্তা ও সুবিধায় মাল প্রেরণ করা চলিত যে লৌহ ও কয়লার খনির পরস্পরের দূরত্ব ও ব্যবধান শিল্পের উন্নতির পরিপন্থী হয় নাই।

আমেরিকা বৃহৎ ব্যবসায় ও কারখানার (Trusts and combinations) লীলাভূমি! বিভিন্ন কারখানা একের কর্তৃত্বে সম্মিলিত হইয়া সমযোগে কাজ করিলে নানাদিক দিয়া ব্যয়সঙ্কোচ হইয়া থাকে। যুক্তরাজ্যের লৌহব্যবসায়িগণ সংহতির উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যবসায়ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল। উৎপাদনের নানা স্তর একের অধীনে কেন্দ্রীভূত ও বিভিন্ন কারখানা সম্মিলিত ভাবে পরিচালিত হওয়ায় যুক্তরাজ্যের লৌহশিল্প অল্প সময়ের মধ্যে বিশালভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আমেরিকায় শ্রমজীবিসমস্যা অদ্যাবধি প্রবল আকার ধারণ করে নাই। ১৮৭০ হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে মজুররা মাত্র দুইবার ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, দুইবারই তাহারা বিফলপ্রযত্ন

হয়। ইংলণ্ডে শ্রমজীবিদের মধ্যে আন্দোলনের বিরাম নাই। তাহাদের দাবী অনেকস্থলেই গ্রাহ্য হইয়াছে। আমেরিকায় শ্রমজীবিসঙ্ঘের হস্তে বিশেষ কোনো ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডের তুলনায় আমেরিকার কারখানার মালিকরা শ্রমজীবী পরিচালনায় নানাবিধ সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। যুক্তরাজ্যে মজুরের অভাব অদ্যাবধি অনুভূত হয় নাই। ঐ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য অন্যান্য দেশ হইতে দলে দলে লোক আগমন করে। সুদক্ষ না হইলেও অল্প মাহিনায় এইরূপ উপনিবেশিক শ্রমজীবী নিযুক্ত করিয়া অনেক কাজ পাওয়া যায়। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় এই জাতীয় অসংখ্য শ্রমজীবী কাজ করিতেছে। অল্প পারিশ্রমিকে ইহারা কাজ করে বলিয়া লৌহ উৎপাদনের খরচাও তদনুপাতে কম হইয়া থাকে। ইহাও যুক্তরাজ্যের শিল্পের উন্নতির অন্যতম কারণ।

এই সকল ঘটনা একত্র সম্মিলিত হইয়া আমেরিকায় লৌহ শিল্পের উন্নতি সত্বর আনয়ন করিয়াছে। শ্রীবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, ইহাদের উপেক্ষা করিয়া একমাত্র সংরক্ষণনীতির প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলে অত্যন্ত ভ্রম হইবে। তবে লৌহশিল্পের উন্নতির মূলে সংরক্ষণনীতির প্রভাব যে একেবারেই নাই—তাহাও সত্য নহে।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাজ্যের লৌহশিল্পের জীবননাট্যে সংরক্ষণনীতি উৎসাহদাতার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকায় সুবিধা ও সুযোগ এত অধিক ছিল, যে রক্ষণ শুল্ক ব্যতিরেকেও তাহার লৌহশিল্প নিশ্চয়ই উন্নতিলাভ করিত, তবে উন্নতি এত সহজ ও দ্রুত হইত কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সংরক্ষণনীতি, কাঁচামাল, লৌহ ও কয়লা, এবং মূলধনের যোগাযোগ অতি শীঘ্র সংঘটিত করিয়াছিল। আমদানিকর বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া যুক্তরাজ্যের বাজারে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল, বাজারে লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রীর প্রভূত কাটতি হওয়ায় ঐ ব্যবসায়ের মালিকগণ প্রচুর হারে লাভ করিতেছিল এবং শিল্পের উন্নতির প্রতি বৈজ্ঞানিক ও মূলধনের অধিকারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

সংরক্ষণনীতির প্রভাব ইহার অধিক অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য এই প্রভাবই নিতান্ত অল্প নহে—কিন্তু লৌহশিল্পের উন্নতির জন্য একমাত্র ইহাকেই দায়ী করিলে ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করা হইবে। সংরক্ষণনীতি অনেক সময়ে কৃত্রিম আশ্রয়দান করিয়া শিল্পের উদ্যম ও অধ্যবসায় নষ্ট করিয়া ফেলে, কখনও বা অযোগ্যকে আশ্রয় দিয়া দেশের জনসাধারণকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতিকে সে ভাবে অভিযুক্ত করা চলে না। সংরক্ষণনীতি যুক্তরাজ্যের লৌহব্যবসায়িগণের সম্মুখে যে সুযোগ উপস্থিত করিয়াছিল তাহারা নানাবিধ অনুকূল অবস্থার মধ্যে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছে।

সংরক্ষণনীতির সহায়তা লাভ করিয়াছে বলিয়াই যে ভারতীয় লৌহশিল্পের উন্নতি সুনিশ্চিত—এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই, তবে এই সুযোগের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিলে উন্নতির সম্ভাবনা আছে ইহা স্বীকার করা চলিতে পারে। যুক্তরাজ্যের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া লৌহশিল্প পরিচালনা করিলে ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

হিমালয়

দিগন্ত-প্লাবী অম্বর-চুম্বী
অনন্ত-যোগী নিরুদ্ধ-সংজ্ঞা,
তুষাব-তুহিনস্নাত-হেমাঙ্গ
বিবাট-মূর্ত্তি কাঞ্চনজঙ্ঘা।

বনানী শ্যামা চরণাবলেহী
সীত অভ্রভেদী শ্রীকণ্ঠহারা ;
মহান্ত শিরে সীত চূড়া-লগ্ন ;
বক্ষে করুণা জাহ্নবীধারা।

প্রশান্ত ভালে ধ্যান-মৌন আঁখি,
অনন্তমুখী গবিলাপী ছন্দ।
ঝঙ্কারে বীণে কোটিকল্প বাণী
উৎসারে গন্ধমাধুরী-আনন্দ।

যুগযুগান্ত, লাখবাণী ভাষা
তিমিরে স্তিমিত অগণিত সংখ্যা
সতত প্রহরী অবিনাশী আত্মা
শ্বেতপদ্ম আঁখি কাঞ্চনজঙ্ঘা।

উমা অন্নপূর্ণা স্নেহাভিষেকে
তন্বী কিশোরী ধবলী তুষারে।
মেনকা মহিষী হৃদি পদ্মাসীনা
মানসী-প্রতিমা বিলাসে বিহারে।

হে মৌন সম্রাট! প্রশান্তযোগী
কত লক্ষ ভাষা শব্দকলাপে
পদ কল্প ছায়ে ধরণী সুধন্যা
গাহুক প্রশস্তি আলাপে-প্রলাপে।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বসু।

পুস্তক-পরিচয়

স্বাস্থ্য :—শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত; সুহৃত-সঙ্ঘ (১৭৭, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র।

এই ছোট বইখানিতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের যত বেশী প্রকাশ ও প্রচার হয় দেশের ততই মঙ্গল। বাঙ্গালী যে আজ মরণোন্মুখ জাতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা তাহার একমাত্র কারণ নহে। স্বাস্থ্য রক্ষার অতি সাধারণ ও মৌলিক তথ্যগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের ঘোরতর অজ্ঞতা ও উদাসীনতা দেশের এই শোচনীয় অবস্থার যে একটী গুরুতর কারণ তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আমরা আশা করি আলোচ্য পুস্তকখানি এই দেশব্যাপী অজ্ঞানতা কিঞ্চিৎ দূর করিতে সমর্থ হইবে। দুঃখের বিষয় স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় খুব কমই লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে বিশেষজ্ঞ মণীষীর অভাব নাই। আমরা আশা করি তাঁহাদের দৃষ্টি এই উপেক্ষিত অথচ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টীর প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য :—শ্রীচন্দ্র কান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য বার আনা মাত্র।

বইখানিতে বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যের মূল উপাদান ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার উপকারিতা ও অপকারিতা আলোচিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সাধারণের উপযোগী হইবে আশা করা যায়।

জ্বর :—শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের আক্রমণে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল। অথচ এই দুইটী ব্যাধি প্রতিকার সাপেক্ষ। উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে ইহাদের হস্ত হইতে নিরাপদ্ করা যায়। শুধু অজ্ঞানতার পাপেই প্রতি মিনিটে ৪০ জন বাঙ্গালী ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রাণ হারাইতেছে। আলোচ্য পুস্তক খানিতে লেখক সহজ ভাষায় এই রোগের নিদান ও চিকিৎসার আলোচনা করিয়া বাঙ্গলার জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

সংক্রামক রোগ :—শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

বইখানিতে কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, উপদংশ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের উৎপত্তির কারণ ও তাহার প্রতিকার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক শুধু স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা ও অসাবধানতাবশতঃ নানাপ্রকার সংক্রামক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে। সুতরাং আলোচ্য পুস্তকখানি যে দেশবাসীর খুব উপকারে আসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নব্যভারত

অতিরিক্ত পত্র

১ম খণ্ড] ফাল্গুন, ১৩৩১ [১ম সংখ্যা

জাতীয় শিক্ষা

কোন জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লিখিতেছেন "বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে যে দাস-মনোভাবের সৃষ্টি করিতেছে আমাদের তরুণ বংশধরগণকে উহার প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্যাপকভাবে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেখানে জাতির আয়ত্বাধীনে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হয়। সকল আন্দোলনের নেতৃগণই উদীয়মান বংশধরগণের নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত সহায়তার প্রত্যাশা করেন, সুতরাং উহাদের প্রথম দাবী যে দেশের যুবকবৃন্দের উপরেই থাকে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে ১৯০৬ সনের আন্দোলন এক হিসাবে সফল হইয়াছিল। ইহাতে এমন একদল কর্মীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহের সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা স্বত্ত্বেও নিছক শিক্ষামূলক আন্দোলন হিসাবে যে ইহার পৃথক একটা অস্তিত্ব অথবা মূল ছিল না তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল প্রবাহে উৎপত্তিই ইহার দুর্ব্বলতার কারণ। সুতরাং প্রথমটাতে যখন ভাটা পড়িল তখন পরেরটাও কাজ কাজেই শুকাইয়া গেল।

"অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে দ্বিতীয়বার শক্তিসঞ্চার করে। সমগ্র দেশে শত শত বিদ্যালয় ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিল। ইহাদেরও উদ্দেশ্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। কেবল এক বৎসর কালের জন্য অসহযোগী ছাত্রদের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। উহাদিগকে 'স্বরাজ সৈনিকে' পরিণত করা, অর্থাৎ অসহযোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োগ করাই ছিল লক্ষ্য। এক্ষেত্রেও শিক্ষা সম্বন্ধীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিল না। শেষেরটায় বেগ কমিয়া আসিলে প্রথমটাও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল।

"ইহার ফল হইয়াছে এই যে আমাদের কার্য্য পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা চিরকালই নিম্নতর স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে এবং কোন নেতাই কোন কালে এবিষয়ে

বৈজ্ঞানিক অথবা স্বাধীন চিন্তা নিয়োগ করেন নাই। ইহাকে যে আপনি খদ্দরের ন্যায় মূল্যবান বিবেচনা করেন তাহা বোধ হয় না, অথবা হয়ত আপনার কাছে খদ্দর এবং জাতীয় শিক্ষা সমার্থক! স্বরাজীগণ তো উহাদিগকেই [illegible] হইয়া আছেন। এইরূপ অবস্থায় এই আন্দোলনের উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? আর এই আন্দোলন যদি পুনঃ পুনঃ এরূপ বিফল হইয়াই চলে তাহা হইলে অধিকাংশ দেশবাসীর উপর ইহার প্রতিক্রিয়া কি নিরাশাজনক এবং শোচনীয় হইবে না?

"সরকার তরফের চাল এবং সুবিধা অনুসারে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এবং 'সূত্রধারী'* নেতৃবর্গের হস্তে রাজনীতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে। জাতীয় মহাসমিতি হয়ত চিরকালই এক অথবা অপর দলের আয়ত্বে থাকিবে, এবং প্রত্যেক দলেরই কার্য্য পদ্ধতি পৃথক হইবে। কেহ হয়ত খদ্দর উৎপাদন এবং অস্পৃশ্যতার নিরাকরণে জোর দিবেন, কেহ সার্ব্বজনীন শিক্ষা চাহিবেন, আবার কেহ হয়ত একেবারেই আইন অমান্য আরম্ভ করিতে চাহিবেন। আপনি অবশ্যই বলিবেন এই সকল কাজ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরই করা উচিৎ, কারণ জাতির ডাকে আগ্রহের সহিত সাড়া দেওয়া উহাদের কর্ত্তব্য। আপনি কি মনে করেন ছেলেদের যদি আজ এক কার্য্যপদ্ধতি এবং কাল অপর কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয় তাহা হইলে উহাদের শিক্ষা, চরিত্র, অথবা কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধীয় ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন হইবে?

"শিক্ষার লক্ষ্য শিশুগণের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি সমূহের বিকাশ সাধন, যাহাতে উহারা নাগরিকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে। কেবল উচ্চ বিদ্যালয়েই এমন শিক্ষা সম্ভবপর হইতেপারে। ইহার পূর্ব্বে উহারা একেবারে কচি থাকে, আর ইহার পরে উহাদের চরিত্র এমন একটা বিশিষ্ট মোচড় খায় যে অভিলষিত অপর কোন পথে উহাকে পরিবর্ত্তিত করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আপনার মতে উচ্চ বিদ্যালয়ের বয়সটা প্রধানতঃ হাতে সূতাকাটা ও কাপড় বোনা এবং তৎসম্পর্কিত সকল প্রকার কাজে নিয়োগ করা উচিৎ। যে শিক্ষায় কার্য্য-দক্ষতার পার্থক্য স্বত্বেও সকল ছাত্রকে একই ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয় উহা কি অস্বাভাবিক এবং অত্যাচারমূলক নহে? যে সকল বালক এই প্রকার শিক্ষা লাভ করিবে উহারা শিক্ষার সকল প্রকার ফলই লাভ করিবে, এইকি আপনি মনে করেন? জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে নবজীবন সঞ্চার করিবার যোগ্যতা কি উহারা লাভ করিবে? সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, যে সকল শিক্ষক এবং ছাত্র উপযুক্তরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন সমাজে উহারা সরকারী শিক্ষালয়ে তথাকথিত 'উদার শিক্ষা' প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও হীন বিবেচিত হইয়া থাকেন। শিক্ষককেই যদি সাধুভাবে জীবিকার্জ্জনের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে সমাজে তাঁহার স্থান হীন হয়, এবং ফলে ছাত্র অথবা জনসাধারণ কাহারও উপায়ই তিনি প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। আপনার বিদ্যালয় সমূহে কেবল তাঁতীর ছেলেদেরই শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে। অপরের পক্ষে অধিকতর ব্যাপক এবং উদার শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন। সূতাকাটা এবং কাপড়বোনা শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বিশেষ হইতে পারে, কিন্তু উহাকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না, এবং থাকা উচিৎ

*সূত্রধারী—in power

ও নয়। জাতীয় শিক্ষার মৌলিক এবং সুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সূত্র নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়কে নিজের প্রয়োজন, ক্ষমতা, এবং ছাত্রগণের যোগ্যতা অনুসারে ব্যবস্থা করার অধিকার দিলেই কি অধিকতর ভাল হয় না ?

"আপনি অনেক সময় বলেন যে ইংরাজ রাজের সহিত একটা বাস্তব অহিংসা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এবং আপনি উহার জন্য সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত সৈনিক চাহেন। আপনি কি মনে করেন যে সকল বিদ্যালয়ে কেবল সুতাকাটা ও কাপড় বোনা শেখান হয় সেই সকল বিদ্যালয় হইতে এইরূপ সৈনিকের একটা অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ পাইবেন ? এই সকল অপরিণত, এবং আংশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া অসম্পূর্ণরূপে সজ্জিত যুবকগণের পরাজয়ের সম্ভাবনাই কি অধিক নহে ?

"গত ৪০ বৎসর অথবা অধিক কালের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে কতকগুলি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আপনি কি এমন একটি প্রতিষ্ঠান নির্দ্দেশ করিতে পারেন যাহার আদর্শ আমরা সরকারকে অনুসরণ করিতে বলিতে পারি ?

"সমগ্র জগৎ জড়বাদ-মূলক সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে। উহার অভাবে যে আমাদিগকে অসুবিধায় পড়িতে হইবে তাহা নিশ্চিত। বৈজ্ঞানিক এবং বৈষয়িক উন্নতির পথে পেছনে পড়িয়াছিল বলিয়াই যে ভারত পাশ্চাত্য জাতি সমূহের কবলিত হইয়াছে তাহা এখন নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা উপেক্ষার বিষয় নহে। কিন্তু আপনি যে কখনও রসায়নশাস্ত্র অথবা পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বের আরোপ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। ইহা কি বিস্ময়কর নহে ?"

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থা কি ছিল আমি জ্ঞাত নহি, কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থা অবগত আছি। যদি বাস্তবিক 'জাতীয়' হইতে হয় তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষায় সমকালীন জাতীয় অবস্থা প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় অবস্থা কতকটা অনিশ্চিত, সুতরাং জাতীয় শিক্ষায়ও অল্পাধিক নিশ্চয়তার অভাব অনিবার্য্য। অবরুদ্ধ স্থানের শিশুগণ কি করে ? উহারা কি পরিবর্ত্তমান অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লয় না, এবং নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী অবরোধকারীর আক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করে না ? উহাই কি উহাদের পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা নহে ? পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের কৌশলই শিক্ষা। বর্ত্তমান কালের শিক্ষা প্রণালীর সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী এই যে ইহাতে বাস্তবের ছাপ নাই, শিক্ষিতেরা দেশের পরিবর্ত্তনশীল প্রয়োজনে সাড়া দেয় না। স্থানীয় পারিপার্শ্বিকের সহিত প্রকৃত শিক্ষার সামঞ্জস্য থাকে, না থাকিলে উহা সুস্থতার পরিচায়ক নহে। শিক্ষায় অসহ-যোগের উদ্দেশ্য ছিল এই সামঞ্জস্যবিধান। এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা যে আমরা করিতে পারি নাই তাহা সত্য। ইহার কারণ আমাদের অপূর্ণতা, আমাদের পারিপার্শ্বিকের মোহ কাটাইয়া উঠিবার অক্ষমতা।

একথা বলার উদ্দেশ্য এহ নয় যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ শুধু সুতাকাটা ও কাপড় বোনা শিক্ষালয়ে পর্য্যবসিত হইবে। সুতাকাটা ও কাপড় বোনাকে আমি জাতীয় শিক্ষার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বিবেচনা করি, কিন্তু ইহাতেই শিশুগণের সমগ্র সময় নিয়োগ

করিতে বলিনা। নিপুণ অস্ত্র চিকিৎসকের মত আমিও পীড়িত অঙ্গে মনোনিবেশ করিয়া উহার তত্ত্বাবধানে রত হই কারণ আমি জানি যে তাহাই অন্যান্য অঙ্গের যত্ন লইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। শিশুর আত্মা, বুদ্ধিবৃত্তি, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তিনেরই বিকাশ আমার অভিলষিত। তিনের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, আর আত্মাকে ত একান্তভাবেই অবহেলা করা হইয়াছে। এই জন্য সময় অসময় বিচার না করিয়া সকল সময়েই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই সকল গুরুতর ত্রুটী সংশোধনের জন্য অনুযোগ করিয়া থাকি। শিশুগণের পক্ষে দৈনিক আধঘণ্টা করিয়া সুতাকাটা কি অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য হইবে? ইহারই ফলে কি উহাদের মানসিক পক্ষাঘাত জন্মাইবে?—

বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব আমি অবগত আছি, যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত আমি সাক্ষাৎ-ভাবে জড়িত আছি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় উহারা যদি বিজ্ঞান শিক্ষায় অবহেলা করিয়া থাকে উহার কারণ শিক্ষকের অভাব। কার্য্যকরী শিক্ষাদানের উপযোগী পরীক্ষাগারও ব্যয়সাপেক্ষ। এই প্রাথমিক এবং অনিশ্চয়ের অবস্থায় উহার জন্যও আমরা প্রস্তুত নই। (National education, ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২ই মার্চ্চ, ১৯২৫)

জন্ম নিয়ন্ত্রণ *

(মো, ক, গান্ধী)

বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনায় আমি যথেষ্ট সঙ্কোচ ও দ্বিধা বোধ করিতেছি। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতেই জন্মসংখ্যা নিয়মণের জন্য কৃত্রিম উপায়ের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি বহু পত্র পাইয়া আসিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের উত্তর দিয়া থাকিলেও এযাবৎ প্রকাশ্য ভাবে উহার আলোচনা আমি করি নাই। ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে ছাত্রাবস্থায় থাকা কালীন এবিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সময়ে কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতী জনৈক চিকিৎসকের সহিত একজন নীতিবাদীর প্রবল বিতণ্ডা চলিয়াছিল। ইনি স্বাভাবিক ভিন্ন অপর উপায়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। আমার জীবনের সেই প্রথম বয়সেই সংক্ষিপ্তকালের জন্য কৃত্রিম উপায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পরে আমি উহার ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলাম। কতকগুলি হিন্দী কাগজে এই সকল উপায় এত বীভৎসভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে তাহাতে লোকের শ্লীলতাবোধে আঘাত না লাগিয়া পারে না। একজন লেখক কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই কৃত্রিম উপায়ের অনুরাগীরূপে আমার নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল উপায়ের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে একবারও লিখিয়াছি বা

---

* Birth control Young India, 12 3. 25

বলিয়াছি বলিয়াত আমার মনে পড়ে না। কৃত্রিম উপায়ের সমর্থনে আরও দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তির নামের উল্লেখ দেখিয়াছি। নামের অধিকারীগণের নিকট হইতে সংবাদ না লইয়া উঁহাদের নাম আমি প্রকাশ করিলাম না।

জন্মনিয়মণের প্রয়োজন সম্বন্ধে মতবিরোধ সম্ভবপর নহে। আত্মসংযম অথবা ব্রহ্মচর্য্যই যুগযুগান্তের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইহার একমাত্র উপায়। এই অমোঘ ঔষধে অভ্যাসকারীরও প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। চিকিৎসকেরা যদি জন্মনিয়মণের কৃত্রিম উপায় নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তে আত্মসংযমের উপায় নির্দ্ধারণ করেন তাহা হইলে উঁহারা মানব জাতির অশেষ ধন্যবাদ অর্জ্জন করিবেন। সঙ্গমের উদ্দেশ্য আমোদ নহে, সৃষ্টি রক্ষা। সৃষ্টি রক্ষার বাসনায় যেখানে অভাব, সঙ্গম সেখানে গুরুতর অপরাধ।

কৃত্রিম উপায়ের অনুসরণে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। উহা স্ত্রীপুরুষকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে। সম্ভ্রমের আবরণে আবৃত হইলে এই সকল উপায় লোকাচারের বাধাকে শিথিল করিয়া দেয়। কৃত্রিম উপায় অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল শক্তিহীনতা এবং স্নায়বিক অবসাদ। এই প্রতিকার মূল পীড়া হইতেও সাংঘাতিক। কর্ম্মফল এড়াইবার চেষ্টা নীতিবিরুদ্ধ ও অন্যায়। পেটের বেদনা এবং পরবর্ত্তী উপবাস অমিতাহারীর পক্ষে মঙ্গলজনক। কামনায় প্রশ্রয় দিয়া রসায়ন অথবা অপর ঔষধের সাহায্যে ফল এড়াইবার চেষ্টা অহিতকর। পাশববৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া ফল এড়ান আরও মন্দ। অনিবার্য্য প্রকৃতি নিজের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের পূর্ণ প্রতিশোধ লইয়া থাকেন! কেবল নৈতিক সংযম দ্বারাই নৈতিক ফল উৎপাদন সম্ভবপর। অন্য সকল প্রকারের সংযম নিজেদের উদ্দেশ্যকেই বিফল করে। 'ভোগ জীবনের নিয়ম'—এই ধারণাটি কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের মূলে; ইহা অপেক্ষা ভ্রমাত্মক ধারণা আর নাই। জন্মনিয়মণে যাহারা উৎসুক উঁহারা প্রাচীনগণের উদ্ভাবিত ধর্ম্মসঙ্গত উপায়সমূহ অধ্যয়ন করুন, এবং উঁহাদের পুনরুজ্জীবনের উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করুন। উঁহাদের সম্মুখে প্রচুর কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। বাল্যবিবাহ প্রজাবৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ। বর্ত্তমানকালের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও ইহার জন্য কম দায়ী নহে। এই সকল কারণের অনুসন্ধান এবং প্রতিকার হইলে সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে। অধীর ভোগলিপ্সুগণ যদি এই সকল বিষয় উপেক্ষা করেন, এবং কৃত্রিম উপায়ই প্রচলিত নিয়ম হইয়া দাঁড়ায় তবে ফলে নৈতিক অবনতি অনিবার্য্য। যে সমাজ বহুবিধ কারণে বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে উহা আরও বীর্যহীন হইয়া পড়িবে অতএব যে সকল লোক লঘুভাবে কৃত্রিম উপায়ের অনুমোদন করেন উঁহারা আবার নূতন করিয়া এ বিষয় অধ্যয়ন করুন, এবং এই ক্ষতিকর কার্য্যপ্রণালী স্থগিত রাখিয়া বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয়ের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করুন। জন্মনিয়ন্ত্রনের ইহাই সরল এবং মহৎ পন্থা।

চয়ন

শ্রীযুক্ত রোম্যা রোলাঁর 'মহাত্মা গান্ধী' নামক পুস্তকের ১৭৬ পৃষ্ঠা হইতে মহাত্মাজীর সহযোগী শ্রীযুক্ত ডি, বি, কালেলকার মহোদয়ের, 'gospel of swadeshi' নামক

স্বদেশী জাতীয়তা

পুস্তিকার ইংরাজী অনুবাদের অংশ বিশেষের উল্লেখ করিয়া জনৈক পত্র প্রেরক 'স্বদেশী ও জাতীয়তা' সম্বন্ধে উঁহার মতামত বিশদভাবে জানিতে চাহিয়াছিলেন। মূলের সহিত অনুবাদের অসঙ্গতির উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী বলিতেছেন :—

'স্বদেশীর যে সংজ্ঞা আমি নির্দ্দেশ করি তাহা সকলেই জানেন। নিকটতম প্রতিবেসিকে উপেক্ষা করিয়া দূরতর প্রতিবেসির সেবায় আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারি না। ইহাতে প্রতিহিংসা অথবা শাস্তির কোন কথা উঠিতে পারে না। ইহাকে সঙ্কীর্ণচিত্ততাও বলা যাইতে পারে না। কারণ আমার বিকাশের জন্য যাহা কিছুর প্রয়োজন হয় তাহা আমি জগতের সর্ব্বত্র হইতেই আহরণ করিয়া থাকি। স্বভাবের বশে যাহারা আমার নিকটতম প্রতিপাল্য যাহাতে উঁহাদের অনিষ্ট হয় অথবা যাহা আমার বিকাশের অন্তরায় তাহা যতই সুশোভন হউক না কেন আমি কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিনা। কার্য্যকরী সৎসাহিত্য আমি সর্ব্বত্রই খরিদ করি। আমি ইংলণ্ড হইতে ডাক্তারী যন্ত্রাদি, অষ্ট্রিয়ার পিন এবং পেন্সিল, এবং সুইজারল্যাণ্ড হইতে ঘড়ি আহরণ করিয়া থাকি। কিন্তু আমি জাপান, ইংলণ্ড, অথবা অপর স্থানের সুচিকন কার্পাস বস্ত্র এক ইঞ্চি পরিমিতও খরিদ করিতে প্রস্তুত নই। উহা ভারতের কোটী কোটি অধিবাসীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। ভারতের একান্ত রিক্ত এবং চিরঅভাবগ্রস্থজনগণের কাটা ও বুনা কাপড় ফেলিয়া বিদেশী কাপড় ক্রয় করা আমি পাপ কার্য্য মনে করি—যদিও উহা উৎকর্ষে ভারতীয় হাতে কাটা সূতার কাপড় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। হাতে বোনা খদ্দরকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে প্রস্তুত ও প্রস্তুতক্ষম সকল বিষয়ে আমার স্বদেশী প্রসারিত হইয়াছে। আমার জাতীয়তাও আমার স্বদেশীরই মত ব্যাপক। সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্যই আমি ভারতের মুক্তি কামনা করি। অপর জাতির ধ্বংসের উপর ভারতের উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আমি চাহি না। সামর্থ্য এবং বল থাকিলে ভারত নিজের শিল্পসম্পদ এবং স্বাস্থ্য-পোষক মসলা জগতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিত, কিন্তু প্রভূত লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও অহিফেণ অথবা মত্ততাজনক পানীয় রপ্তানী করিতে অস্বীকার করিত। *'

জনৈক ইংরাজকে প্রেরকের উত্তরে মহাত্মাজী বলিতেছেন—

"জাতিভেদ ও অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতামত বহুবার প্রকাশ করিয়াছি। বিবাহ যে বন্ধুত্বের নিদর্শন তাহা আমার মনে হয় না, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও না, গোষ্ঠীগত

* Swadeshi and Nationalism ; Young India, 12 3. 25

কথাই নাই। এমন সময়ের কল্পনা আমি করিতে পারিনা যখন সমগ্র মানবজাতি এক ধর্ম অবলম্বন করিবে। কাজে কাজেই বিবাহের মধ্যে ধর্ম্মগত একটা বাধা সচরাচর থাকিবে। লোক নিজের ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরেই বিবাহ করিবে। এইরূপে একটা দেশগত বাধাও থাকিবে। জাতি বা বর্ণগত বাধা এই নিয়মেরই ব্যাপ্তি মাত্র। সমাজের সুবিধার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। অভিজাত বংশীয় ইংরেজের ছেলে মুচীর মেয়েকে সচরাচর বিবাহ করেন না। শুধু পাত্রীর জন্মের বিষয় বিবেচনা করিয়াই এইরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইবে। আমি অস্পৃশ্যতার বিরোধী কারণ উহাতে সেবার পরিসর সঙ্কুচিত করা হয়। বিবাহ সেবামূলক নয়। স্ত্রীপুরুষ নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই ইহাকে বরণ করে। স্বাচ্ছন্দ্যের পরিসর সীমাবদ্ধ করায় অথবা বিবাহের ন্যায় জীবনের আমূল পরিবর্ত্তনমূলক একটা ব্যাপারে নির্ব্বাচনপ্রবন হওয়ায় দোষ দেখিনা। নিজের কন্যাকে পুত্রবধূরূপে না দিলে অথবা উহার পুত্রকে জামাতৃপদে বরণ না করিলে যদি কেনিয়ায় উপনিবিষ্ট ব্যক্তি আমার উপস্থিতি প্রার্থনীয় মনে না করেন তবে স্বভাব বিরুদ্ধ একটা বন্ধন স্বীকারকরিয়া লওয়া অপেক্ষা কেনিয়ার বাহিরে থাকাই বরং পছন্দ করিব। সে যাহাই হউক আমি বলিতে পারি যে কেনিয়ায় উপনিবিষ্ট ইংরেজ এইরূপ সম্পর্কের কথা আমাকে কল্পনাও করিতে দিবেন না; যদি এইরূপ কোন দাবী আমি করি উহা উহার একচটিয়া অধিকার হইতে আমার বহিষ্কারের অতিরিক্ত কারণ স্বরূপ হইবে। যদিও ব্যাপারটি আমার নিকট নিতান্ত স্পষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছে, এবং কার্য্যতঃ জগতের সর্ব্বত্রই জাতি, গোষ্ঠি, ইত্যাদিতেই বিবাহ ব্যাপার সীমাবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়; তথাপি এণ্ড্রুজ সাহেবের পত্রলেখক যে আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন সে সম্ভাবনা অল্প। অন্ততঃ এটুকু আমি নিশ্চয়তা সহকারে বলিতে পারি যে কাহাকেও বিরক্ত করিবার ভয়ে বিচার্য্য বিষয় এড়াইতে চেষ্টা করি নাই। পত্রলেখক 'রাজনৈতিক' শব্দটী যে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন সে অর্থে আমি রাজনীতিক নহি। আমার যাহা বিশ্বাস তাহাই আমি লিখিয়াছি। রাজনীতিক সুবিধার খাতিরে কোন নীতিকে আমি বিসর্জ্জন দিই নাই। যে সমাজে আমায় বিচরণ করিতে হয় অসবর্ণ বিবাহ নিষেধাত্মক হিন্দু বিধির বিরুদ্ধে গেলেই হয়ত উহার নিকট আমার অধিক আদর হইবে। আমার লক্ষ্য সমগ্র মানবসমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা, এবং সাম্য অর্থই সেবার সাম্য। সেবার অধিকারে কেহই বঞ্চিত হইবে না। বিবাহে প্রকৃতিগত ও অন্যান্য সাদৃশ্যের কথা উঠে। কোন স্ত্রীলোক যদি রক্তবর্ণ চুলবিশিষ্ট কোন লোককে বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন তাহাতে দোষ হইবে না, কিন্তু কেবল চুল রক্তবর্ণ বলিয়াই যদি তিনি উহার সেবায় অবহেলা করেন তাহা গুরুতর দোষের বিষয় হইবে। বিবাহ নির্ব্বাচনের বিষয়, কিন্তু সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পতিত সমস্যা ও অসবর্ণ বিবাহ

অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণভেদের মধ্যে একটা গূঢ় পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমটীর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, যুক্তিদ্বারাও উহার সমর্থন করা যাইতে পারে না। ইহা মানুষকে মানুষের সেবার অধিকার হইতে এবং বিপন্ন অস্পৃশ্যকে সেবার দাবী হইতে বঞ্চিত করে। আমার মতে বর্ণভেদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর

অস্পৃশ্যতা ও বর্ণভেদ

প্রতিষ্ঠিত। উহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও নহে। ইহার অসুবিধা—সুবিধা দুইই আছে। ইহা শূদ্রের সেবা করিতে ব্রাহ্মণকে বাধা দিতে পারে না। বর্ণ সামাজিক এবং নৈতিক সংযমের জনক। বর্ণভেদের বিস্তার করা যাইতে পারে না। আমি উহাকে চতুর্বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার পক্ষপাতী। উহার বিস্তার কুফলপ্রসূ হইবে। আমি বর্ণসংস্কারের এবং উহার ত্রুটী স্খলনের পক্ষপাতী, কিন্তু বর্ণভেদ উঠাইয়া দিবার কোন সার্থকতা দেখি না। এক্ষেত্রে উৎকর্ষ অপকর্ষের কোন কথা দেখি না। যে ব্রাহ্মণ মনে করেন অপর জাতির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিবার জন্যই উহার জন্ম হইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। যদি তাঁহাকে বড় হইতে হয়, সেবার অধিকারেই বড় হইতে হইবে।)

"একই ছাত্রাবাসের অধিবাসী বিভিন্ন বর্ণের শিশুগণকে একটী সাধারণ ভোজনাগারে একত্রে বসিয়া খাইতে বাধ্য করা কি উচিৎ?"—জনৈক পত্রপ্রেরকের এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী বলিতেছেন :—

প্রশ্নটী ঠিকভাবে উপস্থাপিত হয় নাই। যে রকমভাবে প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে তাহার উত্তর এই যে বিভিন্ন বর্ণের শিশুগণকে একসঙ্গে আহার করিতে বাধ্য করা যায় না।

আন্তবর্ণ্য ভোজন

কিন্তু তাহা হইলেও আন্তবর্ণ্য ভোজন বিষয়ক কোন সর্ত্ত না করিয়া ছেলে ভর্ত্তি করিয়া উহাদিগকে ভিন্ন জাতির ছেলেদের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতে বাধ্য করা যেমন অযৌক্তিক, কোন হোটেল-ওয়ালা বিভিন্ন বর্ণের একত্র ভোজনের সর্ত্তে সভ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এইরূপ দাবী করাও তেমনি অন্যায়। অপর নিয়মের অভাবে আমরা এই ধরিয়া লইতে পারি যে প্রচলিত প্রথানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পৃথক পৃথক আহারের ব্যবস্থা আছে আন্তবর্ণ্য ভোজন অতিশয় জটিল সমস্যা, এ বিষয়ে খুব বাঁধাধরা কোন নিয়ম নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে। আন্তবর্ণ্য ভোজন যে একটা আবশ্যকীয় সংস্কার তাহা আমি মনে করি না, কিন্তু তাহা হইলেও এই বিষয়ক সামাজিক বাধার একান্ত বিলোপ সাধনের যে একটা চেষ্টা রহিয়াছে তাহা আমি স্বীকার করিব এই বাধার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে, উভয় পক্ষেই আমি যুক্তি দেখিতে পাই। এই পরিবর্ত্তনের গতিবেগ ত্বরিত করিয়া দিবার পক্ষপাতী আমি নই। কোন লোক অপরের সহিত একত্র ভোজন না করিলে সেটাকে আমি পাপ কার্য্য মনে করি না, আবার কেহ যদি অন্তর্ভোজনের পক্ষপাতী হয়েন, তাহাও পাপ মনে করি না। কিন্তু তাহা হইলেও যদি কেহ অপরের মনোভাবকে উপেক্ষা করিয়া এই বাধা ভাঙ্গিতে যান, সেই চেষ্টায় বাধা দেওয়া আমি কর্ত্তব্য মনে করি। আমি বরং এবিষয়ে উহাদের সংস্কারকে শ্রদ্ধা করিয়াই চলিব।

———

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম এ কাব্যতীর্থ

প্রণীত

১। বিবেকানন্দচরিত ... ...

"Received with many, many thanks the brochure—Vivekananda Charita. It is so very interesting that I read the whole of it at a stretch......................The style of the work from start to finish is pure, elegant and vigorous ....Your review on the assets of Vivekananda in the last chapter of the book is highly laudable and instructive"—

From the Raja Bahadur, Feudatory State of Hindol.

২। আরোগ্য-দিগ্‌দর্শন

বা মহাত্মাগান্ধীর মূল গুজরাতী

স্বাস্থ্যনীতি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০

"Prof. Sen in his lucid style has made the Bengali edition all the more interesting."---Amrita Bazar Patrika, March 25, 1923

"বইখানির ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহা সহজেই অনুসৃত হইতে পারে এবং দেহের ও মনের পুষ্টিসাধনের পক্ষে যাহাদের উপযোগিতাও কম নহে। .... আরোগ্য-দিগ্‌দর্শনের অনুবাদকের ভাষা ভাল—বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের মত মনে হয় না।" প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯।

প্রাপ্তিস্থান—প্লট নং ৪, কালীঘাট পোঃ।

পোলাও মূল্য ১।০

সুকবি বেনোয়ারীলাল প্রণীত। অর্দ্ধশিক্ষিতের জন্য ইহা নহে প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা মৃজাপুর লেন Universal Book Depot ও গাইবান্ধায় আমার নিকট। বঙ্গবাণী জড়িমাজড়িত ভাষায় গাল দিয়াছেন। বঙ্গবাণী হইতে যুক্ত দীনেশ অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অক্ষয় বলেন "লোকে এখন পোলাও চায় না এখন লোক চায় চানাচুর্‌র্‌র্‌" বঙ্গবাণী, মানসী ও বঙ্গবাসীতে তিনজন সাহিত্যরথ ইহার সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বামী।

গাইবান্ধা।

যদি জীবন যুদ্ধে জয়ী হ'তে চান

তাহলে কার্ত্তিক চন্দ্র বসু

সম্পাদিত

স্বাস্থ্য সমাচার

নামক সচিত্র মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য আজই পত্র লিখুন। ১৫ দিনের মধ্যে পত্র লিখিলে এই কাগজের গ্রাহকদের বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হবে। ৩২ শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ২৲ পাঠিয়ে গ্রাহক হ'লে ৩ খানি বিশেষ উপহারের টিকিট ও একখানি সুবৃহৎ যুগপ্রবর্ত্তক নূতন ধরণের "স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা" বিনামূল্যে উপহার পাবেন। এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না।

কার্য্যাধ্যক্ষ "স্বাস্থ্য সমাচার"

৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নব্যভারত

নব্যভারতের বার্ষিক মূল্য ৩৲ ষান্মাষিক ১৸৹ প্রতি সংখ্যা।৹। চারি আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা প্রেরিত হয়। মনিঅর্ডারযোগে মূল্য পাঠাইলেই সুবিধা। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হইলে, ডাকমাশুল ও শিরোনামাসমেত খাম পাঠাইলে, ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এবং প্রবন্ধ লেখকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় জ্ঞাতব্যের জন্য ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখুন।

নিবেদন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া মণিঅর্ডারযোগে বার্ষিক মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

সচিত্র মাসিকপত্র

ভাণ্ডার

ভাণ্ডার বঙ্গদেশের ৭০০০ সমবায়-সমিতির মুখপত্র। ইহাতে সমবায়, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি জাতিগঠনের উপযোগী যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি থাকে। সমবায়-সমিতির জন্য বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা এবং অন্যান্যের জন্য ১৸৹ টাকা মাত্র। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ৵৹ আনা। পূজার সংখ্যার নগদ মূল্য।৹ আনা।

ম্যানেজার, ভাণ্ডার

রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা।

সংহতি

শ্রমজীবীদিগের পত্র

বৈশাখ ১৩৩০ হইতে প্রতি মাসের শেষ প্রকাশিত হইতেছে

শ্রমজীবীদিগের দ্বারা পরিচালিত

এবং

দরদী সাহিত্যিকগণের

লেখায় পরিপুষ্ট

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র,

প্রতি সংখ্যা তিন আনা

কার্য্যালয়—১নং শ্রীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা

শরীরং আদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্

শরীর রক্ষাই প্রকৃত ধর্ম্ম, তাই এই দারুণ গ্রীষ্মে প্রত্যহ সাবান দ্বারা ত্বক পরিষ্কার রাখা দরকার।

আমরা বহু গবেষণার পর নিমতৈল হইতে

মার্গো সোপ

সাবান প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাতে কোন উগ্র ঔষধ নাই ও বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা নিমের দুর্গন্ধ নাশ এবং সুবাসিত করা হইয়াছে।

প্রত্যহ এই সাবান ব্যবহারের পর

মার্গোসিস্ টয়লেট পাউডার

দ্বারা ত্বক প্রসাধন করিলে যাবতীয় চর্ম্মরোগের অবসান হয়। রমণীদের ও শিশুদের ত্বক পরিষ্কৃত, শোধিত ও উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট করিতে অদ্বিতীয়।

মার্গো সোপ প্রতি বাক্স তিনখানা ৸০ আনা

টয়লেট পাউডার সুদৃশ্য প্যাকেট ৵০ আনা, কৌটা ။৵০ আনা।

দি ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল কোং লিমিটেড

সর্ব্বপ্রকার ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক

কারখানা—পণ্ডিতিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

সহরে বিক্রয়ের স্থান ৫, বনফিল্ড্স্ লেন, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ

অতি প্রাচীন কাল হইতে চ্যবনপ্রাশ ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ। শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় পীড়ায় ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। দুর্ব্বল ও রুগ্ন শরীরকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য টনিক হিসাবেও ইহার প্রসিদ্ধি আছে। ফুসফুসের পীড়ায়, বার্দ্ধক্যজনিত দৌর্ব্বল্যে, শিশুদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ়ীকরণে, বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির বিকাশ সাধনে, দীর্ঘজীবন প্রদানে এবং দৈহিক সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে ইহার ব্যবহার প্রশস্ত।

চ্যবনপ্রাশ বহুবিধ উপাদানে প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় উহাতে ভেজালের সম্ভাবনা প্রচুর। সাধারণত, বাজারে যে ঔষধ চ্যবনপ্রাশ নামে বিক্রয় হয়, উহার প্রস্তুত প্রণালী অনেক স্থলে নির্দ্দোষ নহে, সে হেতু উহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। উপাদানের নির্য্যাস নিস্কাশনের সময় প্রায়ই উত্তাপের আধিক্যে ঔষধের উপকারিতা নষ্ট হয়, কখনও বা পরিচ্ছন্নতার অভাবে ঔষধ পচিয়া যায়। আমাদের চ্যবনপ্রাশ অতি উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত, সেগুলি বিশেষ সাবধানতার সহিত নির্ব্বাচিত হওয়ায় ভেজালের আশঙ্কা নাই। উপাদানের নির্য্যাস খোলা আগুনের উপর প্রস্তুত হয় না, বাষ্পের উত্তাপে হয়, সেজন্য উত্তাপের আধিক্য ঘটার সম্ভাবনা নাই। তদুপরি ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় পরিচ্ছন্নতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এবং উহা নির্দ্দোষ টাটকা অবস্থায় প্যাক করা হয়।

পুরাতন কাসরোগে, স্বরভঙ্গে, হাঁপানিতে এবং ফুস্‌ফুসের যাবতীয় পীড়ায় চ্যবনপ্রাশ উপকারী।

৩০ মাত্রার কৌটা—১।৶০ ১ ডজন কৌটা—১৫৲ ১ পাঃ কৌটা—২৸০

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড

ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, লিমিটেড।

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

Cover Printed by U. Ray & Sons, Calcutta.